ওঁরাও জনজাতির সমাজ - সংস্কৃতি ও সংগ্রামঃ প্রসঙ্গ মানভূম

(১৯৪৭-২০১০)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের পি.এইচ.ডি উপাধির জন্য

প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

আশিষ ওরাং

নিবন্ধন সংখ্যা- A00HI0302517

বর্ষ - ২০১৭

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Certificate

Certificate that the thesis entitled **ওঁরাও জনজাতির সমাজ সংস্কৃতি ও সংগ্রামঃ প্রসঙ্গ মানভুম (১৯৪৭-২০১০)** Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Mahua Sarkar, Department of History, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor	Signature of the Candidate
Date :-	Date:-

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই গবেষণাপত্রের জন্য প্রথমেই আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা (ড.) মহুয়া সরকার মহাশয়াকে। তিনি শুধুমাত্র আমার তত্ত্বধায়ক নন, আমার আগামীর প্রেরণা। আমার শিক্ষাগুরু। বিভিন্ন কারণে আমাকে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। ওই সংকটকালে আলোর পথ দেখিয়েছিলেন আমার মাতৃরূপি তত্ত্বাবধায়ক। তিনি ইতিহাস বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে ও শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও আমার এই গবেষণার কাজকে সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবসময় পরামর্শ দিয়েছেন। যখনই সমস্যায় পড়েছি তখনই তিনি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও স্নেহের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা, বিশ্বাস ও স্নেহের কারণেই আমি গবেষণাপত্রটিকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছি। তিনি তাঁর কাছে আমাকে গবেষণার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, আমি তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবো।

আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার রিসার্চ অ্যাডভাইসারি কমিটির অন্যতম সদস্য ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক (ড) রঞ্জন চক্রবর্তী ও অধ্যাপিকা চন্দ্রানি ব্যানার্জি মুখার্জি মহাশয়াকে। যাঁরা নানা সময় বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং শিক্ষা সহযোগী কর্মীদের যাঁদের বিভিন্ন পরামর্শ ও আন্তরিক সাহায্য এই গবেষণার পথকে অনেকটা সহজ করে দিয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই পি.এইচ.ডি সেলের মেহেলী দি সহ অন্যান্য সকল কর্মীকে, যাঁরা এই গবেষণার কাজে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। গবেষণাটি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে আমি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, স্টেট আর্কাইভ, জাতীয় গ্রন্থাগার, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট, লিটল ম্যাগাজিন গ্রন্থাগার, পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার, ঝাড়খণ্ড ও বিহার রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে সর্বতোভাবে সাহায্য পেয়েছি। তাই উক্ত সকল প্রতিষ্ঠানের আধিকারিকদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই শুভদীপ দাষ, অলোক কোরা, গৌতম মাজি, সমীর কর্মকার ও মৃন্ময় ভারতী, যাঁরা বিভিন্ন সময় নানা ভাবে আমার পাশে থেকেছে এবং এদের থেকে নানা ভাবে উপকৃত হয়েছি। আলাদা ভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার স্ত্রী ঝুমাকে, যে আমাকে গবেষণার কাজে নানা ভাবে সাহায্য করে গেছে। কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসমস্ত ওঁরাও জনজাতির মানুষদের, যাঁরা আমাকে আমার গবেষণায় কাজে বিভিন্ন ভাবে তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে আমার গবেষণাপত্রটিকে আরও তথ্যনির্ভর হতে সাহায্য করেছে। এদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি আমার পরিবারের মায়ের সমর্থন, স্নেহ-ভালোবাসা, মানসিক ও আর্থিক সাহায্য পেয়ে এসেছি সেই সমর্থন ও ভালোবাসা ছাড়া আমি কখনই আমার এই গবেষণাকে সম্পন্ন করতে পারতাম না। তাই আমার পরিবারের প্রতি আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ। আলাদা করে আমার পিতা স্বর্গীয় গনপতি ওরাং-এর কথা না বললেই নয়। তাঁর অনুপ্রেরণা না পেলে, আমি হয়তো এতদুর পৌঁছাতেই পারতাম না। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত মানুষদেরকে যারা বিভিন্ন ভাবে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সাহায্য করেছে।

আশিষ ওরাং
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতার স্বীকার	I – II
ভূমিকা	**১-১২**
প্রথম অধ্যায় ওঁরাও জনজাতির ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি	**১৩-৭৭**
দ্বিতীয় অধ্যায় ওঁরাও জনজাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট	**৭৮-১০৯**
তৃতীয় অধ্যায় ওঁরাও জনজাতির সমাজ-সংস্কৃতি ও পরিবেশ ভাবনা	**১১০-১৬০**
চতুর্থ অধ্যায় ওঁরাও জনজাতির ধর্মীয় জীবন	**১৬১-১৯২**
উপসংহার	**১৯৩-২০১**
গ্রথপঞ্জি	**২০২-২১২**

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্য প্রদেশে বিভিন্ন আদিম জনজাতির নিবাস আছে। মূলত ভারতবর্ষের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আদিবাসীরা বিশাল অংশ হলেও জনসংখ্যার অনুপাতের দিক থেকে সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পরেই ওঁরাওদের স্থান। সমাজের বিভিন্ন স্তরে সাঁওতাল আদিবাসী জনজাতির পরিচয় থাকলেও ওঁরাও জনজাতির পরিচয় নেই বললেই চলে। ওঁরাওরা সমজে সাঁওতাল জনজাতি হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত কিন্তু ওঁরাওরা সাঁওতালদের থেকে একেবারেই পৃথক একটা জনজাতি। প্রাচীনকালে বিশেষ করে সিন্ধু সভ্যতার সময়কালে প্রোটো অস্ট্রেলিয়ান প্রজাতির মুন্ডা, হো ও সাঁওতালদের পাশাপাশি দ্রাবিড় প্রজাতির ওঁরাও আদিম জনজাতির নিবাস ছিল। এস. সি. রায় এর মতে ওঁরাওদের পূর্বপুরুষরা দক্ষিন-পূর্ব এশিয়া থেকে ভরতে প্রবেশ করে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বসতি গড়ে তুলেছে। বিশেষ করে ঝাড়খন্ড রাঁচি, আসাম এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বসতি গড়ে তুলেছে। ভারতবর্ষের বাইরেও নেপাল বাংলাদেশ মরিশাসে বসতি স্থাপন করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। ওঁরাওদের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ। ওঁরাওরা কঠোর পরিশ্রম করতে পারত। পুরুষদের সাথে মহিলারাও সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করত। তাদের নিজস্ব একটা ভাষা আছে, সেই ভাষাটি কুরুখ ভাষা হিসাবে পরিচিত। সমাজের প্রথমদিকে ওঁরাওরা কুরুখ ভাষাতে বেশি কথা বলত। এদের প্রধান উৎসব হল করম উৎসব। এই উৎসবের সময় কুরুখ ভাষায় নাচ গান অনুষ্ঠিত হয়। এই জনজাতির মধ্যে শিক্ষার হার ছিল খুবই নগন্য, ছেলেরা একটু শিক্ষিত হলেও মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার ছিল না বললেই চলে। ওঁরাও সমাজে মেয়েদের কমবয়সে বিয়ে হয়ে যেত। বিবাহের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের

রীতি প্রচলিত আছে যা অন্য আদিম জনজাতির থেকে একেবারেই পৃথক। এই জনজাতির মধ্যেই এদের বিবাহ হয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা নেই, বিধবা-বিবাহ বা সাঙা হয়। স্বাধীনতার পর থেকে ওঁরাও জনজাতির মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন হলেও অন্যান্য আদিম জনজাতির থেকে তারা এখনও অনেকটাই পিছিয়ে।

যাদের অনেকে আজও আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার বাইরে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে, এই রকমই ভারতবর্ষের এক আদিম জনজাতি হল ওঁরাও। ভারতবর্ষের অন্যান্য জনজাতির মতো ওঁরাও জনজতির মানুষেরা মানভুম জেলায় দীর্ঘদিন প্রকৃতি নির্ভর এক আলাদা সমাজ কাঠামোকে বজায় রেখেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন নিয়মনীতি, খ্রিষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ, অভিপ্রয়াণ, আন্দোলন অধিকার প্রাপ্তি প্রভৃতি কার্যকলাপে ওঁরাও সমাজ-সংস্কৃতি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে যে বিবর্তনের ধারা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী কালেও সেই ধারা বজায় ছিল। স্বাধীন ভারতের সংবিধানের সংরক্ষণ নীতি, ভোটাধিকার প্রয়োগ, নতুন অর্থনীতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এবং তলং সিকি লিপির প্রচলন ওঁরাও সমাজ-সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক পরিমন্ডলকে বিবর্তনের নতুন ধারায় প্রভাবিত করে এক নতুন সংকট এর উদ্ভব ঘটায়। যা ওঁরাওদের এক স্বতন্ত্র পরিচিতি কে নির্দিষ্ট অবয়বের মধ্যে ঠেলে দেয়, যা ওঁরাও জনজাতির স্বার্থের পরিপন্থী।

ওঁরাও জনজাতির ইতিহাস সেই সুদূর প্রাচীন ভারতের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আদিম জনজাতি গুলির মধ্যে, ওঁরাওদের স্থান অন্যতম। তাম্র-প্রস্তর যুগের সিন্ধু সভ্যতার সময়েও এদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, মৌর্য এবং মৌর্যোত্তর, গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর সময়ে বারংবার এই জনজাতির কথা

উল্লিখিত হয়েছে। সুলতানি ও মোঘল আমলে, ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, এই জনজাতির মানুষদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের নানাবিধ পরিকল্পনার কথা জানা যায়। তবে আমার এই গবেষণায় প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের ওঁরাও জনজাতির কথা সেইভাবে উল্লিখিত হবে না। ওঁরাও জনজাতির মানুষরা প্রাথমিক পর্বে দক্ষিণ ভারতে বসবাস করত। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এবং কৃষ্ণা নদীর উত্তরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ উর্বর কৃষি জমিগুলিতে এরা বসবাস করত। পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিকূলতা, বহিঃশত্রুর আক্রমন, খাদ্যাভাব প্রভৃতি কারণে এদের একটা অংশ উত্তর ভারতে চলে এসেছিল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে, বিশেষ ভাবে মোঘল আমলে রাজকর্মচারির অত্যাচার এবং রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ির ফল স্বরূপ, এরা ছোটোনাগপুর অঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণ অনুর্বর জমিগুলিতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেছিল। কারণ এই অঞ্চলের জমিগুলি অনুর্বর হওয়ায়, মোঘল বাদশাহরা স্থানটিকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন না। ওঁরাও জনজাতির মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে এই স্থানটিকে বসবাসের যোগ্য করে তুলেছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকে ওঁরাও জনজাতির মানুষদের একটা পৃথক জীবনধারা ও সংস্কৃতি টিকে ছিল। সর্বভারতীয় স্তরে সম্রাট বা রাজার পরিবর্তন ঘটলেও, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সেইভাবে তা প্রভাবিত করতে পারে নি। এমনকি, বৈদেশিক আক্রমণ ঘটলেও তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে বাংলা তথা ভারতে ক্রমপর্যায়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, সমস্ত জমি ও জনসাধারণের উপর শোষণ ও শাসন চালিয়ে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ওঁরাও তথা অন্যান্য আদিবাসী জনজাতির সমাজেও বেশ কিছু পরিবর্তন

দেখা দিয়েছিল। প্রথমত, এই জনজাতির মানুষরা পৃথক ভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার অধিকার হারিয়েছিল। কারণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ঐসব অঞ্চলে সাধারণ উচ্চ বর্ণের মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে তাদের স্বশাসনের অধিকার ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়ত, খ্রিষ্টান মিশনারিগুলির ধর্ম প্রচারের ফলে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। চতুর্থত, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মূষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও ও অন্যান্য জনজাতির মানুষ রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

সমস্ত আদিবাসী জনজাতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করার অবকাশ আমার নেই। এই গবেষণায় আমি শুধু ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করার প্রয়াস করব। আবার এই গবেষণা শুধু ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। ঔপনিবেশিক আমলে সাঁওতাল, কোল, ভিল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভুতি জনজাতির প্রধান বসতি ছিল মানভুম জেলায়। যা বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত। যদিও স্বাধীনতা পর্বে এই জেলা বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পরবর্তি পর্যায়ে তা পশ্চিম বঙ্গের সাথে যুক্ত হয়েছিল। তবে মনে রাখতে হবে যে, একদা মানভূম জেলা নামে পরিচিত স্থানটি আজ পুরুলিয়া জেলা নামে খ্যাত। পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন ইতিহাস সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে তার একটা আনুমানিক তথ্য জানা যায় মাত্র। মধ্য যুগেও এই স্থানটির ইতিহাস সেইভাবে কোথাও উল্লিখিত হয়নি। আসলে এই স্থানটি সেইসময় ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ফলে এই অঞ্চলে কৃষির প্রসার সেইভাবে ঘটেনি। এই অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের সুযোগও ছিল না। তাই হয়তো সুলতানি

শাসক ও মোঘল বাদসাহরা এই স্থানটির দিকে সেইভাবে গুরুত্ব দেননি। তবে বাংলায় কোম্পানীর শাসনকালে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে, নতুন ভূস্বামি ও জমিদার শ্রেণী রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানটিতে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে আবাদি কৃষি জমির পরিমান বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে বহিরাগত হিন্দু মধ্যবিত্ত জমিদার শ্রেণী এই অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল। পাশাপাশি বেশ কিছু খ্রিষ্টান মিশনারি খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের নিরক্ষর আদিবাসী সমাজের মধ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করেছিল। প্রচলিত হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত এইসব আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে খ্রীষ্টান মিশনারিগুলি সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। তবে পরিবর্তিত নতুন আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় বাতাবরণে ঐসব আদিবাসী সমাজের মানুষ কখনই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। ফলে তাদের মধ্যে সর্বদা একটা বিদ্রোহের চাপা উত্তেজনা চোরা স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছিল। ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এইখানকার স্থানীয় জনজাতিদের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ, পুরুলিয়ার গুরুত্ব সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিল। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ছোটো-বড়ো নানা বিদ্রোহে তারা সামিল হয়েছিল। হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণী ঐসব আদিবাসী বিদ্রোহে স্বতস্ফূর্ত ভাবে সামিল হয়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধী সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি বিদ্রোহে এই পুরুলিয়ার আদিবাসীরা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এইখানকার আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল সাঁওতালরা। তারপরেই যথাক্রমে ওঁরাও ও মুণ্ডাদের স্থান। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এইসব আদিবাসী বিদ্রোহের গুরুত্বকে কখনই অস্বীকার করা যায় না। শুধু তাই নয়; ঔপনিবেশিক আমলে

এবং ঔপনিবেশিকোত্তর পর্যায়ে ভাষার ভিত্তিতে পৃথক পুরুলিয়া জেলা গঠনের দাবীতে স্থানীয়রা বারংবার সোচ্চার হয়েছিল। পুরুলিয়া জেলার সাধারণ বাঙালি ও আদিবাসী মানুষদের উপর বলপূর্বক হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ফলে আদিবাসী সাঁওতাল ও ওঁরাওদের পাশাপাশি, এক বিরাট সংখ্যক বাঙালি মানুষ পৃথক পুরুলিয়া জেলা গঠনের জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তবে আদিবাসীদের সেই ভাষা আন্দোলনের পথ খুব সহজ ছিল না। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে ভাষার ভিত্তিতে দেশের অন্যান্য প্রান্তের ন্যায়, ঝাড়খণ্ডেও ভাষার ভিত্তিতে পৃথক আদিবাসী রাজ্য গঠনের দাবী তোলা হয়েছিল। সক্রিয় আন্দোলনের ফলে অবশেষে ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া জেলা গড়ে উঠেছিল। তবে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবীতে তৎকালীন বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চলে বারংবার সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে এই আন্দোলন আইনি পর্যায়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বিভিন্ন মামলা-মকদ্দমা এবং শুনানির পর ১৯৯৯ সালে ভারতের সংসদে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পৃথক রাজ্য গঠনের বিষয়ে একটি বিল পাস হয়েছিল। তারই ফল স্বরূপ ঐ বছরেই বিহারের একটা অংশ নিয়ে ঝাড়খণ্ড নামে নুতন একটি আদিবাসী রাজ্য আত্মপ্রকাশ করেছিল। যদিও আদিবাসীদের জন্য পৃথক একটি রাজ্য গঠনের ফলে আদিবাসীদের কতখানি সুবিধা হয়েছে, তা একটি আজও বিতর্কিত এবং অমীমাংসিত বিষয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য

মানভুম জেলায় ওঁরাওদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, ঐতিহ্যবাহী সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসন এবং সংস্কৃতি তাদের মধ্যে এক আলাদা জাতিগত পরিচিতি তৈরি করেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে সরকারি নীতি নির্ধারণ ফলে ওঁরাও জনজাতির আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক

ও ধর্মীয় জীবনে নানা সমস্যা দেখা দেয়। ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন বন আইনের জন্য ওঁরাওদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। আবার স্বাধীন ভারতবর্ষে পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতাদের অনগ্রসর উন্নয়নের প্রচেষ্টা তথা ভারতীয় অগ্রসর সমাজের সঙ্গে একত্র করার প্রচেষ্টা ওঁরাও জনজাতির সমাজ ব্যবস্থায় এক নতুন সংকটের সৃষ্টি করে। তাই সময়ের ও প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ওঁরাও সমাজের গঠন, রীতিনীতি, ধর্ম, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা এমনকি ওঁরাওদের অভিরুচি, চাহিদা, চিন্তা-ভাবনা, এবং মানসিকতার যে পরিবর্তন ঘটেছিল এবং ভারতীয় ইতিহাসে, সাহিত্য ও সমাজ দর্পণে সাঁওতাল জনজাতির যে ভাবে চর্চা বা আলোচনা পাওয়া যায়, সেই দিক দিয়ে এই ওঁরাও জনজাতি সম্পর্কিত চর্চা বা আলোচনার অপ্রতুলতা রয়ে গিয়েছে। ফলত অনেকেই ওঁরাও জনজাতিদের, সাঁওতালদের সঙ্গে একাত্ম করে বা সাঁওতাল হিসাবেই বিচার করেছেন। অথচ ওঁরাও জনজাতির সাঁওতাল জনজাতির মতই নিজস্ব ভাষা, লিপি, আচার-অনুষ্ঠান, বিবাহ রীতিনীতি, ও ধর্ম আছে। এই ওঁরাও জনজাতি যে সাঁওতাল জনজাতির থেকে পৃথক একটা জনজাতি তা তুলে ধরাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে এদের অস্তিত্বের প্রকৃত পরিচিতি সম্পর্কেও আমি অনুসন্ধান করছি। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার কথা ভাবাই যায় না। আজকের দিনে, যখন পরিবেশ প্রায় বিপন্ন, তখন এইসকল পরিবেশ ভাবনা ও প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে থাকার প্রবণতা, তাও তুলে ধরা যাতে আমার এই গবেষণাপত্রটি পরিবেশবিদদের কাছে ও সমাজের কাছে সচেতনতার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মানভূম জেলায় স্থানান্তরিত ওঁরাও জনজাতির সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ইতিহাস খোঁজার একটা প্রয়াস

করেছি ফলে, প্রান্তিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও, এই গবেষনাপত্রটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

গবেষণার গুরুত্ব

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কাল থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়কালে মানভূম জেলায় ওঁরাও জনজাতির সমাজ সংস্কৃতিতে ব্রিটিশ সরকার, মিশনারী এবং স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক অধিকার, নেহরুর বিভিন্ন পরিকল্পনা যে বিবর্তনের ধারা শুরু করেছিল তা এখনও অনালোচিত আছে। বর্তমান গবেষণায় এই বিষয়টিকে তুলে ধরে ওঁরাওদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে কী ধরনের বিবর্তন ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা আলোচনা করাই আমার গবেষণা কর্মের মূল তাৎপর্য বা গুরুত্ব।

গবেষণার ক্ষেত্র

আমি আমার গবেষণার এলাকা হিসাবে মানভূম জেলাকে বেছে নিয়েছি। ব্রিটিশ আমল থেকেই প্রশাসনিক কাজে সুবিধার জন্য মানভূমসহ ২৩ টি পরগনা ও মহল নিয়ে গঠিত হয়েছিল জঙ্গলমহল জেলা। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকার ১৮৩৩ সালে এই জেলা ভেঙে মানভূম জেলা গঠন করে। এই জেলার সদর দপ্তর হয়েছিল মানবাজার। বর্তমান বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার বিশাল অংশ সেই সময় মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১১ সালে মানভূম জেলা বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিহার প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল এবং স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্তই ছিল। ১৯১২ সালে মানভূমে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে এই ভাষা আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। এই ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানভূম জেলা একটি নতুন জেলা হিসাবে পুরুলিয়া জেলাকে সংযুক্ত করা হয়েছিল মেদিনীপুর বিভাগের পাঁচটি জেলার অন্যতম

জেলা পুরুলিয়া। এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত। দক্ষিণে ২২°৪৩' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩°৪২' উত্তর অক্ষাংশ এবং পশ্চিমে ৮৫°৪৯' পূর্ণ দ্রাঘিমাংশ থেকে পূর্বে ৮৬°৫৪' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এর মধ্যে অবস্থিত। মোট ভৌগলিক আয়তন ৬২৫৯ বর্গ কিলোমিটার। জেলার সদর দপ্তর পুরুলিয়া ২৩°২০' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৭°৫১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। জেলার উত্তর পশ্চিমে ঝাড়খন্ড রাজ্য উত্তর পূর্বে বর্ধমান জেলা, পূর্বে বাঁকুড়া ও দক্ষিণ পূর্বে ঝাড়গ্রাম জেলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।এই ভৌগলিক অবস্থানের মধ্যে ওঁরাও জনজাতির জীবন ধারায় নিজস্ব সংস্কৃতি ও পরিবেশ চেতনা লক্ষ্য করা যায়।

সাহিত্য পুনঃসমীক্ষা

ওঁরাওদের বিষয়ে চর্চার কাজ শুরু করেছিলেন খ্রিষ্টান মিশনারীরা এবং কিছু ব্রিটিশ প্রশাসক ও জাতিতত্ত্ববিদ। এর পর স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ব্যাপকভাবে ওঁরাওদের বিষয়ে চর্চা শুরু হয়। তবে প্রাথমিক ভাবে ওঁরাওদের বিষয়ে চর্চা করা হত নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। ওঁরাওদের জনজীবন সম্পর্কে সামগ্রিক ভাবে চর্চা শুরু হয়েছিল বিংশ শতকের শেষের দু-দশকে। জাতিতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ওঁরাওদের বিষয়ে চর্চা করেছেন- ই.টি.ডালটন, এইচ.এইচ.রিজলে, ই.জি.ম্যান, ডব্লিউ.জি.আর্চার প্রমুখ ঔপনিবেশিক জাতিতত্ত্ববিদ ও প্রশাসক। আর ভারতীয় লেখকদের মধ্যে,আনন্দ কুমার দাস,ডি এন মাজুমদার,কে পি চট্টোপাধ্যায়, বি মুখার্জী এবং শরৎচন্দ্র রায় এ বিষয়ে চর্চা করেছেন। মিশনারীরা ও যাজকরা ওঁরাওদের ভাষা শিখে তাদের সঙ্গে মিশে ওঁরাওদের বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। মিশনারীরা ওঁরাওদের জন্য শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য চেতনা এবং তাদের আর্থিক বিকাশের জন্য প্রচুর কাজ করেছেন। বিখ্যাত মিশনারীরা হলেন- পি.ও.বোর্ডিং, এল.ও.স্ক্রেফসরুড, ডাব্লিউ জে.কালশো, জে.ফিলিপস্, ই.এল.

পুক্রলি, এ.ক্যাম্পবেল, যে হপম্যান প্রমুখ। তারা সংস্কৃতি, সমাজ জীবন, ও অর্থনীতি বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন। অনেক গবেষক ওঁরাওদের সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তনের বিষয়ে চর্চা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন কি ভাবে আধুনিকতা এবং বাণিজ্যিকীকরণ ওঁরাও সমাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে যারা গবেষনা করেছেন তারা হলেন শরৎচন্দ্র রায়, সন্তোষ রানা, কুমার রানা.অভীক ঘোষ ,দিয়াঙ্কার মিঞ্জি, গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ কুমার দাস,জিতু ওঁরাও প্রমুখ। শরৎচন্দ্র রায় এর লেখা “The Oraon of Chotonagpur” এবং “Oraons Religion and Customs” ডি. এক্কা এর লেখা “Education and Culture of Indigenous people of Chotonagpur” এ. ঘোষ এর লেখা “The World of Oraons”আর ও.ধন এর লেখা “These are my Tribesmen: The Oraons” এ. কূজূর এর “The Oraon Habitat: A Study in Cultural Geography” এই গ্রন্থগুলিতে ওঁরাওদের উৎপত্তি, অভিপ্রয়াণ, জনসংখ্যা, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন, শ্রম বিভাজন, প্রশাসন ব্যবস্থা, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মবিশ্বাস, ডাইনি প্রথা, তাদের যৌনজীবন সম্পর্কে বিশদে বিবরন দিয়েছেন এবং সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে ওঁরাও জনজীবনের পরিবর্তন দেখিয়েছেন। জে. কুজুর তাঁর “Indigenous People of India Problems and Prospects” গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছেন কিভাবে দক্ষিন-পশ্চিম বাংলার ওঁরাওদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের বিবর্তন ঘটেছে। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিকতার অভিঘাতে ওঁরাওদের মনোজগৎ এবং বস্তুগত জগতের পরিবর্তন এসেছে। মানভুম জেলা গঠন থেকে নেহেরু যুগ পর্যন্ত মানভুমে ওঁরাওদের সামাজিক ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিক পরিবর্তন গুলি সূচিত হয়েছে, সে বিষয়ে গবেষণা মূলক তেমন কোন কাজ হয়নি। তাছাড়া এই

পরিবর্তন ওঁরাওরা স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল, না পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়েছিল সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। আর এই পরিবর্তন গুলি ওঁরাওদের পরিচিতির সংকটকে কতটা গভীরতর করে তুলেছিল, তা আমি আমার গবেষণার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এমনকি ওঁরাও জনজাতি সাঁওতাল জনজাতির থেকে পৃথক একটা জনজাতি গবেষণায়, সেটিও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

গবেষণায় উত্থাপিত প্রশ্ন

আমার গবেষণার মাধ্যমে নিম্ন লিখিত প্রশ্ন গুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

১) মানভুম জেলার মধ্যে কীভাবে ওঁরাও সমাজ ও সংস্কৃতির গতিময়তার পরিবর্তন ঘটল ?

২) ওঁরাও সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন যদি ঘটে থাকে তবে তা কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটেছে ?

৩) তলং সিকি হরফের আবিষ্কার কীভাবে জাতি চেতনাকে জাগ্রত করেছিল ?

৪) স্বাধীন ভারতবর্ষের ওঁরাওদের প্রগতির প্রচেষ্টা গুলো কতটা বাস্তবায়িত হয়েছিল?

৫) পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ওঁরাও সমাজ ও সংস্কৃতিতে কি ধরণের প্রভাব এসেছিল ?

৬) স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ধর্ম ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে?

গবেষণার পদ্ধতি

ওঁরাও জনজাতি নিয়ে গবেষণা সাধারণ ইতিহাস রচনার চেয়ে একটু হলেও আলাদা। এক্ষেত্রে গবেষণার জন্য কবিতা,গান প্রভৃতি ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। আকর তথ্য

উপাদানের মধ্যে রয়েছে লেখাগারে সঞ্চিত বিভিন্ন সরকারী দলিল-দস্তাবেজ ও পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট। বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট ও মিশনারীদের লেখা গ্রন্থ বা বিবরণও সহায়ক উপাদানের মধ্যে রয়েছে ।ওঁরাও জনজাতি বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা এবং জার্নাল। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ও গুনগত উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করেছি। এর সঙ্গে যুক্ত করা সংগত হবে অধুনা গৃহীত উপাদান হিসাবে Oral Evidence। এটি নৃতত্ত্ব বিদ্যায় 'Participants Observation' হিসেবে পরিচিত। এছাড়াও আমি কুরুখ ভাষা ও তলং সিকি লিপি জানার সুবাদে বর্তমানে কুরুখ ভাষা ও তলং সিকি লিপিতে লিখিত গ্রন্থ থেকে এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও তথ্য নেওয়ার চেষ্টা করেছি।

অধ্যায় বিভাজন

আমি আমার গবেষণার বিষয়টি আলোচনার সুবিধার জন্য চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে ভূমিকা ও উপসংহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা ভাবা হয়েছে। এরই সঙ্গে গবেষণা কে পূর্ন্যতা দানের জন্যে ইতিহাসের আলোচনার পাশাপাশি নৃতাত্বিক ও সমাজত্বাত্তিক বিষয় গুলি যুক্ত হয়েছে।

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : ওঁরাও জনজাতির ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ওঁরাও জনজাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট।

তৃতীয় অধ্যায় : ওঁরাও জনজাতির সমাজ সংস্কৃতি ও পরিবেশ ভাবনা।

চতুর্থ অধ্যায় : ওঁরাও জনজাতির ধর্মীয় জীবন।

উপসংহার :

প্রথম অধ্যায়

ওঁরাও জনজাতির ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমি

গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু যেহেতু ওঁরাও জনজাতি, তাই ভারতীয় উপমহাদেশের এই প্রাচীন জনজাতির ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমির সন্ধান করা অপরিহার্য। ওঁরাওরা বেশিরভাগই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বাসিন্দা যা আগে ছোটনাগপুর নামে পরিচিত ছিল।[১] এটি ভারতের সর্বকনিষ্ঠ রাজ্যগুলির মধ্যে একটি, এই ভূখণ্ডে আর্য বসতি গড়ে ওঠার আগে থেকেই, ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল, অসুর, হো, কোল প্রভৃতি জনজাতিরা বসবাস করছিল। এটি এখন পণ্ডিত, গবেষক, ভারতবিদ, প্রত্নতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানীদের দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিতও হয়েছে। এই জনজাতির জনসংখ্যার উৎস আজও অজানা, কিন্তু দুটি মহাকাব্যে 'অসুর' ও 'রাক্ষস' ইত্যাদি হিসাবে তাদের উল্লেখ পাওয়া গেছে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন দুর্গে তাদের শক্তির উপস্থিতি এবং তাদের সাথে শত্রুতা ও সহযোগিতার সাক্ষ্যও লক্ষ্য করা যায় । আমার গবেষণার এই বিশেষ অধ্যায়টি ওঁরাওদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমির একটি উপস্থাপনা। এর মধ্যে ওঁরাও জনজাতিদের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলির অধ্যয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিছু আর্কাইভাল উৎস এবং ইউনেস্কো -এর মতো সংস্থাগুলির দ্বারা ভারতের জনজাতির জনসংখ্যার উপর গবেষণা প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে, বর্তমান অধ্যায়টি নতুন অধ্যয়নের উপস্থাপনা । আমার দ্বারা অর্জিত বা পুনরুদ্ধার অন্তর্দৃষ্টি. ওঁরাওদের উপর প্রকাশিত অনেক নিবন্ধ সেকেন্ডারি উৎস উপাদান হিসেবে কাজ করবে।

এই জনজাতিদের 'আদিবাসী' বা 'বনবাসী' বলা হয় কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও এটা নিশ্চিত করে বলা যায় যে ওঁরাওরা প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রাচীন ভূমিতে বসবাস করে আসছে।[২] ওঁরাওদের ঐতিহাসিকতা খুঁজে বের করার প্রথম প্রচেষ্টা ব্রিটিশ উপনিবেশকারীরা করেছিল। শিক্ষাগত এবং প্রশাসনিক উভয় নীতির দ্বারা এই জনজাতির উত্থান সম্পর্কিত তথ্য গৃহীত হতে শুরু করেছিল। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল সেই নীতিগুলির বিরুদ্ধে জনজাতিদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ যা ভূমি ও বন থেকে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছিল। এই অসন্তোষটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। এইভাবে নীতিনির্ধারক ও প্রশাসকরা একদিকে যখন এই বিদ্রোহগুলোকে দমন করেন, অন্যদিকে দমন করার উপায় খুঁজতে গিয়ে লক্ষ্য করেন যে,এদের দমন করার সহজ উপায় ছিল বাকি জনসংখ্যা থেকে এই লোকদের বিচ্ছিন্নতার সুযোগ করে দেওয়া এবং তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া যাতে তাদের জন্য নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। অন্য কারণ সম্ভবত ধর্মীয়, অর্থাৎ তাদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটানো।এই ভাবে এই জনজাতিদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল।[৩]

ওঁরাও জনজাতি সাঁওতালদের পরেই ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনজাতি।[৪] রেভারেন্ড এফ.এ গ্রিনগার্ড তার অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ প্রবন্ধে ওঁরাও ও মুন্ডাদের ভারতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ জনজাতি হিসাবে অভিহিত করার জন্য পণ্ডিতপূর্ণ প্রচেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধে "The Oraons and Mundas: From the time of their Settlement in India" দুটি উপজাতির উৎপত্তি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। তিনি স্বীকার করেন যে এই জনজাতির আদি ইতিহাস অধ্যয়ন করার জন্য উৎসগুলি খুব কম, তিনি বলেছেন যে তাদের প্রাচীনত্ব অধ্যয়ন করা একটি দুঃসাধ্য

কাজ। যেহেতু তাদের প্রাচীন অস্তিত্ব অধ্যয়ন করার জন্য কোনো এপিগ্রাফিক বা সাহিত্যিক উৎস পাওয়া যায় না, তাই গ্রিনগার্ডের কাজ দুটি মহান ভারতীয় মহাকাব্য, ‘মহাভারত' এবং 'রামায়ণের' সাথে ওঁরাও এবং মুন্ডাদের মৌখিক ঐতিহ্যের একটি সমালোচনামূলক এবং আন্তঃপাঠিক তুলনা। গ্রিনগার্ডের মতে এটি উল্লিখিত উভয় উৎসের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলবে।গ্রিগনার্ড ও অনেক পণ্ডিত অধ্যয়ন-ভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে, জোর দিয়েছেন যে মহাভারত এবং রামায়ণের "কুরুশ" জনজাতি বর্তমান সময়ের ওঁরাও জনজাতি।[৫] ব্রিটিশ শাসনের সূচনা লগ্ন থেকেই বিভিন্ন আদিবাসী বিদ্রোহ দেখা যায়, বিশেষ করে ব্রিটিশ সরকারের অরণ্য আইন ও ভূমি আইনই আদিবাসীদের বিদ্রোহের পথে ঠেলে দিয়েছিল। এই আদিবাসীদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ন্যায়বিজ্ঞান ও মানব জাতি সংক্রান্ত গবেষণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।[৬] বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যেমন ল্যাবরেটরি, তেমনি ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে আর্কাইভ এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তেমনি আবার বেশি দরকার হয়ে পড়ে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ বা ‘participant observation’। নৃতত্ত্ব চর্চাকে আবার অনেক সময় ‘child of imperialism’ ও বলা হয়ে থাকে। ইউরোপে যখন উপনিবেশ বিস্তার হতে শুরু করল তখন আরো বেশি মাত্রায় দরকার হয়ে পড়ল অ-উপনিবেশিক আধিপত্যের দেশগুলির মানুষকে জানা। দেশের মানুষকে সঠিকভাবে না জানলে তাদের শাসন করা খুব মুশকিল হয়ে পড়তে পারে। এই প্রসঙ্গে মিশেল ফুকোর “পাওয়ার নলেজ” ধারণাটি আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ শাসনকালে ওয়ারেন হেস্টিংস এই ‘পাওয়ার নলেজ’ টি ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। বিজয়ী দেশ গুলির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল একদিকে শাসিত দেশকে জানা আর অন্যদিকে স্বদেশের জন্য একটা মতাদর্শগত ভিত্তি তৈরি করা। যাতে এই উদ্দেশ্য থেকে গড়ে ওঠে “White man's burden” - এর তত্ত্ব। নবজাগরণের পর থেকেই

ইউরোপীয় জনমানসে যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল, সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই জন্ম নিয়েছিল অজানাকে জানার আগ্রহ। ১৯৭০ সালে ডেভিড ক্যামেরুন তার "Early Modern West" গ্রন্থে নবজাগরণের পরিণতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন "Europe thought that She was destined to rule the world"এই যে সংকল্পবদ্ধ মানসিকতা থেকেই নিজেদের প্রাণকে বাজী রেখে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দুর্গম পর্বত ও জঙ্গলে প্রবেশ করে আদিবাসী সমাজের খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে জনসমাজে আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি তুলে ধরেছেন।[৭]

কলকাতায় William Jones এর প্রচেষ্টায় "Asiatic Society of Bengal" প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে এই আদিবাসী নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সূচনা ঘটে। এই সময় থেকে ভারতে 'Nature and Man' সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ব্রিটিশ প্রশাসকরা, বিভিন্ন পর্যটকরা, নৃতত্ত্ববিদরা এবং মিশনারীরা তাদের বিভিন্ন পত্রিকায় এই আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তাদের বক্তব্য লিখতে শুরু করেছিলেন। যেমন 'Asistic Society of Bengal'(১৯৮৪),'Indian Antiquary'(১৮৭২),'Bihar and Orissa Research Society', 'Man in India'(১৯২১).-এই লেখনিগুলির মধ্যেই প্রথম আদিবাসীদের জীবনযাত্রা সংক্রান্ত লেখনি প্রকাশিত হয়েছিল।[৮]এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কর্মরত যে ব্রিটিশ প্রশাসকরা এই আদিবাসী জনজাতিদের সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের মূল্যবান গবেষণা রেখে গিয়েছেন, তারা হলেন W.W.Hunter Herbert Risley, E.T.Dalton, O Malley প্রমুখরা।ভারতীয় জাতিতত্ত্বের জনক Herbert Risley,তার লেখনীর মাধ্যমে জনজাতি ও হিন্দু জাতির উৎপত্তি, ধর্মীয় আচার-আচরণ,সমাজ ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে তার

বিখ্যাত"The Tribes and Castes of Bengal" গ্রন্থে বাংলার জনজাতিদের জীবনযাত্রা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।তার আর একটি গ্রন্থ "The People in India" জনজাতি দের জানবার জন্য যথেষ্ট অবদান রেখেছে।[৯] E.T.Dalton একজন ব্রিটিশ প্রশাসক ছিলেন।[১০] তিনি দীর্ঘসময় আসাম ও বিহারের ছোটনাগপুরে অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।এই সময় তিনি আদিবাসী জনজাতিদের সঙ্গে বেশ ভালোভাবেই যোগাযোগ ও মেলামেশা করেছিলেন। এই গোষ্ঠীগুলোর সাথে মেলামেশা করার ফলে তিনি তাদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি জানতে পেরেছিলেন। জনজাতিদের নিয়ে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ যেটা ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল "The Descriptive Ethnology of Bengal", যেটি ১৯৭৩ সালে দিল্লীর Cosmo প্রকাশক "Tribal History of Estern India" নামে প্রকাশ করেন। তিনি যেভাবে আদিবাসী জনজাতিদের সাথে মেলামেশা করে তাদের যাবতীয় খুঁটিনাটি জেনে তাদের জীবনযাত্রার কাহিনী তার বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন, সেটা বর্তমানে আদিবাসী জনজাতির গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক গ্রন্থ। আবার অন্যদিকে বিভিন্ন জেলার গেজেটিয়ার গুলি সেই জেলার বসবাসকারী জনজাতি সম্পর্কিত আলোচনা ও আদিবাসী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। O Malley একজন ব্রিটিশ আমলে সরকারি কর্মচারী ছিলেন, সরকারি কর্মচারী হিসাবে তিনি বিভিন্ন জেলার যে গেজেটিয়ার গুলি রচনা করেছেন, সেইগুলি সেই জেলার আদিবাসী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা সম্পর্কিত দুটি খন্ডে কলকাতা থেকে ১৯০৯ সালে ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়, যা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মধ্যে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া ইত্যাদি জেলার গেজেটিয়ার গুলি তারই রচনা। এক কথায় বলা যায় আদিবাসী ইতিহাস রচনার

ক্ষেত্রে O Malley এর গেজেটিয়ার গুলির অবদান অপরিহার্য। এছাড়াও "The Tribes and Castes of the Central Provinces of India" ম্যাকমিলন কর্তৃক ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি আন্দামানের বিভিন্ন জনজাতি নিয়ে নৃতাত্ত্বিক আলোচনা স্থান পায় A. R. Radcliffe -এর "The Andaman Islanders: "A Study in Social Anthropology" তে। এছাড়াও Edward J Hoffman ১৩ খন্ডে "Encyclopaedia Mundarica" ১৯৫০ সালে পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি J H Hotton এর সম্পাদিত ১৯৩১ সালের সেন্সাসটি, জনজাতির ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।[১১] ব্রিটিশ শাসনকাল থেকেই ব্রিটিশদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় কিছু নৃতত্ত্ববিদরা এই ভারতের জাতি পরিচয়ে নিজেদেরকে নিযুক্ত করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শরৎচন্দ্র রায়। তিনি প্রথম ভারতীয় যার নৃতত্ত্বচর্চায় সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও, আজও প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে পরিচিত। বিশেষ করে তার গবেষণায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মুণ্ডা ও ওঁরাও জনজাতির সমাজ সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করেছেন । তার প্রথম গ্রন্থ "Mundas and Their Country" এবং ওঁরাও জনজাতির উপর তার রচিত গ্রন্থ গুলি হল "The Oraon of Chotonagpur" এবং "Oraon Religion and Customs", এছাড়াও লেখকরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমেও এই আদিবাসী জনজাতি গুলির পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সেই ক্ষেত্রে বলাই যায় যে ওঁরাও জনজাতির গবেষণার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের লেখা গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাগুলি যথেষ্ট সহায়তা দান করে থাকে। তিনি একজন নৃতত্ত্বের ছাত্র না হয়েও এই বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তার মতে নৃতত্ত্ব হল "to understand Man's natural history,his unique adventure in the inner and outer courts of life and the goal and purpose of human life and

society." তিনি মনে করতেন আদিবাসী হলো যুগ যুগ ধরে প্রবাহমান একটি স্বতন্ত্র-সংস্কৃতিক অস্তিত্ব। সেই সময় বিদেশিদের কাছে এই আদিবাসী জনজাতির পরিচয় ছিল অনেক নিম্নমানের। বিদেশীরা আদিবাসীদের অসভ্য জাতি বলে ডাকতেন। সেই সময় তিনি এই ওঁরাও জনজাতির এক উন্নত সংস্কৃতির পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। তার আদিবাসী জনজাতির ওপর কাজকর্মের জন্য তাকে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় নৃতত্ত্ব সংগঠনের পক্ষ থেকে 'The Father of Indian Ethnology' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। শরৎচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর আদিবাসী ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তার লেখা গ্রন্থগুলো যথেষ্ট অবদান রেখেছে এবং রেখে চলেছে। এছাড়া ভেরিয়ার এলুইন্ জনজাতিদের নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে চিন্তা ভাবনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'Roy's affection to people was scientific, not sentimental.... Anthropology was the search for Beauty expressed in terms of truth.'[১২] ১৯১৯ সালে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব এবং ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্বচর্চা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় আদিবাসী ও অন্যান্য জাতি সংক্রান্ত নৃতাত্ত্বিক গবেষণা আরও বেশি মাত্রায় প্রসার লাভ করতে শুরু করেছিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আদিবাসীদের অভ্যন্তরীণ আত্মীয়তার সম্পর্ক ও সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি বিষয়গুলি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করেছিল। ১৯৬৩ সালে M.N Srinivas তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Social Change in Modern India" প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে তার বিখ্যাত 'সংস্কৃতায়নের তত্ত্ব'।[১৩] যেখানে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে জনজাতিদের মধ্যে সবসময়ই উচ্চ বর্গে উত্তরণের প্রবণতা থাকে এবং তা লক্ষ্য করাও গিয়েছিল । অবশ্য 'সংস্কৃতায়ন' শব্দটি প্রথম ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করেছিলেন।[১৪] তবে তার এই মন্তব্য কিছু

কিছু জনজাতির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হলেও বেশিরভাগ জনজাতির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ করে মুন্ডা ও ওঁরাও জনজাতির ক্ষেত্রে একেবারেই তা ঠিক নয়। ১৯৪৪ সালে নির্মল কুমার বসু তার 'হিন্দু মেথড অফ ট্রাইবস' গ্রন্থে আদিবাসীদের হিন্দুতে উত্তরণের একটা প্রবণতার কথা বলেছেন, যা ওঁরাওদের মধ্যে সবথেকে বেশি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার অপর একটি গ্রন্থ 'ট্রাইবাল লাইফ ইন ইন্ডিয়া' যেটি ১৯৭১ সালে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, এই গ্রন্থে তিনি অন্যান্য জনজাতির ভাষা ও অর্থনীতি সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। এছাড়াও তার ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত 'আধার'প্রবন্ধে জনজাতিদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। জনজাতি সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে ডি.এন. মজুমদার এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত "রেসেস এন্ড কালচারস অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থে তিনি জনজাতিদের সাংস্কৃতিক জীবনের জাতিগত পটভূমি দেখানোর চেষ্টা করেছে, এমনকি তিনি জনজাতিরা যে ভারতীয় জীবনযাত্রার মেরুদন্ড, সেটি তিনি তার গবেষণার মধ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। জনজাতি সম্পর্কিত ডি.এন মজুমদারের গবেষণাগুলিতে ওঁরাও জনজাতির সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ওঁরাও জনজাতি সম্পর্কিত জীবনযাত্রা লিখতে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় নৃতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।[১৫] অন্যান্য নৃতত্ত্ববিদদের মধ্যে অবশ্যই কার্ভে, সিবন, এলুইন ও ফেরিয়ার এর গবেষণা গুলি সর্বভারতীয় আদিবাসীদের ইতিহাস চর্চায় যথেষ্ট গুরুত্ব রেখেছে। ভারতীয় আদিবাসীদের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চায় ধীরে ধীরে কলকাতা শহর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার পর J.Frayers-এর উদ্যোগে কলকাতায় Ethnological সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন থেকেই ভারতের আদিবাসীদের নিয়ে আরো বেশি মাত্রায় চর্চা হতে শুরু

করে।[১৬] J. H. Hotton -এর উদ্যোগে ভারতে প্রথম দ্যা Anthropological Survey of India প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমনকি বিরজাশঙ্কর গুহ তার প্রতিষ্ঠিত 'Zoological Survey of India'-তে একটি নৃতাত্ত্বিক শাখাও গড়ে তুলেছিলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে ভারতীয় জাদুঘরকেও নৃতাত্ত্বিক চর্চা কেন্দ্র হিসাবে রুপান্তরিত করা হয়েছিলো। আদিবাসী ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এগুলির যথেষ্ট অবদান রেখেছে। বিরজাশঙ্কর গুহর প্রচেষ্টায় Anthropological Society-এর সভাপতি থাকাকালীন J. H. Hotton নৃতত্ত্ব চর্চাকে এক অন্য মাত্রায় রূপদান করেছিলেন। আদিবাসীদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রসমীক্ষা জাত তথ্য বর্তমানে আরো বেশি মাত্রায় গুরুত্ব পেয়েছে। পরবর্তীকালে উত্তরাধিকারী হিসাবে Anthropological Survey of India - এর অধিকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, তার জনজাতি সম্পর্কিত সমীক্ষাজাত গ্রন্থগুলি বর্তমানে জনজাতিদের ইতিহাস লিখনে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।সুরজিৎ সিনহা আদিবাসী নৃতত্ত্ব ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তার গবেষণার মূল বিষয়ই হল 'Tribe Caste and Continuum'. তার গবেষণায় এই আদিবাসীদের রূপান্তরের পর্ব কে বিভিন্ন তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন Meditation, Reinterpretation ও Substitution. সুরজিৎ সিনহার প্রকাশিত পত্রিকা গুলির মধ্যে অন্যতম হলো 'Tribes and Indian Civilization'. যা ইতিহাস রচনায় আদিবাসীদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে। এইভাবে ধীরে ধীরে আদিবাসী ইতিহাস চর্চায় যেমন 'Anthropological Survey of India' - এর গুরুত্ব রয়েছে তেমনি আর একটি প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ১৯৫৫ সালে গড়ে ওঠা"কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট"। এই প্রতিষ্ঠান আদিবাসীদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব দান করেছে। এখান থেকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশ

হতে শুরু করে, যে গুলি আদিবাসী ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। Herbert Hope Risley-এর লেখা 'Tribes and Castes of West Bengal' এবং অশোক মিত্রের ১৯৫১ সালের সেনসাস রিপোর্ট জনজাতির ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেছে। এছাড়াও "Handbook on Scheduled Castes and Scheduled Tribes of West Bengal" গ্রন্থটি জনজাতিদের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ সরকারের আমল থেকেই আদিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে যে, তারা ভারতের আদি ধর্মের উপাসক অর্থাৎ এমন এক ধর্মের লোকজন যারা ভারতে আদিকাল থেকে চলে আসা ধর্মের উপাসক ছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের আমলে জনগণনায় আদিবাসীদের ১৮৭১ - ৯১ সাল পর্যন্ত ABORIGIENES বা আদিম ধার্মিক আদিবাসী হিসেবে ধরা হয়েছিল। তারপর ১৯০১-২১ সাল পর্যন্ত এদের ANIMIST বা যারা প্রকৃতির সব কিছুতেই প্রাণের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। ১৯৩১ সালের জনগণনায় TRIBAL RELIGION বা আদিবাসী ধর্ম হিসেবে ANIMIST কে তাদের একজন বলে বলে মনে করা হয়। আর ১৯৪১ সালে TRIBES বা আদিবাসী হিসেবে জনগণনা করা হয়েছিল এবং সেটি এখনো চলে আসছে। অর্থাৎ ব্রিটিশ আমল থেকেই আদিবাসীদের উপর দেওয়া তথ্য ভারত সরকার স্বীকার করে নিয়েছে। তার পাশাপাশি ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান রচনাকালে ড: আম্বেদকরের একক প্রচেষ্টায় আদিবাসীদের ভারতের আদিবাসিন্দা হিসাবে চিহ্নিত করে সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই সংরক্ষণের পরে আদিবাসীরা নিজেদের কে ভারত মাতার প্রথম সন্তান বলে ঘোষণা করেছেন।[১৭] আদিবাসীর আদি শব্দের অর্থ প্রথম আর বাসী শব্দের অর্থ বাসিন্দা অর্থাৎ আদিবাসী কথার অর্থ হল যারা প্রথম থেকে বাস করে আসছে। আদিবাসী বলতে বোঝায় যারা আদিকাল থেকে নিজ নিজ ভূখণ্ডে বসবাস করে আসছে এবং যাদের নিজস্ব ভাষা,

সংস্কৃতি, শাসন পদ্ধতি,ও বিচার ব্যবস্থা আছে। ১৯৫০ সালের সংবিধান রচনাকালে এদের প্রাথমিক প্রাধান্য প্রদানের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। ভারতে বসবাসকারী আদিবাসীদের সংখ্যাও প্রচুর উদাহরণস্বরূপ বিল, মালপারি, মালতো,ওঁরাও, মুন্ডা, কোল ও সাঁওতাল ইত্যাদি। আবার আদিবাসীরা বনবাসী অর্থাৎ শিকার প্রিয়, বর্বর ও অসভ্য জাতি বলেও মনে করা হয়। কিন্তু এটা যে কতটা ভুল ধারণা সেটা বোঝানো খুব মুশকিল। তবে এটা সত্যি আদিবাসীরা প্রকৃতি প্রেমী এবং একই সাথে আদিবাসীরা হিন্দু নয়, বরং প্রকৃতির পূজারী আর শান্তিপ্রিয় জাতি। কোলাহল থেকে দূরে থাকতে এরা বেশি পছন্দ করে। তাই বর্তমানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদিবাসীদের বনাঞ্চলে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তারা অর্থনৈতিক ভাবে পশাদপর। আর্যরা ভারতে আসার পূর্বে আদিবাসীদের অবস্থান অনেক উন্নত ছিল। ভারতীয় আদিবাসীরা বিশেষত প্রোটো অস্ট্রলয়েড গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে আর ইতিহাস প্রমাণ দেয় সিন্ধু সভ্যতা, মেহেরগড় সভ্যতা ও হরপ্পা সভ্যতায় আর্যদের ভারতে আসার বহু আগে থেকেই এরা ভারতে ছিল এবং তাদেরকে উৎখাত করেই আর্যরা ভারতের আদিম বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে। যার জন্য প্রাণ বাঁচাতে আদিবাসীরা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। সুতরাং এটা বলা যেতেই পারে আদিবাসীরা বনবাসী নয় ভারতের মূলনিবাসী এবং তাদেরকে বনবাসী বানানো হয়েছে। আদিবাসীদের বোঝাতে ‘Scheduled Tribe’ শব্দটি প্রথম উল্লিখিত হয় ভারতীয় সংবিধানে। এর পূর্বে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ‘Backward Clasess’ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছিল। এর ঠিক চার বছর আগে J H Hotton এর উদ্যোগে ‘Depressed Classes’ এর অনুসরণে ‘Primitive Tribe’ এর তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, মোটের ওপর আর্য জাতির সংস্পর্শে আসার পূর্বেই যে বর্তমান বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছিল, তারা একটি

বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল- এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করা যায়।এই সভ্যতাই হল আদিবাসীদের সভ্যতা।[১৮] নৃ-তাত্ত্বিক অতুলচন্দ্র সুর লিখেছেন, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এদের কোল জাতি বলে অভিহিত করেছেন। তাদের বংশধরকেই আজ আমরা ভারতের বনে, জঙ্গলে বসবাস করতে দেখতে পাই। বাঙালির সামাজিক, চাষবাস ও মৌখিক আচার অনুষ্ঠানের স্রষ্ঠা এরাই। বাঙালির লোকসংস্কৃতি ও ধর্ম নিহিত আছে এই আদিবাসীদের ধর্মকর্ম, নানা সংস্কার, বিশ্বাস, পূজা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যেই। আদিবাসী বলতে তাদেরই বোঝায় যারা সকলেই বন প্রকৃতির স্বতন্ত্র ভাষাভাষী যারা নিরক্ষর ও প্রযুক্তি বিদ্যায় পশ্চাদপর, যারা একই বংশজাত বলে দাবি করেন এবং জাতির ভিত্তিতে যেসব প্রথা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সেইসব প্রথার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। স্পষ্টই বলা যায়, আদিবাসীরা সেপারেট সোশ্যাল আইডেন্টিটি অর্থাৎ পৃথক সামাজিক সত্তা। বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা এই আদিবাসী বলতে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের কথা বলেছেন। W. H. R Rivers আদিবাসী বলতে বুঝিয়েছেন যে আদিবাসী হলো একটি সরল প্রকৃতির সামাজিক গোষ্ঠী যারা মিলেমিশে একসঙ্গে থাকে এবং একই ভাষায় কথা বলে ও যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্যান্য কাজে যৌথভাবে অংশগ্রহণ করে। এই গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণে একটি সরকারের অস্তিত্ব দেখা যায় । আদিবাসীদের কোন সাধারণ বাসস্থানের কথা উল্লিখিত হয়নি, এর প্রধান কারণ মনে হয় আদিবাসী গোষ্ঠীর যাযাবর বৃত্তির প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। অপরদিকে অধ্যাপক Radcliffe Brown মনে করেন যে, আদিবাসীরা সবসময়ই যে যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য সংকটপূর্ণ সমস্যায় একযোগে কাজ করে তা ঠিক নয়, বহু আদিবাসী গোষ্ঠী রয়েছে যাদের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী একে অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকে। অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর কোন সর্দার থাকে না।[১৯]

Webster's Encyclopaedia of Unabridged Dictionary of the English Language এও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিক ও ভ্রমণকারীদের মতে এরা বন্য জাতি, জঙ্গলের জনজাতি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চোখে এরা অনার্য অনাব্রত অজমান ও মানুষ। বাঙালির ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসাগর এদের সম্পর্কে বলেছেন এরা নিম্নবর্ণ ও অসভ্য। ১৯৫২ সালের উপজাতি উন্নয়ন কমিশনারের রিপোর্ট অনুযায়ী আদিবাসীরা অধিকাংশই অরণ্য বাসী। তাদের ভাষা, ধর্ম ও ঈশ্বর ভাবনায় তারা ভূত-প্রেত ও প্রকৃতির পূজারী।তারা আদিম উৎপাদন ব্যবস্থা নির্ভর কৃষিজীবী, শিকারজীবী ও খাদ্য সংগ্রাহক জনগোষ্ঠী।বাংলায় আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল,লোধা, শবর ও ওঁরাও প্রভৃতি জনজাতির অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে।তাদের বংশধরকেই আজ আমরা ভারতের বনে জঙ্গলে পর্বতে দেখতে পাই। [২০]

আদিবাসীদের ইংরেজি প্রতিশব্দ ট্রাইব এটি একটি উপনিবেশিক পরিভাষা, ইংরেজ শাসকদের দেওয়া ।এর উদ্দেশ্য ভারতীয় মূল স্রোত থেকে এদের পৃথক করে দেখানো, পরে ট্রাইবের পূর্বে সিডিউলড বসিয়ে একটি শব্দ তৈরি করা হয়। সোশ্যাল মার্কেট অর্থাৎ সামাজিক নির্ণায়ক হিসাবে এর পিছনে ছিল ইংরেজ শাসকদের গোপন রাজনৈতিক দিক এবং তা কার্যকরী করতেই তারা সিডিউলড ডিসট্রিক্ট অ্যাক্ট প্রণয়ন করেন। ১৯১৯ ও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা এই ট্রাইব রাই ১৯৩১ সালে সেন্সাস রিপোর্টে এনিমিস্ট অর্থাৎ জড়বাদী বলে চিহ্নিত হয়েছেন।[২১] কোন কোন জাতীয়তাবাদী তাত্তিক আবার তাদের হিন্দু বলেও চিহ্নিত করে থাকেন। G S Ghurye আদিবাসীদের ‘ব্যাকওয়ার্ড সেকশন অফ হিন্দু সোসাইটি’ বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু অধ্যাপক Andre Beteille এর মতে ভারতবর্ষের আদিবাসীরা পরিবর্তনশীল। অনেক আগে থেকেই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির রাজনৈতিক সীমানা ভেঙ্গে পড়েছিল।

ঐতিহাসিকভাবে এই সমাজের এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের সামাজিক ও পরিবেশগত বিভিন্নতা। যদিও অধ্যাপক Andre Beteille এর মতে বাইরের জগতের মানুষের সঙ্গে এদের ওপর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বহু শতাব্দী ধরেই ছিল। জনজাতি সমাজের একাংশ ব্যাপক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃহত্তর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গীভূত হচ্ছিল।[২২] অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু তার "দা হিন্দু মেথড অফ ট্রাইবাল আবসর্পশন" প্রবন্ধে মত প্রকাশ করেছেন যে, অনগ্রসর জনজাতিগোষ্ঠী ক্রমশই আর্থিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তার অংশ হয়ে পড়েছিল। তাদের সংস্কৃতিতে আদিবাসী স্বতন্ত্র্য যেমন দেখা যায় তেমনি তাদের জীবনযাত্রায় হিন্দু সমাজের মূল ধারার সংস্কৃতির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। তারা সাংস্কৃতিক চর্চা করার সঙ্গে সঙ্গে বহু হিন্দু রীতিনীতিকে আত্মস্থ করে ফেলেছেন তবে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে হিন্দুসমাজ বিরোধী প্রবনতাও তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।[২৩]

আদিবাসীদের উন্নতি বিধান এবং তাদের সর্বপ্রকার শোষণ থেকে রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক, আইনগত ও প্রশাসনিক বহু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সংবিধানের ৪৬, ২৪৪, ২৭৫, ৩২২, ৩০৫, ৩৪১ ও ৩৪২ প্রভৃতি ধারাগুলো উল্লেখযোগ্য। সংবিধানের ২৪৪ নং ধারায় এদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুবিধার কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশিলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তপশিলি ভুক্ত আদিবাসী এলাকা গুলির প্রশাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে। তপশিলি জাতিদের যেমন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার অনেকগুলি তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক, যেমন তপশিলির জন্য নিযুক্ত কমিশনার তপশিলি উপজাতিদের জন্য নিযুক্ত। প্রতিটি রাজ্য সরকারের অধীনে তপশিলি

জাতিসমূহের উন্নতির জন্য জনজাতি এবং আদিবাসীদের সার্বিক উন্নতির ব্যাপারে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এগুলি হল সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মীয়করণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সংহতি কাম্য দৃষ্টিভঙ্গি। সংরক্ষণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আদিবাসীদের অন্যান্যদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়। উপনিবেশিক শাসনকালে বহু ব্রিটিশ প্রশাসক অনুভব করতেন যে আদিবাসীদের জীবনধারার উপর হস্তক্ষেপ করার কোন প্রয়োজন নেই, এই কারণে ব্রিটিশ সরকার আদিবাসীদের অন্যান্য জনসাধারণের থেকে আলাদা করে রাখার পক্ষপাতী ছিল। আত্মীয়করণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আদিবাসীদের সম্পূর্ণভাবে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের অঙ্গীভূত করা প্রয়োজন। আদিবাসীদের সমস্যা দূর করার একমাত্র পন্থা হলো তাদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে আধুনিক জীবনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা।[২৪] সংহতি কাম্য দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আদিবাসীদের বিশেষ সক্রিয়তাকে নষ্ট না করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে তাদের শামিল করার প্রচেষ্টা করা উচিত। ভারতীয় সংস্কৃতি হল নকশার মতো যেখানে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। স্বাধীন ভারত সরকার আদিবাসীদের প্রয়োজনকে আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা সহকারে উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করার সুপারিশ করেছে। আদিবাসীদের উন্নয়নের প্রথম নির্দেশিকা নীতি হিসেবে জহরলাল নেহেরুর চিন্তা ধারাকেই আদিবাসী পঞ্চশীল নামে প্রবর্তন করা হয়েছিল। তাদের নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নতি করবে প্রভাবশালী জনগণ তাদের উপর কিছু চাপিয়ে দেবে না- এই ছিল প্রধান নীতি। ভূমি ও বনাঞ্চলে আদিবাসীদের অধিকার কে মানতে হবে, উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদের নিজস্ব নেতৃত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করা উচিত। অঞ্চলে প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশাসন থাকবেনা, আদিবাসীদের সঠিক পথে চালানোর প্রচেষ্টা করতে হবে এবং এইসবের ফলাফল কি ধরনের মানবিক চরিত্র

বিকশিত হল তার উপর আদিবাসীদের উন্নয়ন নির্ভর করবে- এই ছিল পরিকল্পনা। ইতিহাসের মূলধারায় প্রবেশের জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় এই প্রান্তিক আদিবাসীদের অনেক কাল অপেক্ষা করতে হয়েছিল। স্বাধীনতার পর ইতিহাস চর্চার মূলধারায় এরা প্রায় নেই বললেই চলে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরা যে ইতিহাস চর্চা করেছেন সেখানে পাশ্চাত্য প্রভাব ছিল অনস্বীকার্য এবং সেটিও উপনিবেশিক দেশের এক অনিবার্যকতা। জনজাতি বা নিম্নবর্গীয়দের নিয়ে প্রথম যে বিবরণ পাওয়া যায় তাও আবার ঔপনিবেশিক সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা রচিত। ইংরেজরা এদেশে উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে ভারতবাসীদের পরিচয় অনুসন্ধানে চেষ্টা করেছিল। সেখান থেকেই আদিবাসীদের ইতিহাস রচনার প্রারম্ভকাল।[২৫] স্বাধীনতার আদি লগ্ন থেকেই সারা ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি ভারতের জনজাতি গুলির উন্নতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত সরকার। উপনিবেশিক আমলে জনজাতিদের নিয়ে ধারণা এবং মন্তব্যের মিল দেখা যায়, কিন্তু উত্তর উপনিবেশবাদে এই নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা বাহুল্য যে ভারতীয় জনজাতির মানুষদের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম তারতম্য উপলব্ধি করা যায়। অসামরিক এবং সামরিক অফিসাররা তৎকালীন সময়ে তাদের ডায়েরী এবং নানা স্মৃতিকথাতে উল্লেখ করেছেন যে নানা ধরনের জনজাতিদের প্রথম বাসগৃহ ছিল ঝাড়খন্ড। উনিশ শতকের শেষের দিকে মধ্যে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, হো ,পাহাড়িয়া, ভূমিজ, বিরহোর, গোঁদ, ভূঁইয়াদেরকে ব্রিটিশদের দ্বারা আদিম বলে বর্ণনা করা হয়। কালক্রমে তারা উপজাতি হিসেবে পরিচিত হয়।বিগত কিছু বছর ধরে উপজাতি কথাটির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নানা মতভেদ দেখা দিচ্ছে। এটা বলা হয় যে ভারতীয় উপজাতিরাও উপনিবেশবাদের প্রকল্পের বহির্ভূত ছিল না। স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও উপজাতি সম্পর্কে অতি কথিত বিষয়গুলোর চিন্তন পুনরায় ফিরে আসে।

ফলত তাদের আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য বিশেষ সাংবিধানিক বিধান করা হয়। Terence Ranger এবং Lawrence Veiller এর ভারতের জাতীয় ও জাতিগত ভাবাদর্শ নিয়ে যে চিন্তন তাঁর মধ্যে মতবিরোধ আছে। Ranger এর বক্তব্য, উপজাতি ছিল নিছক সাদা চামড়ার সৃষ্টি এবং কালো চামড়ার কল্পনা ১৯৮৩ সালেও Ranger এর আবার এই নিয়েও মতভেদ রয়েছে যে Scheduled Tribe দের সংবিধানই দেশীয় পরিচিতি দিয়েছে।[২৬]

কিংবদন্তী আনুসারে ওঁরাওরা প্রথম ঘর্ঘরা নদীর উত্তর উপকূল অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। পরে ওঁরাওরা সেখান থেকে হরিদ্বারে গমন করে। মহাভারতের যুদ্ধে পান্ডবদের বিরুদ্ধে ওঁরাওদেরকে কৌরবদের বাহিনীতে যুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ওঁরাওরা দক্ষিণ ভারতের দিকে অভিযান করে বৃন্দাবনের জঙ্গল পার করে গুজরাটে প্রবেশ করে এবং পিপরি পট নামে নর্মদা নদীর এক উপকূলে বসবাস শুরু করে। সেখান থেকে তারা রোহতাশ মালভূমিতে ফিরে আসে যা বিহারের সাহাবাদ জেলাতে অবস্থিত। সেখানে তারা রোহতাশ দুর্গ নির্মাণ করে এবং বহু বছর সেখানে জীবন যাপন করে। কিন্তু তারা তাদের এই প্রিয় রোহতাশ দুর্গ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। Xaddi নামের এক বিশেষ উৎসব সেইসময় ওঁরাও দের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যখন সেই উৎসব তারা সুরা পানে মত্ত থাকত সেই সময় তাদের গোয়ালিনী শত্রুদের এই খবর দেয় যে রোহাতাশ দুর্গে তাঁদের সঙ্গে লড়াই করার মত অবস্থায় কেউ আর নেই, সেই সুযোগ পেয়ে শত্রুরা রোহাতাশ দুর্গ আক্রমণ করে। এই লড়াইয়ে ওঁরাও নারীরা প্রথমদিকে শত্রুদের পরাজিত করলেও শত্রুরা ছল প্রয়োগ করে দুর্গ হাতিয়ে নেয়।[২৭] ফলত তারা বিহারের ছোটনাগপুরে পলায়ন করে। S. C. Roy মন্তব্য করেছেন যে কুরুখ কথাটি কারক থেকে এসেছে, কুরুখ ছিল ওঁরাওদের দীর্ঘকালীন বাসস্থানের

পরিচয়। শেষ পর্যন্ত তারা ছোটনাগপুরে এসে বসবাস শুরু করে।[২৮] করুখ হল ওঁরাও জনজাতির অপর নাম এবং তাদের ভাষার নামও করুখ। ভারতের নানান জায়গায় নানান নামে কুরুখরা পরিচিত। বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ কিছু অঞ্চলে তাদের ধাঙ্গড় বলা হয়,সম্বলপুরে তারা কিষান কোড়া বলে পরিচিত ছিল।

সাঁওতালদের সংস্কার আন্দোলন এবং অন্যান্য উপজাতিদেরও সমধর্মী আন্দোলনের উৎপত্তি এবং বিকাশ সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। বর্তমান আলোচনার সীমিত পরিসরে সবগুলির বিচার সম্ভব নয়। শুধু দুটি ব্যাখ্যার সংক্ষেপে উল্লেখ করব।প্রথম ব্যাখ্যা হার্ডিম্যানের গুজরাটের এক আদিবাসী গোষ্ঠী সম্পর্কে। দ্বিতীয়টির প্রবক্তা মার্টিন ওরান্স, বিষয়, সাঁওতালদের বিশিষ্ট আন্দোলনটি, যার বিবরণ আমরা আগে দিয়েছি। হার্ডিম্যান মনে করেন, সংস্কারের আদর্শ হিসেবে উপজাতিরা যে মূল্যবোধ অনুকরণ করে, তা ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর মূল্যবোধ, নিম্নবর্ণের উপর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় এ মূল্যবোধের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে,তিনি আরো বলেছেন যে, ব্যাপকভাবে এই মূল্যবোধ গ্রহণ করাতে জনজাতিদের মধ্যে একটা সচেতনতা গড়ে উঠবে এবং মূল্যবোধের মাধ্যমে ক্ষমতাবান সম্প্রদায় তাদের প্রভুত্ব কায়েম করার সুযোগ হারাবে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণীয় কিনা, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মূল্যবোধ গ্রহণের লক্ষ্য সম্পর্কে জনজাতিদের নিজস্ব ধারণার উপর। এ সম্পর্কে জনজাতিদের ধারণা সঠিক কি ছিল, হার্ডিম্যানের আলোচনা থেকে তা জানা যায় না। সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে সাঁওতালরা স্থানীয় জমিদার, মিশনারী বা প্রশাসনের লোকদের সঙ্গে নানা কথা বলেছে। কিন্তু তা হার্ডিম্যানের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিন্তু ওরান্সের আলোচনার বিষয়বস্তু স্বাতন্ত্র্য। তিনি ওঁরাওদের কথা না বলে সাঁওতালদের কথ বেশি তুলে ধরেছেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ভিন্ন সাঁওতাল ও হিন্দু-সমাজের মধ্যে

সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বিকাশের রূপ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, বিশেষ করে সাঁওতাল সমাজের উপর হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবের রূপ তিনি দেখাতে চেয়েছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, কোন একটা বিশেষ সময়ে সাঁওতালদের মধ্যে হিন্দুদের কোন কোন মূল্যবোধ ও আচার অনুকরণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে যায়।[২৯.] ওরাঙ্গের মতে, হুলের আগেই হিন্দু-সংস্কৃতির কোন কোন দিক সাঁওতালদের প্রভাবিত করেছে। সাঁওতালদের ইতিহাসে হুল একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শুধুমাত্র কয়েকটা অর্থনৈতিক অভিযোগ দূর করার জন্য তারা হুলে নামেনি, তাদের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা আর গোষ্ঠী হিসেবে পদমর্যাদার উন্নয়ন। হিন্দুদের থেকে নেওয়া কিছু কিছু আচার আচরণ থেকে উন্নয়নের লক্ষ্য সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়-যেমন উপবীত ধারণ, এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেব আতপ চাল, তেল, সিঁদুর ও গোবরের ব্যবহার। হুলের সর্বাত্মক ব্যর্থতা এই দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[৩০] হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাব নানাভাবে তখন বেড়ে যায়। এর একটা প্রধান কারণ, সাঁওতালদের নূতন ভাবে উপলব্ধি করে যে সহিংস পথ বা অন্য কোন রাজনৈতিক উপায়ে তাদের মূল লক্ষ্য সিদ্ধ হবে না। রাজনৈতিক পথ পরিহার করে তারা হিন্দুদের মূল্যবোধ এবং আচার অনুসরণের মধ্য দিয়েই তাদের পদ-মর্যাদা বাড়ানোর জন্য সচেষ্ট হল। হুলের ঠিক পরেই তাই খেরওয়ার আন্দোলনের শুরু, যার মূল লক্ষ্য বিশেষ ধরনের উন্নয়ন সাধন। হিন্দুদের মূল্যবোধ গ্রহণের মাধ্যমেই এ উন্নয়ন সম্ভব, এই ধারণা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এর অর্থ, সাঁওতালরা মেনে নিয়েছে, হিন্দু-দিকুরা পদ-মর্যাদায় উন্নততর, আর তারা নিকৃষ্ট। এই মেনে নেওয়াকে ওরান্স বলেছেন Rank Concession Syndrome.এ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গ্রহণীয় নয়। ওরান্স সাঁওতাল সংস্কার-আন্দোলনের সাংস্কৃতিক তাৎপর্যই শুধু আলোচনা করেছেন এবং এর বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে

উপেক্ষা করেছেন। তিনি এমনও বলেছেন যে, রাজনৈতিক পন্থার বর্জন অপরিহার্য হল বলেই হিন্দু মূল্যবোধের অনুকরণ সাঁওতালদের কাছে আরো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হল।[৩১] হুলের ব্যর্থতার পর সহিংস উপায়ের কার্যকারিতা সম্পর্কে সাঁওতালদের অবিশ্বাসের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, তারা রাজনৈতিক পথের অন্যতম মাত্র। রাজনৈতিক পথ সর্বতোভাবে পরিহার করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ সে সময়কার সাঁওতাল মানসিকতার মূল দিক ছিল যে, স্বাধীন সাঁওতালরাজ প্রতিষ্ঠা না হলে দিকূদের প্রভুত্বের অবসান ঘটবে না। অর্থাৎ যে দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যান্য জনজাতি ও সাঁওতালরা তখন দিকুদের সঙ্গে তাদের জটিল সম্পর্কের কথা ভাবছিল, তা একান্তভাবেই রাজনৈতিক। এটা সম্ভবতঃ অনিবার্য ছিল। কারণ জনজাতির সমাজ ও অর্থনীতিতে সঙ্কটের রূপ তখন তীব্রতর হয়েছিল। দিকুদের কর্তৃত্ব আরো গভীরভাবে কায়েম হয়েছিল। হিংসার পথ জনজাতিরা যথাসম্ভব পরিহার করল, কিন্তু বিকল্প রাজনৈতিক পথ সম্পর্কে তারা ভেবেই চলেছিল। শত্রুর উপর যদি সরাসরি আঘাত হানা সম্ভব না হয়, তাহলে কিভাবে তাদের কর্তৃত্ব খর্ব করা যাবে? জনজাতি সমাজের নেতাদের ধারণা ছিল, স্বাধীনরাজ প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে গোটা জনজাতি অঞ্চলে সংঘবদ্ধ প্রচার করতে হবে। তারা জানুক, এককালে তারা স্বাধীন 'মহান জাতি' ছিল। তাদের হারানো গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। জনজাতিদের যদি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত করা সম্ভব হয়, তাহলে দিকুরা পুরনো কায়দায় চলতে সাহস পাবে না। কারণ সংখ্যার দিক থেকে দিকুরা নগণ্য। জনজাতিদের অতীত ইতিহাস চেতনা জাগ্রত করার একটা উপায় হিসেবে জনজাতি সমাজের নেতারা শুধু নিজেদের রাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পে দীক্ষিত হওয়াটাই যথেষ্ট নয়। কিছু কিছু গলদ আছে তা দূর করতে হবে। এককথায় ব্যক্তির নৈতিক রূপান্তর এবং নানা ধরনের সামাজিক কু-প্রথার

বিলোপের মধ্যে দিয়ে একটা নূতন সমাজ গড়ে তুলতে হবে। সংস্কার আন্দোলনের লক্ষ্য শুধু ‘পদ-মর্যাদার উন্নয়ন' নয়, তা বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতির একটা বিশেষ অঙ্গ মাত্র। ঐ সময়কার জনজাতি আন্দোলন সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাদের অনেকেই নূতন সংস্কার আন্দোলন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সংযোগের কথা বলেছেন। [৩২]

খ্রীস্টান মিশনারীর ধারণা যে সংস্কার আন্দোলন আসলে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের আন্দোলন। আয়ারল্যাণ্ডের ফেনিয়ান আন্দোলনের সঙ্গে এর বহু বিষয়ে মিল আছে। ধর্ম এখানে আবরণ মাত্র। স্থানীয় খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বীদের মতে জনজাতির লোকেরা বলাবলি করে যে, ‘জমি আমাদের, আমরা জঙ্গল সাফ করেছি, তাই কোন খাজনা আমরা দেব না। আমরা একজোট হয়ে ইংরেজদের তাড়াব। জামাতাড়ার আর এক মিশনারী কর্নেলিয়সেরও ধারণা, জনজাতিদের আসল লক্ষ্য, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করা। ধীরে ধীরে এই আন্দোলনের রূপান্তর ঘটল। আন্দোলনের নূতন শক্তি এলো স্বর্ণযুগের কিছু কল্পকাহিনী দ্বারা, যেখানে তারা পাবে তাদের মনোমত নেতা, আর পাবে অপর্যাপ্ত জমি, যার জন্য কোন খাজনা দিতে হবে না। হুমকি আর শাসানি দেবার জন্য থাকবে না কেউ। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস জমি ও খাজনা সংক্রান্ত ব্যাপারে ব্যাপক উত্তেজনা ও অসন্তোষ না থাকলে আন্দোলন এত দ্রুত বাড়তে পারতো না।কিন্তু খোলাখুলিভাবে রাজকর্মচারীদের কাছে বার বার তারা যে লক্ষ্যের কথা বলেছে, তা হল, কোন ধরনের খাজনা তারা আর দেবে না,রাস্তাঘাট সারানোর জন্য তারা বেগার খাটবে না কিন্তু এই লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য পুরনো ধর্মকে সম্পূর্ণ ছেড়ে হিন্দুধর্মের সমগোত্রীয় কোন ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে।”[৩৩] এই বিশেষ রাজনৈতিক মেজাজের জন্যই হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-আচরণের কিছু কিছু গ্রহণ করলেও কিছু কিছু জনজাতি মনে

প্রাণে জনজাতি থেকেই গেছে। বিশেষ করে এটা সাঁওতালদের মধ্যে বেশি দেখা গেছে। বস্তুত, তারা হিন্দু হতে চায়নি। তারা শুধু বিশ্বাস করেছিল, হিন্দু মূল্যবোধ গ্রহণের ফলে দিকুদের প্রভুত্বের বদলে সাঁওতাল-রাজপ্রতিষ্ঠা সহজ হবে। সংস্কার আন্দোলনের ফলে সাফা সাঁওতাল, ঝুটা সাঁওতাল ও ওঁরাওদের মধ্যে নূতন এক ধরনের সামাজিক বৈষম্য ও ব্যবধানের সৃষ্টি হল। কিন্তু তা হিন্দু জাতিভেদ প্রথা প্রসূত বৈষম্য বা ব্যবধান নয়। এ ব্যবধানের কারণ ঝুটাদের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে 'সাফা'দের তীব্র অসহিষ্ণুতা তাদের ধারণা ঝুটাদের সংস্কার-বিরোধিতা নূতন সাঁওতাল সমাজ সৃষ্টির পথে বড়ো এক অন্তরায়। সাফাদের কেউ কেউ উপবীত ধারণ করেছিল; কিন্তু তাও হিন্দু বর্ণবৈষম্যের প্রতীক নয়, নেতারা কেউ কখনও বলেনি যে উপবীত ধারণের অধিকার সবার নেই। রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিবেগ মন্থর হয়ে এলে বহু সাঁওতাল তাইরা আবার তাদের আদি ধর্মবিশ্বাসে ফিরে যায় কিন্তু ওঁরাওদের ক্ষেত্রে এই বৈরিতা শুধুমাত্র শ্রেণীবোধের ফল নয়, অর্থাৎ যে দিকু গোষ্ঠীদের তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ বলে ভাবত, শুধু তাদের ক্ষেত্রেই এ বৈরিতা সীমাবদ্ধতা ছিল না। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। ডাল্টনের এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।হিন্দু পাচকের রান্না ভাত সাঁওতালরা কোনোরকমে খেতে রাজি হয়নি; এমন কি পাচক ব্রাহ্মণ হলেও নয়। অথচ ১৮৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় সাঁওতালদের এ মনোবাব দেখা যায়নি। অনশনক্লিষ্টদের মধ্যে সরকার তখন যে খাবার বিলিয়েছে, তার সবটাই ব্রাহ্মণ পাচকের রান্না। এই কারনেই অনেক পণ্ডিত ও গবেষকরা বোঝানর চেষ্টা করেছেন যে ওঁরাও জনজাতির মানুষেরা হিন্দু প্রভাবের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিল ।[৩৪]

শস্য কাটার সময় হোক বা তারপর কাজের সময় থেকে প্রত্যেক সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের আখড়া ও নাচ প্রদর্শন ওঁরাও সমাজের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।তাদের সমাজের জীবন কালের তিনটি মূল ঘটনা উপস্থাপিত করা হতো সেগুলি হল জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু। শিশু জন্মকে ওঁরাওরা বিশেষ সুখবর হিসাবে পালন করতো। কারণ তাদের মতে শিশুর আগমন একটা দম্পতির জীবনে পূর্ণতা আনে। জন্মের ১০-১৫দিনের মধ্যে শিশুর নামকরণের অনুষ্ঠান হতো যা প্রধানত তাদের ঠাকুরদা বা ঠাকুমার নামে নামকরণ হত এবং এরপর শিশুর বেড়ে ওঠার সাথে সাথে অন্নপ্রাশন ও দুবছর বয়সে মাথার চুল কামানো ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে। বিবাহ হল ওঁরাওদের জীবনকালের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং নিজ জনজাতি ছাড়া অন্যত্র বিবাহে সেই সদস্যকে সমাজ বহিষ্কার করত। তবে বিবাহ বিচ্ছেদে কিছু অর্থ জরিমানার বিনিময়ে সেই সদস্যকে সমাজ পুনরায় মেনে নিত। বিধবা ও পুনর্বিবাহ ছিল ওঁরাও সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিধবা নারী তার স্বামীর ভাই বা দাদা কে বিবাহ করতে পারতো। অনুরূপে বিপত্নীক তার শ্যালিকা কিংবা অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারতো ।ওঁরাও সমাজের বিবাহ বিচ্ছেদও ছিল সম্পূর্ণ সামান্য একটা ঘটনা যা স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের সূচনা করতে পারত, এছাড়াও যদি কোন পাত্র-পাত্রী স্বেচ্ছায় পলায়ন করে একসাথে দম্পতির ন্যায় বসবাস করতে থাকে তাহলে পরিবারের লোকজন তাদের ফিরিয়ে এনে বেশ কিছু নিয়ম কানুন মেনে বিবাহ সম্পন্ন করে থাকতো এবং তাদেরকে মেনে নিত। ওঁরাও সমাজের এই ধরনের ঘটনা খুবই সাধারণ, তবে অন্যান্য কোন জনজাতিদের এত উদার মনোভাব ছিল না।[৩৫] এর পরবর্তী জীবনকালে অন্তিম ঘটনা হলো মৃত্যু। ওঁরাও সমাজে প্রাকৃতিক মৃত্যুকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করা হতো, কিন্তু অকাল মৃত্যুকে তারা বিশ্বাস করে যে সেই

আত্মা তাদের গোষ্ঠীর দুর্বল সদস্যের ক্ষতি করতে পারে। সাধারণত ওঁরাও রীতি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিকে দাহ করা হয় তবে অকাল মৃত্যু শিশু, গর্ভবতী নারী, কুষ্ঠ রোগীর মৃতদেহ মাটিতে কবর দেওয়া হত। ওঁরাও সমাজে 'ভাতবড়া' হলো একটা অন্যতম অনুষ্ঠান, যখন প্রতি পরিবারে মৃত্যুর পর প্রতিবছর শবদাহের ভস্ম করার মাধ্যমে পরলোকে থাকা আত্মার শান্তি প্রার্থনা করা হয়। ধূমকড়িয়া ওঁরাও ছেলেমেয়েদের যৌবনকাল পর্যন্ত পঠন পাঠনের স্থান। ধূমকড়িয়াতে তিনটে স্তরে পঠন পাঠন হত। ধূমকড়িয়া শুধুমাত্র শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল না উপরন্তু ওদের আর্থসামাজিক বিষয়েও বিখ্যাত ছিল। তবে বর্তমানে ধূমকড়িয়া কোন উদাহরণ প্রায় নেই বলেই চলে। আখড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সাংস্কৃতির অঙ্গ। আখড়াতে মূলত নানান শারীরিক কসরত, নাচ, ক্রীড়া পরিবেশন করা হতো। প্রত্যেক ওঁরাও গ্রামেই এই আখড়ার উৎসব পালন করা হয়। অন্যান্য জনজাতির মত সাংস্কৃতিক নাচ আছে যা তারা নানান আনন্দ উপলক্ষে প্রদর্শন করে।[৩৬]

ভারতীয় মূলস্রোতের কাছে তাঁরা চিরকালই অবহেলিত। মূলস্রোত হল উচ্চবর্ণীয়দের দ্বারা চালিত সমাজব্যবস্থা। অনেক আদিবাসীরা ব্রাহ্মণদের 'শয়তান' বলে মনে করেন, তারা ব্রাহ্মণদের রান্না করা খাবার খান না, তাদের হাতে জল খান না।এঁদের জন্য নানান প্রকল্প আছে, কিন্তু তবু এঁদের উত্থান তেমন ভাবে হয় নি, নানাবিধ রূপরেখা আছে, কিন্তু সেগুলির রূপায়ণ হলেও বিশেষ করে ওঁরাও জনজাতির মানুষেরা সেই অর্থে সুবিধা পায় নি। সংবিধানে তাঁদের জন্য অধিকার সংরক্ষিত, কিন্তু নিয়ন্ত্রকদের উদাসীনতায় তাঁরা সাংবিধানিক সুফল থেকেও বঞ্চিত। এঁরা 'Sons of The Soil' — ভারতবর্ষের মাটির সন্তান, এঁরা খাঁটি ভারতবাসী। ভারতবর্ষের আদিম বাসিন্দা এঁরাই। অথচ মূলস্রোত এঁদের-কে কোনো দিনও ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

বলে মনে করে না। ভারতীয় সমাজ বিন্যাসে এঁরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থান করছেন। এঁরা কেন ভূমিহীন দেশান্তরি মজুর, শিক্ষায় এঁরা কেন এখনও এত পিছিয়ে, সেচের জল থেকেও এঁরা কেন বঞ্চিত। ভারতবর্ষে উচ্চমধ্যবিত্ত কথাটি বহুল প্রচলিত। কিন্তু তাঁদের মধ্যে একজনও উচ্চমধ্যবিত্ত নেই কেন? মেদিনীপুর,বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার আদিবাসী এলাকাতে এখনও পানীয় জলের অভাব কেন? জলপাইগুড়ি চা-বাগান এলাকায় বহু Scheduled Tribes নির্বাচন কেন্দ্র আছে।তবু কেন সেখানে তারা আই টি ডি পি নামক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না? মহাশ্বেতা দেবীর ভাষায়, আদিবাসী কল্যাণে বাজেটের টাকা দীর্ঘকাল খরচ হয়েছে মূলত অন্যান্য খাতে। সরকার আগে এঁদের জন্য অল্প টাকা দিত, এখন টাকা বরাদ্দ বেড়েছে। তবুও এঁদের জীবনে সেই ব্যায়ের কোন প্রতিফলন নেই কেন? কেন এঁরা আজও "অপরাধ প্রবণ জাতি" ও "বিমুক্ত জাতি" বলেই অভিহিত হবে? জাতের কারণে এঁরা এখনও কেন নিগৃহীত হবে? মহাশ্বেতা দেবী 'গঙ্গা-যমুনা-ডুলং-চাকা' নামক প্রবন্ধে বলেছেন : "মূলস্রোত ও ভারতের আদিবাসী তফসিলিদের জীবনস্রোত চিরকালই আলাদা থেকেছে, আলাদা করে রেখেছি আমরাই। এই বিচ্ছিন্নতা রুখতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উচ্চবর্ণীয় শাসকগোষ্ঠীর অর্থাৎ মূল স্রোতের নেতিবাচক ও উদাসীন মনোবৃত্তির পরিবর্তন।[৩৭] এরাই ভারতের প্রকৃত স্বদেশি বা প্রাচীনতম অধিবাসী। তাঁদের কাছে আর সকলে বিদেশি। এই প্রাচীন জাতির নৈতিক দাবি ও অধিকার হাজার হাজার বছরের পুরোনো। মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন, 'ভারতের সমাজ ওঁদের শ্রম নিয়েছে, ভারতের সভ্যতায় ওঁদের অবদান আছে মিলেমিশে। ভারতের সংস্কৃতি আদিবাসী সংস্কৃতি থেকে অনেক নিয়েছে। এসব স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। আরো, হাজার হাজার বছর ধরে মূলস্রোত থেকে আদিবাসীদের বিভিন্ন বিষয়ে স্বীকৃত না দেওয়ার নীতি (অলিখিত) চালিয়ে এসেছে, স্বাধীন ভারতেও সেই ঐতিহ্যই

অক্ষুন্ন আছে। ড. এ কে পাণ্ডে আদিবাসীদের প্রসঙ্গ ক্রিটিক্যাল সোসোলজির দৃষ্টিতে দেখার সময় মূলস্রোত বিষয়ে লিখেছেন :'It is the historical circumstance, particularly the British regime, which contributed in crystallizing the myopic vision of the Indian mainstream where one of the potential segments of the Indian society-tribes-was treated either as insignificant or barbarians to the Indian civilisation and culture. Even their participation in freedom struggle, for instance, Tana Bhagat Movement was not given due recognition. Most shocking is that this conception of Mainstream still prevails and is being perpetuated even after the Independence of the country.....[৩৮]

স্বাধীন ভারতে তো মূলস্রোতের নিয়ন্ত্রক উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরাই শাসন চালাচ্ছেন। তাঁরা ৫০ বছর ধরেই আদিবাসীদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ, শোষণ-পীড়ন, বঞ্চনা ও দাবি-দাওয়া ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন থেকেছেন। এই কারনেই ওঁরাও জনজাতির মানুষেরা নিজেদের আলাদা করে রেখেছে, কোন ভাবেই সমাজের মূলস্রোতে আসতে পারছে না এমনকি অনান্য জনজাতি,তথা সাঁওতাল জনজাতির মানুষেরা কিছু সুযোগ সুবিধা পেলেও এঁরা বেশিরভাগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেই যাচ্ছে। যুগ-যুগান্তরের এই সমস্যা তাই আজও নিরসন হয়নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার পরেও এই সমস্যা যে বিস্ফোরণের মুখে, অনেক বিশেষজ্ঞ তার উল্লেখ করেছেন।[৩৯] ভারতীয় ইতিহাসের পাতা থেকে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস গড়ার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্বপুরুষদের অবদানের কথা জানতে পারে না। আদিবাসী সংগ্রাম, গণচেতনা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মত্যাগ ও অবদান ভারতীয় ইতিহাসে চিত্রিত হয়নি। এর ফলে

আদিবাসীদের মননে ও চেতনে স্বতন্ত্র সত্তার বিপন্নতা বোধ জন্মাচ্ছে, যার পরিণতি আর যাই হোক, কখনই শুভ হতে পারে না। মূলস্রোতকে এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। তা না হলে এই বিপন্নতাবোধ থেকেই জন্ম নিতে পারে সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো আর একটি গণ-অভ্যুত্থান। আর ভারতবর্ষের মূলস্রোত কিন্তু এর দায়ী থাকবে। ভারতের অখণ্ডতা ও স্থিতিশীলতার প্রশ্নে তা কখনোই মঙ্গলকর নয়। ব্রিটিশ জন্য প্রথম ভারতীয় জনসংখ্যার মূলস্রোত থেকে আদিবাসীদের পৃথক করে রাখার প্রক্রিয়া সূচনা করে যায়।[৪০] বিশ শতকের সূচনায় ঔপনিবেশিক সরকার আদিবাসীদের অধিকতর নিঃসঙ্গ করার অভিপ্রায়ে বেশ কতগুলি নতুন আইন প্রবর্তন করে। তারা পৃথকীকরণের পথটি সুচিন্তিত ভাবেই অবলম্বন করেছিল। তবে এটা এতটাই স্বেচ্ছাকৃত ছিল যে ঘটনাক্রমে তা আদিবাসী বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয়। সরকারের তরফে যুক্তি হল, আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীদের হাতে চলে যাবার ফলে যে-দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে তা এতে দূরীভূত হবে এবং অ-আদিবাসীদের সংস্পর্শে আসার কারণে আদিবাসী সত্ত্বার যে বিলুপ্তি ঘটছে, তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যে হারিয়ে যাচ্ছে—এই যে De-Tribalisation তা বন্ধ হবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মূলস্রোত থেকে আদিবাসীদের পৃথক করে রাখা হলেও আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আদিবাসী শোষণ কিন্তু নির্বাধ ভাবেই ঘটে চলেছে। শাসকগোষ্ঠী আদিবাসীদের স্বতন্ত্রভাবে যে সমস্ত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করে সেসব জায়গায় একমাত্র ইংরেজ আমলা, মহাজন, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্তা ব্যক্তিরাই প্রবেশ করতে পারতেন। এঁরাই ভালো করার নামে ক্ষতিই করতেন, শোষণ করতেন। ফলে আদিবাসীদের মধ্যে নানা সমস্যা তৈরি হত, ব্রিটিশ শাসক আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকাকে ‘তপশিলি অঞ্চল' বলে চিহ্নিত করে। আদিবাসীদের ভৌগোলিকভাবে

সীমায়িত করা হল বটে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হল না। পৃথকীকরণ (Segregation) বরং আদিবাসীদের ক্ষেত্রে ক্ষতিই করল।

স্বাধীন ভারতে জওহরলাল নেহেরু আদিবাসী উন্নয়নে 'পঞ্চশীল নীতি' তৈরি করেন। আদিবাসীদের ভারতীয় জীবনের মূলস্রোতে অঙ্গীভূত করা হবে, না পৃথক করেই রাখা হবে নেহেরুর সময় এ-দ্বন্দ্ব ছিল প্রকট। কেউ আত্তীকরণ (Assimilation), আবার কেউ কেউ পৃথকীকরণ (Segregation)-কে আদিবাসী কল্যাণের সঠিক পথ বলে বিবেচনা করলেন। এমন ধন্দের মাঝেই নেহেরু-নীতির উদ্ভাবনা। আদিবাসী উন্নয়নে নেহেরুর ভূমিকা বিষয়ে বি পাকেম এক সেমিনার পেপারে লিখেছেন : 'In assimilation-segregation continuum Nehru's policy rather tilted heavily towards the side of segregation.' বি কে নেহেরু, এইচ কে বারপুজারি, ভি ভেন্টক রাও, ডি সি গোস্বামী, রাধাকৃষ্ণাণের মতো প্রশাসক, ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সাংসদ, সমাজকর্মীরা নেহেরু-নীতির তীব্র বিরোধিতা করেন। কারণ, নেহেরু নীতি ব্রিটিশ নীতিরই সমগোত্রীয়। বি কে রায় বর্মন, নরি রুস্তমজি প্রমুখের মতো সমাজবিজ্ঞানী-প্রশাসকরা এ-নীতির প্রশংসা করলেও নীতিটি-কে সংহত ও কার্যকর করতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং আমলাদের গরিমসিকে-ই অন্যতম অন্তরায় বলে মনে করেছেন।

ভারতীয় আদিবাসী নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস চর্চায় ভেরিয়ার এলুইন (১৯০২-১৯৬৪) এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী ছিলেন । তার আদিবাসী সংক্রান্ত সমস্ত মতামত গুলি অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ কারন নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসে তিনি ভারতের আদিবাসীদের রূপকল্পে একটি রোলমডেল তৈরি করেন, যা সাঁওতাল ও ওঁরাও জনজাতির ক্ষেত্রে ও কার্যকরী বলে তিনি মনে করেন। তাঁর এই আদর্শ আদিবাসীর

চিত্রণটি বর্তমানের প্রেক্ষিতে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু তিনি স্বাধীনতার পরেও আদিবাসীদের চলচিত্র অঙ্কন করেন, এবং ভারতের রাজনীতিতেও আদিবাসী বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেন, তাই তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এই মুখবন্ধে প্রয়োজন।*তিনি একজন ব্রিটিশ হয়েও ভারতের আদিবাসীদের খুবই ভালবাসতেন। এমনকি তিনি আদিবাসী সমাজে বিবাহ করেছিলেন। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করলেও তিনি যাজক হিসাবে ভারতে এসেছিলেন। তার গবেষণা গুলি সবই হলো নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষাজাত। তার মূল বক্তব্য হলো, আদিবাসীরা অধিকাংশই Loss of Nerve -এর শিকার। বন-জঙ্গল থেকে আদিবাসীদের উৎখাত করার ফলে এবং উচ্চবর্গের দ্বারা শোষণের ফলে তারা আজ প্রায় হতাশাগ্রস্থ । এলুইন -এর গ্রন্থ গুলি ভারতীয় আদিবাসী ইতিহাস চর্চায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।* ভারত সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা ভেরিয়ার এলুইন আদিবাসীদের আদি সংস্কৃতি ও জীবনচর্চাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং উচ্চবর্ণীয় শাসক গোষ্ঠীর প্রভাব-প্রতাপ, শাসন-শোষণ থেকে মুক্ত রাখতে ন্যাশনাল পার্ক-জাতীয় উদ্যানের নীতি তৈরীর কথা বলেছিলেন। যারা এঁদের কল্যাণ সাধনের দায়িত্বে থাকবেন, তারা যতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত, মনের দিক থেকে সৎ ও আন্তরিক হবেন না ততদিন এই উদ্যান ব্যবস্থা টিকে থাকবে। জনজাতিরা সেখানে ওদের মতো করে স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে থাকবেন। 'দ্য অ্যাবরিজিনালস' নামক গ্রন্থে এই পার্ক পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি লিখেছেন, এই পরিকল্পনা অনেকটা বাধ্য হয়েই নেওয়া প্রয়োজন। সভ্য মানুষ আজও আদিবাসীদের প্রায় বিনা পয়সায় বা নামমাত্র মজুরি দিয়ে খাটিয়ে নিতে চায়, সুযোগ পেলেই শোষণ করে। তাঁরা তাঁদের অধিকারের কথা বলতে গেলেই, বা এ সব শোষণের ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেই সঙ্গে সঙ্গেই এখনও তাঁদের উগ্রপন্থী হিসেবে তকমা লাগানো হয়। সুযোগ পেলেই শিক্ষিতরা

এঁদের গণপ্রহার করেন, এঁদের মহিলাদের বিবস্ত্র করে 'হাঁটানো হয় প্রকাশ্য রাস্তায়।[৪১] আসলে, এলুইন ছিলেন আদিবাসী সত্ত্বার বিলুপ্তি (De-tribalisation) কেন্দ্রিক যে কোনো প্রকার প্রক্রিয়ার ঘোরতর বিরোধী। তার ন্যাশনাল পার্ক-পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত অর্থ, আদিবাসীরা দিকু-সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব পরিবেশগত পরিমণ্ডলের পবিত্রতায়, স্বমহিমায়, স্বদীপ্তিতে বাস করুক। স্বাধীনতার পরেও ছোটনাগপুর মালভূমিতে তখন আদিবাসীদের গোষ্ঠী চেতনা (ethno-centrism) তীব্র হয় এবং 'Ethno-nationalism'ও প্রকট হয়। এমন চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য প্রতিটি গণপরিষদের কিছু সদস্য আদিবাসীদের মূলস্রোত সমাজে অঙ্গীভূত করার পরিবর্তে তাদের জন্য "Tribalistan' দাবি করেন। এ ভি ঠক্কর এবং গান্ধি-মতবাদে বিশ্বাসী আত্তীকরণবাদীরা (Assimilationists) ঔপনিবেশিক স্বাতন্ত্র্যকরণ পদ্ধতির পরিবর্তে মূলস্রোত সমাজের সাথে আদিবাসীদের মিশিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে জোর সওয়াল করেন। এলুইন এই প্রভাব বিষয়ে সর্বদাই সন্দিহান ছিলেন। তাঁর স্পষ্ট অভিমত, আদিবাসীদের কল্যাণ করতে হলে মূলস্রোত সমাজের সভ্যদের 'মনের ও চরিত্রের উন্নতি' করতে হবে। স্বাধীন ভারতে এতদিনেও সেটা হয়ে ওঠেনি বলে আদিবাসীদেরও অগ্রগতি আসেনি। আদিবাসীদের অগ্রগতিকে ভারতের জাতীয় জীবনের সার্বিক অগ্রগতির অংশ হিসেবে দেখতে হবে। আদিবাসীরা হলেন আদি ভারতের প্রতিনিধি। এঁদের সাংস্কৃতিক রূপরেণুর (cultural traits) ছাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে, আত্মগর্বিত আর্য ভারতের সংস্কৃতির উপর। ভারতের মূলস্রোতের সমাজ যেন সেকথা ভুলে না যায়। সাম্প্রতিককালে নৃতাত্ত্বিকদের ওপর একটা থিয়োরির বড়োই প্রকোপ হয়েছে। রিভার্স (Rivers) এর মতে উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে আসার ফলে মেলানেসিয়ার আদিম অধিবাসীদের জনসংখ্যা বিরলতর হয়ে লুপ্ত হতে চলেছে। তারপর

থেকেই নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে এই ভয় প্রবল হয়ে ওঠে। সভ্যতার সংস্পর্শ আদিম জাতির পক্ষে একটা অকল্যাণের ব্যাপার। ভারতের আদিবাসীদের নিয়ে যেসব ভারতীয় এবং ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন, তাঁদের অনেককে এই সভ্যতা-সংস্পর্শ থিয়োরিটা খুব জোরে স্পর্শ করেছে। ভারতের আদিবাসীদের সম্বন্ধে এঁরা বলেন, উন্নত সভ্যতার দ্বারা 'আক্রান্ত হওয়ার ফলেই আদিবাসীরা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে, মনোবল হারিয়েছে ও জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলছে। এঁদের প্রস্তাব, ভারতের আদিবাসীর গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিকে একেবারে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখা উচিত, যাতে কোনো বাইরের বিজাতীয় 'উন্নত' সংস্কৃতির প্রভাব আদিবাসীর সংসারে প্রবেশ না করে। ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিকদের অধিকাংশই এই প্রসঙ্গে হিন্দু-সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই এক হাত নিয়েছেন। দু-একজন দুঃসাহস করে খ্রিস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধেও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।[৪২]ভারতের স্বাধীনতার পরেই মিঃ ভেরিয়ের এলুইন (Mr. Verrier Elwin) এই থিয়োরি নিয়ে বড়ো বেশি মুখর হয়ে উঠেছেন। তাঁর গর্ব, তিনি দশ বছর ধরে আদিবাসী সমাজে বাস করছেন, সেজন্য তাঁর মতন অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি ক'জনেরই বা আছে? তিনি এরই মধ্যে ভারতের আদিবাসীদের সম্বন্ধে অনেকগুলি ছোটো-বড়ো গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন। প্রত্যেক গ্রন্থেই তিনি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতের আদিবাসীসমাজ সভ্যতার সংস্পর্শে এসেই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। আদিবাসী সমাজকে তাদের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখবার জন্য তিনি এক পরিকল্পনাও বিবৃত করেছেন–ন্যাশনাল পার্ক (National Park) পরিকল্পনা। যেসব আদিবাসী উন্নত সভ্যতাকে পরিহার করে দূরে সরে থাকতে পেরেছে তাদের সম্বন্ধে মিঃ এলুইন একটা বর্ণনা দিয়েছেন। খাঁটি আদিবাসীরা অর্থাৎ যেসব আদিবাসী দূষিত সভ্যতার সংস্পর্শে আসেনি, তারা নিরীহ ও সুখী মানুষ। স্বাভাবিক আনন্দের ঐশ্বর্যে ভরপুর, তাদের জীবন

স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন। মাথার ওপর বোঝা নিয়ে আদিবাসী নারী হয়তো ক্ষণিকের জন্য পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে নীচের শোভাময় দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে থাকে, পুরুষেরা কাঠ কাটে, মেয়েরা পাতা কুড়োয়, বৃদ্ধেরা মাদুর ও ডালা তৈরি করে, ছেলেরা মাঠে মাঠে পাখি আর ইঁদুর তাড়া করে বেড়ায়। হঠাৎ বাঁশির রবে সুর উথলে ওঠে, কুঞ্জতরুর আড়ালে আড়ালে প্রেমিকের গান প্রেমিকাকে আহ্বান করতে থাকে, সন্ধে হয়ে আসে, ঘরে ফিরে সকলে মহুয়ার চাটনি আর পেট ভরে টাটকা তালের রস খেয়ে শরীর জুড়িয়ে নেয়। এই প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যেও এক একটা উত্তেজনার অধ্যায় আসে, হাতি ও বাঘের সঙ্গে সংঘর্ষ। বিবাহের উৎসবে ও নৃত্যে মাতোয়ারা।ছেলে-মেয়েরা অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে, চুলে ফুল গুঁজে দলবেঁধে নাচে, প্রবীণেরা দেবতার তুষ্টি বিধান করে"। [৪৩] খাঁটি পাহাড়ি আদিবাসীর সংসারের যে রূপ মিঃ এলুইন বর্ণনা করেছেন, সেটা কোনো আধুনিক মেঘদূতের কাব্যময় বিবরণের অংশ বলে মনে হবে। বর্ণনাটির প্রতি ছত্রে 'মধু ক্ষরন্তি', কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এমন মধুময় আদিবাসী গ্রামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এভাবে বর্ণনা করা নৃতত্ত্ববিদ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সাজে না, এটা শখের টুরিস্টের মতো অতিরঞ্জিত অলংকারবহুল বর্ণনা। যেসব আদিবাসী পাহাড় ও অরণ্যের দুর্গম নিভৃতে বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত জীবনযাপন করছে, তাদের জীবনে কোনো সমস্যাই নেই—এমন অভিমত মিঃ এলুইনের আত্মপ্রসন্নতা মাত্র। স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ জীবন বলতে তিনি কি বোঝেন? গোষ্ঠীগত সর্দারের শাসন কি নিতান্তই স্বৈরতন্ত্র-বর্জিত? গোষ্ঠী পঞ্চায়েতের রীতিনীতি কি সত্যই বিশুদ্ধ সাম্যবাদ অথবা গণতন্ত্র? আর শুধু হাসি কলরবই কি কোনো সমাজের সুখ নির্ণয়ের একটা বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি? মাঠে মাঠে ইঁদুর তাড়া করে বেড়াবার অবাধ অধিকারই কি ব্যক্তি-স্বাধীনতার (Civil Liberty) চরম উদাহরণ? আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে যেসব আদিবাসী

দূরে সরে রয়েছে, তাদের সমাজে কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ অবশ্যই আছে যা ভারত-সভ্যতা প্রভাবিত আদিবাসীদের মধ্যে নেই। কিন্তু আবার এর উলটোটাও সত্য।মিঃ এলুইন গভর্নমেন্টের আবগারি নীতি পছন্দ করেন না, কারণ তার দ্বারা গভর্নমেন্ট আদিবাসীদের একটা জাতীয় অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। আদিবাসীরা চিরকাল নিজের ঘরের তৈরি মদ্য পান করে এসেছে। গভর্নমেন্টের আবগারি নীতি বস্তুত মদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাকে গভর্নমেন্টেরই একচেটিয়া (State Monopoly) করে দিয়েছে। আদিবাসীদের মদ্যপানের অভ্যাস সংযত হোক, মিঃ এলুইন তা কামনা করেন না।এর ফলে তাদের যেসব নৈতিক ও শারীরিক হানি হয়ে থাকে, সে সম্বন্ধে মিঃ এলুইন নীরব। তিনি আদিবাসীদের মানসিকতাকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করতে পারেননি। তাঁর দুঃখ, আবগারি বিভাগ আদিবাসীদের মদ্যপানের স্বাধীনতায় বাধা দিচ্ছে।ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকেরা মদ্যপান বর্জন সম্পর্কে যে আন্দোলন করেন, কংগ্রেস ও জাতীয় নেতারা মাদক বর্জনের জন্য যে প্রচারকার্য করেন, মিঃ এলুইন তাতেও বিরক্ত।আমার গবেষণার কাজে বিভিন্ন আদিবাসী গ্রাম সার্ভে করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে ওঁরাও জনজাতির লোকেরা এখনও নিজেদের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে নিজেদের ঘরের তৈরি মদ খেয়ে আনন্দে মেতে থাকেন। এমন কি এই রীতি যুগের পর যুগে পালন হয়ে আসছে। ভারত-সভ্যতার সংস্পর্শে যেসব আদিবাসী এসেছে তারাও এমন কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ অর্জন করেছে যা মিঃ এলুইনের আনকোরা আদিবাসীদের মধ্যে নেই।যেসব আদিবাসী ভারত-সভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত হয়েছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভেবেই মিঃ এলুইন শঙ্কাকুল হয়েছেন। তাঁর মতে এই শ্রেণির আদিবাসী সমাজেরই মনোবল ভেঙে গেছে ও ব্যক্তিত্ব দুর্বল হয়েছে। মিঃ এলুইন আদিবাসীর এই বিনষ্ট মনোবলের একটা নামও দিয়েছেন loss of

nerve অর্থাৎ জীবন সম্বন্ধে একটা ঔদাসীন্য। আত্মমর্যাদাবোধের অভাব। বেঁচে থাকার যে একটা অর্থ আছে, সে সম্বন্ধে চিন্তার অভাব। মিঃ এলুইনের মতে উন্নত বিজাতীয় সংস্কৃতির সংঘাতে পড়ে গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এদের জীবন যেন ভূমিকাভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তার ফলেই মনের এই শোচনীয় দশান্তর ঘটেছে। সুতরাং মিঃ এলুইন বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবি করেছেন। এই দাবির বিষয়গুলিই হলো এলুইন-এর একটি সূত্র এবং ন্যাশনাল পার্ক থিয়োরির ভিত্তি। আমার গবেষণায় আমি লক্ষ্য করেছি যে এলুইন আদিবাসী সম্পর্কে তিনি যা ভেবেছিলেন তা প্রয়োজন মাফিক বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হলেও বর্তমানে ওঁরাও জনজাতি তথা অনান্য জনজাতির বেহাল দশা অনেকাংশেই থেকে যেত। আদিবাসীদের এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যারা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার পদ্ধতি এখনও গ্রহণ করেনি। জঙ্গলের একটা অংশ আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে, তারপর সেই ভস্মাচ্ছাদিত জমির ওপর আলগোছে শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই হলো ঝুম চাষ। আশ্চর্যের বিষয়, এই অতিক্ষতিকর এবং স্থূল কৃষি পদ্ধতিকেই মিঃ এলুইন আদিবাসীর সকল উন্নতির মূলাধার বলে মনে করেন। তিনি বলেন, ঝুম চাষ হলো আদিবাসীদের একটা ধর্মগত সংস্কার। আদিবাসীরা ধরিত্রীমাতার বুক লাঙ্গল দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায় না। লাঙ্গল-প্রথা তাদের কাছে ভয়ানক একটা নিষ্ঠুর প্রথা।[৪৪] কিন্তু জঙ্গল হলো একটি রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সম্পদ এবং এই জঙ্গলও একটা অনন্ত রাজ্য নয়, নষ্ট করলে একদিন ফুরিয়ে যাবে নিশ্চয়। কয়েক মণ জওয়ার ভুট্টা বা ধান উৎপন্নের জন্য এক একটা শাল-সেগুনের জঙ্গলকে ছাই করে ফেলতে হবে, এই প্রথা বর্তমান জগতে চলতে পারে না। ঝুমচাষি আদিবাসীর পক্ষেও এভাবে জঙ্গল লোপ করা মঙ্গলকর নয়। আদিবাসীদের ঝুম চাষ প্রথার ফলে ভারতের জঙ্গলের কী ক্ষতি হয়েছে, তা ভারত গভর্নমেন্টের সরকারি রিপোর্টে এবং বহু বিশিষ্ট

ইউরোপীয় নৃতাত্ত্বিকের দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে। এই ভাবে যদি জঙ্গল গুলো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানব সমাজের অস্তিত্ব ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। আমি আমার গবেষণায় ওঁরাও জনজাতির মানুষেরা কি ভাবে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে প্রকৃতি কে বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তাও দেখানোর চেষ্টা করেছি। তাই বলা যেতেই পারে প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ওঁরাও জনজাতির সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান গুলোর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। J. Forsyth বলেন – "যত পাহাড়ি উপজাতি আছে তার মধ্যে বৈগারা হলো জঙ্গলের সবচেয়ে ভয়ানক শত্রু। হাজার হাজার বর্গমাইল শালের বনকে তারা ঝুমচাষের জন্য ধ্বংস করেছে। আঠা নেবার জন্য তারা সর্বত্র বড়ো বড়ো গাছগুলি ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়।[৪৪] বহু আদিবাসী গোষ্ঠী আছে যারা পূর্বে ঝুম-প্রথায় অভ্যস্ত ছিল পরে লাঙ্গল-প্রথা গ্রহণ করেছে। কিন্তু উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করে তারা অবনত হয়েছে, মিঃ এলুইন কোনোভাবেই তা প্রমাণ করতে পারেন না। চট্টগ্রামের চাকমারা পূর্বে ঝুমচাষি ছিল, বর্তমানে তারা লাঙ্গল গ্রহণ করেছে, ওড়িশার শবররা ঝুমচাষ ছেড়ে দিয়ে উন্নত কৃষিপদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এর ফলে তাদের কোনো অবনতি হয়নি। এ বিষয়ে মিঃ এলুইন এর বক্তব্য "To many of the tribesmen this is more than a form of agriculture, it is a way of life." অর্থনৈতিক উন্নতি যে সামাজিক মানেরও উন্নতি করে, মিঃ এলুইন বোধহয় এই সরল বৈজ্ঞানিক সত্য স্বীকার করেন না। ঝুমচাষ না করে লাঙ্গল-প্রথা গ্রহণ করলে তাঁর প্রিয় বৈগাদের ভাণ্ডারে বরং একটু বেশি পরিমাণ ফসল আসবে। কিন্তু এরই ফলে বৈগাদের জীবনচর্যার পদ্ধতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, এরকম বিচিত্র ধারণা বোধহয় মিঃ এলুইন একাই পোষণ করেন। ঝুম চাষ হলো, কুসংস্কার অজ্ঞতা আলস্য ও অপরিণামদর্শিতার পদ্ধতি। এ পদ্ধতি কোনো আদিবাসীর জীবনচর্যার পদ্ধতি হতে পারে না।[৪৫] মিঃ এলুইন

যতই বলুক, ঝুমচাষ আদিবাসীদের জীবনচর্যার পদ্ধতি নয়। এ পদ্ধতি তারা সুযোগ পেলে সহজেই ছেড়ে দেয় ও নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করে। মহীশূরের কতগুলি আদিবাসী গোষ্ঠী, গুজরাটের কোলি গোষ্ঠী, থানা জেলার ঠাকুর গোষ্ঠী, খান্দেশের ভীলেরা এরা সকলেই আগে ঝুমচাষি ছিল, কিন্তু বর্তমানে লাঙ্গল-চাষি হয়ে গেছে। মিঃ এলুইনের মতো G.A.Grierson ও ঝুমচাষকে আদিবাসীর জীবনেরই একটা পদ্ধতি বলে যদিও মনে করেননি, কিন্তু তিনিও ঝুমচাষকে ক্ষতিকর পদ্ধতি নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ঝুমচাষ ক্ষতিকর কি না, এ সম্বন্ধে নৃতাত্ত্বিক বা ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর বিজ্ঞতাকে আমল না দিয়ে, সত্যিকারের উদ্ভিদবিজ্ঞানীর অভিমতকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। মিঃ নিকলসনের অভিমত: ঝুমচাষের ফলে জঙ্গলের নিদারুণ ক্ষতি হয়। মানুষের যতরকম প্রথা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো ঝুম চাষ প্রথা, এর ফলে শুধু বনের উদ্ভিজ সম্পদ নষ্ট হয় তা নয়, মাটির উর্বরাংশ ক্ষয় হতে থাকে (erosion of soil)।[৪৬] ডাঃ হটন সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করেন যে এই প্রথা (ঝুমচাষ - shifting cultivation) আর্থিক উন্নতির বিরোধী এবং সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। অবশ্য অত্যন্ত কঠোর নিয়ন্ত্রণে অতি সংক্ষিপ্ত সীমাবদ্ধ অঞ্চলে ঝুমচাষের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। S. C. Roy ছোটনাগপুরের বিরহোর এবং কোরোয়াদের বিষয়ে অবশ্যই এই মন্তব্য করেছেন যে, তারা পূর্বে ঝুমচাষে অভ্যস্ত ছিল, কিন্তু সরকারি জঙ্গল বিভাগের আইন অনুসারে জঙ্গল পুড়িয়ে ঝুমচাষ নিষিদ্ধ হওয়ায় তারা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে এবং মনোবল অবনত হয়ে গেছে।[৪৭] তারা যেন জীবন সম্বন্ধে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে (loss of interest in life)। মিঃ এলুইন বারংবার শরৎচন্দ্র রায়ের এই মন্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁর loss of nerve থিয়োরিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিরহোর ও কোরোয়াদের জীবন সম্বন্ধে যে উৎসাহহীনতা দেখা যাচ্ছে,

সেটা ঝুমচাষ বর্জনের জন্য হয়নি। তারা একেবারেই চাষ বর্জন করে প্রায় প্রস্তরযুগের অধম মানুষের মতো ক্ষুধার্ত যাযাবরে পরিণত হয়েছে। চাষ বর্জন করাটাই হলো এই অধোগতির প্রধান কারণ, ঝুম চাষ বর্জন করাটা প্রধান কারণ নয়। বিরহোর ও কোরোয়ারা ঝুমা চাষ প্রথা বর্জন করে লাঙ্গল-প্রথা গ্রহণ করলে নিশ্চয় জীবন সম্বন্ধে উৎসাহহীনতা দেখা দিত না। গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাটাও একপেশে হয়েছে। বিরহোরদের ঝুমচাষ যেমন বন্ধ করা হয়েছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যদি তাদের লাঙ্গল পদ্ধতিতে অভ্যস্ত করিয়ে নেবার কোনো সরকারি ব্যবস্থা হতো, তবে এই দুটি গোষ্ঠীকে হতভাগ্য হতে হতো না। সরকারি ব্যবস্থায় শুধু দমনের কাজটুকুই পালিত হয়, গঠনের দিকে কিছুই করা হয় না। কাজেই পরিবর্তনের ব্যাপারটাও অর্ধপথে থেমে থাকে।আমি আমার এই গবেষণায় দেখিয়েছি যে সরকারের দমনমুলুক কাজের জন্যই ওঁরাও জনজাতি আজ তাঁদের জীবনযাত্রায় নিজস্ব ভাষা ও লিপি হারাতে বসেছে, এমনকি নিজেদের সারনা ধর্মের অস্তিত্ব কেও সংকটের মধ্যে ফেলেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে সাঁওতালি ভাষা ও লিপিতে যেমন পঠন পাঠন ছলছে তেমনি ওঁরাও ভাষা ও লিপিতে পঠন পাঠন শুরু হলে ওঁরাও জনজাতির অস্তিত্ব অনেকটায় টিকিয়ে রাখা যেত।

সভ্য-সংস্পর্শের (culture contact) ফলে আদিম জনজাতির বংশবিনাশ হয়, ভারতবর্ষের আদিবাসীর অতীত ও বর্তমানের দিকে তাকিয়ে রিভার্স সাহেবের এই থিয়োরি সমর্থন করা যায় না। আসামের খাসিসমাজ প্রভৃতি যেসব আদিবাসী উপজাতি খুবই ঘনিষ্ঠভাবে সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছে, তাদের জনসংখ্যার হ্রাস হয়নি। হিন্দুভাবাপন্ন আদিবাসী সমাজেরও বংশ-বিনাশ হয়নি। এ প্রসঙ্গে ডাঃ ডি এন মজুমদারের একটা মন্তব্য বিশেষভাবে মনে পড়ে। তিনি সিংভূমের কোলহান অঞ্চলের হো-সমাজ সম্বন্ধে বলেছেন – "আগের তুলনায় হো সমাজ বর্তমানে বেশি অল্পায়ু ও

দুর্বলদেহ হয়েছে, কিন্তু পূর্বপুরুষের তুলনায় বর্তমানে বংশবৃদ্ধির হার বেশি (multiplying faster than their ancestors)। কোনো জনজাতির বিনাশ অথবা জনসংখ্যার হ্রাস যে ভারতবর্ষে আদৌ হয়নি, তা নয়। হিন্দুসমাজে অনেক অবনত জাতের (caste) মধ্যে বংশাবনতি দেখা যায়, এটা অর্থনৈতিক কারণেই হয়েছে। ভারতের কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীরও যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, তবে সেটা মূলত অর্থনৈতিক কারণেই হয়েছে।[৪৮]

আদিবাসীদের উৎসবের দিনগুলি হিন্দুর উৎসবের মতো পঞ্জিকা বিহিত তিথি নক্ষত্র বা তারিখ দ্বারা নির্দিষ্ট নয়। অধিকাংশ ঋতু-উৎসব (seasonal festival), একবার আরম্ভ হলো তো চলতেই থাকল। তার জন্য বে-সরকারি সমাজ-সংস্কারক এবং সরকারি কর্তৃপক্ষও সাধারণত দুটি উপায় প্রস্তাব করে থাকেন, হয় উৎসবের দিনগুলি সুনির্দিষ্ট করা হোক, নয় উৎসবের সময় মদের দোকানগুলি বন্ধ করা হোক। মিঃ এলুইন এর বক্তব্য হলো, আদিবাসীদের 'প্রাণের উৎসাহ' যতদিন পর্যন্ত সজীব থাকবে (as long as the spirit moves him) ততদিনই সে তার দশেরা আর ফাগ উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে থাকুক। তিনি উৎসবের দিন সীমাবদ্ধ করতে চান না, কারণ তাতে আদিবাসীদের প্রাণের উৎসাহ সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। মিঃ এলুইনের প্রস্তাবে বস্তুত এই দাবিই করা হচ্ছে যে, উৎসব পরায়ণ আদিবাসী দিনরাত্রি মদ্যপান করে চলুক যতক্ষণ পর্যন্ত মদের হাঁড়িতে তার চুমুক দেবার শক্তি আছে। পূর্বে ওঁরাওদের উৎসবও কোনো দিন তারিখের মধ্যে বাঁধা ছিল না। কিন্তু ওঁরাও সমাজ বর্তমানে বিভিন্ন উৎসবের সময় সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। এর ফলে ওঁরাওসমাজের প্রাণের উৎসাহ যে আদৌ সংক্ষিপ্ত হয়নি, সে কথা মিঃ এলুইনের জানা উচিত। ওঁরাওদের তথা সমগ্র আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমানে যে রীতিতে শিক্ষার প্রচার হচ্ছে, মিঃ এলুইন সেটা পছন্দ

করেন না। বর্তমান শিক্ষা ওঁরাও তথা আদিবাসীসমাজে সংস্কৃতি, গোষ্ঠীগত সংহতি, ঐতিহ্য ও রুচি বিনষ্ট করছে বলেই তিনি মনে করেন। আধুনিক স্কুলে শিক্ষালাভ করে আদিবাসীরা বিজাতীয় (হিন্দু) সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে অপদার্থ হয়ে যাচ্ছে। আমার গবেষণায় আমি উপলব্ধি করেছি যে সরকারি ভাবে যদি সাঁওতালদের মতো আনান্য জনজাতিদের ভাষায় ও লিপিতে শিক্ষালাভ এর ব্যবস্থা করা হলে ওঁরাও তথা বাকি জনজাতি গুলো নিজেদের সমাজ, সংস্কৃত, সংহতি, ঐতিহ্য ও রুচি টিকিয়ে রাখতে পারতো। বর্তমান ভারতের সাধারণ ভারতবাসীর জন্য যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত, সেটা যে ত্রুটিপূর্ণ সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। বর্তমান স্কুল আদিবাসীর ছেলেকে যেমন অপদার্থে পরিণত করে থাকে, ভারতীয় কৃষকের ছেলেকেও তাই করেছে। সমস্যাটা সমগ্র ভারতের জাতীয় সমস্যা। কিন্তু এর জন্যে মিঃ এলুইনের কল্পনা অনুসারে আদিবাসীর শিক্ষা পদ্ধতিকে সমগ্র ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ভাবে তৈরি করতে হবে, এমন কোনো যুক্তি নেই আদিবাসীর গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির সৌন্দর্যগুলি যাতে নষ্ট না হয়, অবশ্যই তাদের শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সেদিক দিয়ে বিশেষ রীতি কিছু কিছু থাকবে। কিন্তু মিঃ এলুইনের মত অনুসারে আদিবাসীর প্রত্যেকটি প্রাচীন কুসংস্কারকে চিরস্থায়ী করার জন্য নিশ্চয় কোনো শিক্ষা পদ্ধতি গৃহীত হতে পারে না। পৃথিবীর আকার গোলকের মতো, কোন শক্তির আকর্ষণে পাকা আপেল গাছ থেকে মাটিতে পড়ে, গৌতম বুদ্ধ কে ছিলেন এবং হিমালয় পর্বত নামে যে একটা পর্বত আছে—আদিবাসীর ছেলেকে এই তথ্য জানালে তা, এই অভিমতের মধ্যে কিছুটা যৌক্তিকতা আছে। যেক্ষেত্রে আদিবাসীর উপযুক্ত পরিমাণ জামাকাপড় কেনবার সামর্থ্য নেই, যেক্ষেত্রে আদিবাসীর মনে সাধারণ স্নান শৌচ ও বস্ত্র-প্রক্ষালনের 'হাইজিন' সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই- সেক্ষেত্রে হঠাৎ কাপড় পরিয়ে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না। এরকম করলে

আদিবাসীকে বিড়ম্বিত করাই হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমস্যাটা ঠিক কাপড় পরার সমস্যা নয় – শিক্ষা এবং আর্থিক সমস্যা। কিন্তু যেহেতু আদিবাসীরা বর্তমান অবস্থায় অশিক্ষিত এবং আর্থিক অভাবে পীড়িত, সেই হেতু কি তাদের কাছে নগ্নতার আদর্শকে চিরন্তন করে রাখতে হবে? ১৮৭২ সালে ওড়িশায় জনৈক পলিটিক্যাল এজেন্ট এক দরবার আহ্বান করেন এবং সেখানে জুয়াং মেয়েদের পল্লব-পরিচ্ছদ বর্জন করার জন্য আবেদন করেন। এজেন্ট সাহেব নিজের টাকা খরচ করে কতকগুলি ম্যাঞ্চেস্টার শাড়ি কিনে এনেছিলেন। জনৈকা মহিলা এক একটি জুয়াং মেয়ের পাতার পোশাক ফেলে দিয়ে ঐ শাড়ি পরিয়ে দেন। পাতার পোশাকগুলিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। রিজলি সাহেব তাঁর গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন—'এইভাবে একটা বিচিত্র প্রাচীন প্রথার নিদর্শন, (পাতার পোশাক) সেদিন শেষ হয়ে গেল (Thus ended a picturesque survival)। কিন্তু সত্যই কি শেষ হয়েছে? রিজলি সাহেবের মন্তব্য সত্য নয়। সেদিনের কয়েকটি জুয়াং মেয়ের পাতার পোশাক ভস্মীভূত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তারপর? তারপর আবার তারা পাতার পোশাক পরেছে এবং আজও পরে আছে। তাদের আর শাড়ি পরবার সুযোগও হয়নি, সামর্থ্যও নেই। ঘটনা থেকে এইটুকু সত্য প্রমাণিত হয় যে, জুয়াং মেয়েরা শাড়ি পরতে চায়, যদি পাওয়া যায়। চিরন্তন নগ্নতাবাদী মিঃ এলুইনের থিয়োরি সত্য নয়। হিন্দি ভাষায় শিক্ষালাভ করে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক অধঃপতন হচ্ছে, মিঃ এলুইনের এই আর একটা অভিযোগ। মাতৃভাষা ছাড়া দ্বিতীয় একটি ভাষা শিক্ষা করা সাংস্কৃতিক উন্নতির পদ্ধতিরূপেই প্রত্যেক সভ্যদেশে স্বীকৃত হয়েছে। দ্বিতীয় একটি ভাষায় শিক্ষিত হতে পারলে মাতৃভাষারই ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। কিন্তু মিঃ এলুইন বলেন, হিন্দি ভাষায় শিক্ষালাভ করে একটা নিজস্ব কাব্য ও রূপকথার জগৎ('a whole world of poetry and legend') নষ্ট হয়ে গেছে।

হিন্দি স্কুলে পড়ে ওঁরাও জনজাতির ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভাষা বলতেও পারে না বুঝতেও পারে না। এমনকি নিজেদের লিপি কেমন কি ভাবে লিখতে হয় সেটাও বেশির ভাগই জানেন না। সরকারি ভাবে ওঁরাও ভাষায় (কুরুখ) ও লিপিতে (তলং সিকি) ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা থাকলে এই জনজাতি নিজেদের অস্তিত্ব সহজেই টিকিয়ে রাখতে পারতো।[৪৯] আদিবাসী সমাজের অবস্থা দেখে মিঃ এলুইন মন্তব্য করেছেন যে, হিন্দু সংস্পর্শের ফলে আদিবাসীরা শিল্পকলাহীন হয়েছে। আদিবাসীদের অলংকার এর প্রতি আকর্ষণ ও সুন্দর শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা ('love of decoration and power to create beautiful things') নষ্ট হয়ে গেছে।মিঃ এলুইনের এই উক্তি বস্তুত তাঁর চরম অজ্ঞতার দৃষ্টান্তরূপে ধরা যেতে পারে। হিন্দু-সংস্কৃতি কি শিল্পে বা কারুকলায় একেবারে রিক্ত? না, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার আধার? জলের সংস্পর্শে এসে কেউ পুড়ে যায় না, এবং শিল্পোন্নত হিন্দু-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসলে কেউ শিল্পরুচিহীন হয় না। যেসব আদিবাসীরা হিন্দু-সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসেনি তারা, অর্থাৎ পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীরা বিশাল বড়ো শিল্পকলার ওস্তাদ হয়ে রয়েছে কি? ফরসাইথ ও ডাল্টন বলেছেন, পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীরা শিল্পকলার প্রতি অত্যন্ত স্থূল এবং তারা এ বিষয়ে নিতান্ত অনগ্রসর। বর্তমানে ভারতবর্ষের বেশিরভাগ রাজ্যে আদিবাসীরা নিজেদের শিল্পকলা ভুলতে বসেছে। আমার গবেষণায় আমি ওঁরাও জনজাতির শিল্পকলার ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। মিঃ এলুইন জোর করে একটা প্রাচীন শিল্পকলাময় সংস্কৃতি কল্পনা করে নিয়েছেন, সেই কারণে তাঁর সমস্ত অভিযোগগুলিই অলীক। হিন্দু-সংস্পর্শের বিরুদ্ধে আতঙ্ক প্রচার করার প্রেরণা তাঁকে মনগড়া অভিযোগের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে। হিন্দু সভ্যতায় প্রভাবিত আদিবাসীরা প্রাচীন রীতির গহনা বর্জন করার জন্য আন্দোলন করেছিল। মিঃ

এলুইন এই ঘটনার উল্লেখ করে বলেছেন যে, হিন্দুত্বের প্রভাবে আদিবাসী সমাজে শিল্পবোধ অবনত ('deterioration in artistic sense') হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুরা কত অলংকারপ্রিয় এবং হিন্দু নরনারীর পরিচ্ছেদে কি বর্ণপ্রাচুর্য, বেশভূষার পদ্ধতিতে কি সৌন্দর্য আছে, সেটা সকলের জানা আছে । হিন্দু সভ্যতা খুবই বিচিত্র ও রঙিন সভ্যতা। এর প্রভাবে কেউ বেরঙা হয়ে যায় না। আদিবাসীদের প্রাচীন পদ্ধতির অলংকারগুলি যেমন স্থূল, তেমনি ভারী ও কারুশোভাহীন ছিল। তারা এই স্থূল ধাতুর বোঝা বর্জন করে সত্যিকারের কারুশ্রীসম্পন্ন হালকা ধাতুর গহনা গ্রহণের জন্য আন্দোলন করেছিল তাতেই মিঃ এলুইন ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং ব্যাপারটাকে আদিবাসীদের সৌন্দর্যবোধের (Aesthetic Sense) ওপর আক্রমণ বলে বর্ণনা করেছেন।এলুইন বলেন, শিক্ষিত হওয়ার ফলে আদিবাসীর নৃত্য ও সংগীতের অধঃপতন হচ্ছে। তাঁর মন্তব্য হলো— "শিক্ষার সবচেয়ে ভয়ানক ফল হলো আদিবাসীর নৃত্য ও সংগীতের ওপর প্রতিক্রিয়া"[৫০] খ্রিস্টান মিশনারিরা আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত সংগীত ও নৃত্যের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন, একথা সত্য। কিন্তু যেসব আদিবাসী গোষ্ঠী হিন্দুত্ব লাভ করেছে এবং যারা আংশিকভাবেও হিন্দু-সংস্কৃতির সংস্পর্শে বা প্রভাবে এসেছে, তাঁদের মধ্যে নৃত্য ও সংগীত বিনষ্ট হয়নি, বিনষ্ট হবার কারণও নেই। হিন্দু নিজেই অত্যন্ত সংগীতপরায়ণ, বারোমাসে তের পার্বণে সে গান গায়। হিন্দুর প্রতি কুটীরে ব্রতের ছড়ার আবৃত্তি। বহু শ্রেণিবিন্যস্ত হিন্দুসমাজের বহু শ্রেণির মধ্যে নৃত্যের চর্চা আজও সামাজিক আচাররূপে রয়েছে। হিন্দু তার কীর্তনে নাচে, হিন্দু মেয়েরা তার ব্রত উৎসবে নৃত্য করে। হিন্দুসমাজের নিম্নশ্রেণির অনেকের মধ্যে অতি দরিদ্রও তার নাচগান বন্ধ করতে পারেনি। হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণির লোকনৃত্য সুপ্রসিদ্ধ। আদিবাসীর মতো ঝুমুর গান ও নাচ হিন্দুসমাজের বহু শ্রেণিতেও সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে রয়েছে। তা ছাড়া শিক্ষিত

হিন্দুসমাজের মধ্যেও নৃত্যচর্চার প্রসার হয়ে চলেছে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষা অথবা হিন্দুর সংস্পর্শ, কোনোটাই আদিবাসীকে নৃত্যচর্চায় নিরুৎসাহ করে না। তবুও মিঃ এলুইন এই সম্পূর্ণ কাল্পনিক অভিযোগ প্রচার করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করেননি।ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ফৌজদারি আইন ও দণ্ডবিধি আদিবাসীর সংস্কৃতিকে বিড়ম্বিত করেছে বলে মিঃ এলুইন অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিমত, ভারতবর্ষের অন্যান্য সভ্য সমাজের জন্য যে আইন খাটে, আদিবাসীর জন্য সে আইন খাটে না, ফৌজদারিই হোক আর দেওয়ানিই হোক্।উত্তরে বলা যায়, দেওয়ানি আইন (Civil Laws) সম্বন্ধে মিঃ এলুইনের এই যুক্তি যতখানি খাটে, ফৌজদারি আইন সম্বন্ধে ঠিক ততখানি খাটে না। আদিবাসীদের জন্য ভূমিসংক্রান্ত, সম্পত্তিঘটিত ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক ঐতিহ্য এবং লোকাচারের দিকে লক্ষ রেখে অবশ্যই দেওয়ানি আইনের কিছুটা রকমফের হতে পারে এবং সেটাই বিধেয়। কিন্তু অপরাধ (crime) নামে কথিত কোনো হিংস্র আচরণকে ধর্ম বা সংস্কৃতির অজুহাতে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। মানুষ তার প্রাচীন সংস্কারকে চিরস্থায়ী করে উন্নত হয়নি, প্রাচীন সংস্কারকে পরিবর্তন বা বর্জন করে সে তার সভ্যতার প্রগতি অব্যাহত রেখেছে। আদিবাসী সমাজ মানবিক সভ্যতার এই সাধারণ নিয়মের বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু মিঃ এলুইন বস্তুত সেই রকমেরই দাবি করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর এক একটা মন্তব্য অনৈতিহাসিক। এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন, কেউ অস্বীকার করবে না যে, আদিবাসীদের জীবনের নানারকম কুসংস্কার ও কুপ্রথা আছে। দৃষ্টান্ত, কোনো কোনো নাগাসমাজ ইউরোপের অতি অনগ্রসর জাতিগুলির মতো মুণ্ডশিকার ও নরবলির চর্চা করে। একমাত্র পার্থক্য হলো বেচারা আদিবাসী দেবতার নামে একটি দুটি নরবলি করে থাকে, আর বড়ো বড়ো নেশনগুলি সাম্রাজ্য ও সভ্যতার নামে লক্ষ লক্ষ নরবলি করে। আদিবাসীদের মধ্যে আর

একটি হিংস্র প্রথা পূর্বে খুবই প্রবল ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে যেমন ডাইনি পোড়ানো। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ফৌজদারি আইন এই প্রথা দমন করেছে। মিঃ এলুইনের মতে এটাও আদিবাসীর সামাজিক অধিকারের হস্তক্ষেপের ব্যাপার। তিনি বলেন, শিক্ষিত সমাজেও ডাইনি সংস্কার আছে। জোর-করে-মেরে-ধরে-নিয়ে বিয়ে করা (marriage by capture)—এই আসুরিক বিবাহপদ্ধতির বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইন কেন বাধা দেয়, এটাও এলুইন সাহেবের আর একটা ক্ষোভ। আদিবাসী সমাজের প্রতি দরদের আধিক্যে ভদ্রলোকের যুক্তি ও মন্তব্যগুলি অপলাপে পরিণত হয়েছে। নরবলি, মুণ্ডশিকার, ডাইনি পোড়ানো ইত্যাদি হিংস্র প্রথাগুলির বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে কোনো প্রতিবাদ করতে পর্যন্ত তিনি নারাজ। তিনি বরং স্পষ্টভাবে উলটো কথাই বলেছেন : "The aboriginals were faced with a serious crisis when British administrators insisted on the cessation of such obviously evil practices as human sacrifice, head hunting and murder for witchcraft."[৫১] মিঃ এলুইনের বক্তব্য, আদিবাসী অঞ্চলে রেল, পুল, সড়ক ইত্যাদি আদিবাসীদের সামাজিক সংহতি (Tribal Solidarity) নষ্ট করে। অর্থাৎ, রেল বা সড়ক বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, যার ফলে উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শ ও প্রভাব আদিবাসী সমাজের ওপর উপদ্রবের মতো দেখা দেয় ও তাদের গোষ্ঠীগত সামাজিক সংহতিতে ভাঙন ধরে। তিনি বলেছেন—"The souls of the people are soiled and grimy with the dust of passing motor buses."[৫২] কিন্তু মিঃ এলুইনের অভিযোগটি মূলত সত্য নয়, সড়কের জন্যে কোনো আদিবাসীসমাজ ভেঙে পড়েনি। তিনি বলতে পারেন, সড়ক হলে আদিবাসী অঞ্চলে বাইরের ব্যবসায়ী ও মহাজনের আবির্ভাব সহজ হয়ে পড়ে এবং তার ফলে আদিবাসীদের আর্থিক শোষণও

সহজ হয়। এভাবে বিচার করলে, কিছুটা সত্য কথা বলা হয়। কিন্তু যারা আর্থিক শোষণ করে থাকে, সেই সব মহাজনের পন্থা শুধু পাকা সড়কই নয়, নিতান্ত মেঠো বা বুনো হাঁটুরে পথে তারা আনাগোনা করার যোগ্যতা রাখে। এ বিষয়ে সড়কহীনতা আদিবাসীর পক্ষে সার্থক রক্ষাকবচ নয়। সমগ্র ছোটনাগপুর অঞ্চল সুন্দর পাকা সড়কে সমাকীর্ণ, কিন্তু এই অঞ্চলের সমাজের সত্তা দুর্গম জঙ্গলের অধিবাসীর সত্তার চেয়ে বেশি মলিন হয়নি। মিঃ এলুইন মনে করেন, ভারতীয় দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনি আদিবাসীর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা উচিত নয়। আদিবাসীদের মামলা বিচারের পদ্ধতিও (Judiciary) ভিন্নভাবে গঠিত হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আদিবাসীদের মনে সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, দেনা ইত্যাদি বিষয়ে যে ধারণা ও সংস্কার আছে, সেটা ঠিক সাধারণ ভারতীয়ের ধারণা বা সংস্কারের মতো নয়। আদিবাসীদের বিবাহপ্রথাও ভিন্ন ধরনের, যৌননীতিও রুচি ভিন্ন ধরনের—সুতরাং এসব ব্যাপারে ভারতীয় আইন অথবা সভ্য জাতির উপযোগী কোনো আইন আদিবাসীদের পক্ষে উপযুক্ত নয়। সুতরাং, তাঁর মতে আদিবাসীদের সামাজিক প্রথাগুলিকেই বিধিবদ্ধ আইনে পরিণত (Codification of Customs) করতে হবে। তাঁর প্রস্তাব, একদল নৃতাত্ত্বিককে নিয়োগ করে আদিবাসীদের প্রথা সম্বন্ধে প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করে, সেগুলিকে আইনে পরিণত করা হোক। প্রথাকে মানুষের চেয়ে বড়ো বলে যাঁরা মনে করেন তাঁদের পক্ষেই এ ধরনের প্রস্তাব করা সহজ। প্রথার জন্য মানুষ নয়, মানুষের জন্যই প্রথার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রথাকে যদি বিধিবদ্ধ করা হয়, তবে সমাজের দেহ ও প্রাণকেই স্তব্ধ করে রাখা হবে। প্রথা বিধিবন্ধ হলে গোষ্ঠীগত পঞ্চায়েত শাসনের পদ্ধতিও নিতান্ত যন্ত্রবৎ (Mechanical) হয়ে যাবে। গোষ্ঠীগত সর্দারও বর্তমানে যতখানি ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তখন তাঁর পক্ষে সে সুযোগও থাকবে না। কেন না বিধিবদ্ধ প্রথাগুলি তাঁর ওপরেও

সার্বভৌম হয়ে উঠবে, এটা আদিবাসী তথা ওঁরাও জনজাতির গোষ্ঠীগত সংস্কৃতির বিরোধী ব্যাপার হয়ে উঠবে। এলুইন মতে যতগুলি সূত্র বিবৃত করা হলো, তার সবগুলির মধ্যে মূলত একটি দাবিই রয়েছে। সেটা হলো—আদিবাসীকে আধুনিক সভ্য সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে, প্রত্যেকটি গোষ্ঠীগত প্রথা সংস্কার ও রীতিনীতিকে কোনোভাবে পরিবর্তন না করে, যেমন ছিল তেমনই অবস্থায় চিরকালের মতো সাজিয়ে রাখা। এই দাবিই শেষ পর্যন্ত ন্যাশনাল পার্ক দাবিতে পরিণত হয়েছে।[৫৩] পরিকল্পনাটি হলো—অরণ্য ও পাহাড় অঞ্চলে এক একটা সুবিস্তৃত এলাকা আদিবাসীর উপনিবেশের জন্য ছেড়ে দিতে হবে। এই এলাকার মধ্যে আদিবাসীরা তাদের চিরপুরাতন পদ্ধতিতে অবাধে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। কোনো স্কুল বা সড়ক এখানে হতে পারবে না। কোনো মিশনারি আসতে পারবে না। আবগারি আইন, জঙ্গল আইন, ভূমি আইন—কোনো কিছুই থাকতে পারবে না। আদিবাসীরা অবাধে ঝুম চাষ করবে এবং সর্দারের দ্বারা পরিচালিত হবে। বর্তমান বস্তার রাজ্যে আদিবাসীদের জন্য একটা নির্দিষ্ট এলাকায় যে ধরনের উপনিবেশ করা হয়েছে, মিঃ এলুইন তার সঙ্গে কতকটা সামঞ্জস্য রেখে অর্থাৎ বস্তার মডেল অনুসারে এই ন্যাশনাল পার্ক পরিকল্পনা প্রচার করেছে। তাঁর উদ্দেশ্য হলো- আদিবাসীরা এইভাবেই নির্দোষ ও সুখী জীবনযাপন করুক, যতক্ষণ না বর্তমান সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক যুগ এদের ক্ষতি না করে উন্নতি করবার ঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করার মতো যোগ্যতা ও জ্ঞানলাভ করে—"Innocence and happiness for a while till civilisation is more worthy to instruct them and and until a scientific age has learnt how to bring development and change without causing despair."[৫৪] মিঃ এলুইনের ন্যাশনাল পার্ক পরিকল্পনা হলো একটি বিশুদ্ধ নেগেটিভ আকাঙ্ক্ষার দ্বারা গঠিত—ঊর্ধ্ব থেকে নীচে, বর্তমান ছেড়ে

অতীতে, পরিবর্তনের বদলে চিরস্থিরতা, গতি ছেড়ে দিয়ে স্তব্ধতা। সুতরাং মিঃ এলুইনের পরিকল্পনাকে অবাস্তব ইউটোপিয়ার সঙ্গেও তুলনা করা উচিত হবে না। এটা হলো তার বিপরীত—অবাস্তব অথচ অধোমুখী— ইউটোপিয়া। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব ছিল বা রয়েছে তা নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করা গেছে। সুতরাং অতি প্রাচীন যুগে নদ-নদী পাহাড়-পর্বত ঘেরা জঙ্গলাকীর্ণ ভারতবর্ষেও যে জনমানবের বসবাস ছিল তা বলাই বাহুল্য। কোল, ভীল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, সাঁওতাল এঁরাই এদেশের আদিম অধিবাসী যাঁদের অনার্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। অনার্য কোন জাতির নাম নয়, যাঁরা আর্য নয় তাঁরাই অনার্য। গবেষক, ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদগণ ভারতবর্ষে মূলত চারটি ভাষা পরিবারের কথা উল্লেখ করেছেন, যাঁরা আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্রতা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক, ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বসবাস করেন। তাঁরা হলেন অষ্ট্রিক (অষ্ট্রো-এশিয়াটিক), দ্রাবিড়, ইন্দো-মঙ্গোলয়েড বা চৈনিক-তিব্বতী এবং আর্য।[৫৫] ওঁরাও দের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই চিহ্নিত করা হয়, যদিও তথাকথিত ইতিহাসসম্মত কোন ব্যাখ্যা নেই। অষ্ট্রিক (অস্ট্রো-এশিয়াটিক) - কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা, খাড়িয়া, কোঁড়া ইত্যাদি। দ্রাবিড়, ওঁরাও, কুরগী, জাটাপু, কিষাণ, কোলামি, কোরা, মালতো, মালায়ালাম, তামিল, তেলেগু, টুলু ইত্যাদি। ইন্দো-মঙ্গোলয়েড বা চৈনিক-তিব্বতী - নাগা, কুকী, বোড়ো, রাভা, মেচ, রাজবংশী ইত্যাদি। আর্য - এঁরা ইন্দো-ইউরোপের ভাষা পরিবারের সদস্য যা ল্যাটিন, জার্মান, গথিক, সংস্কৃত, গ্রীক, কেলটিক ও পারসিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ঐতিহাসিক ব্রানডেনষ্টাইন সাহেবের মতে, এখন যাকে কিরঘিজ স্তেপি বলা হয়, সেই অঞ্চল ছিল অবিভক্ত ইন্দো-ইউরোপীয়গণের আদি বাসভূমি।[৫৬] এখান থেকেই আর্যদের অভিপ্রয়াণ ঘটে ছিল। দীর্ঘকাল ধরে ধাপে ধাপে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাঁরা

ভারতের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা পারস্যে প্রবেশ করেন এবং সুদীর্ঘকাল পারস্যে বসবাসের পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ুর শুষ্কতা, পর্যাপ্ত চারণ ভূমির অভাব প্রভৃতি কারণে দেশ ত্যাগ করে পারসিক আর্যদের একটি শাখা হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তরে ব্যাকট্রিয়া ও আফগানিস্থান অধিকার করে এবং অপর একটি শাখা হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে আফগানিস্থানের খাইবার গিরিপথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে আনুমানিক দু'হাজার খ্রীষ্টপূর্বে উত্তর পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে। তারপর ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।[৫৭] নিবিড় বনানী ও লতা গুল্মে আচ্ছাদিত প্রাচীন ভারতে আদিম অধিবাসীরা শাক-পাতা, ফলমূল ও কাঁচা মাছ-মাংস খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শিকার করে মাছ-মাংস সংগ্রহ করলেও ওঁরাওরা শিকারের থেকে বনজ খাদ্য আহরণে বেশী আগ্রহী ছিলেন। কঠিন বা শক্ত কোন বস্তুর সাহায্যে মাটি চূর্ণ করে ছোট ছোট জমির বানিয়ে সেখানে শস্যবীজ বপন, সেচন ও পরিচর্যার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করতেন। তারজন্য নদী সংলগ্ন পলি মিশ্রিত উর্বর জমির এলাকায় বসতি স্থাপন করতেন। খ্রীষ্টপূর্ব দশ হাজার বছর আগে ভারতে কৃষির সূচনা হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৫৮] ওই সময় ভারতে আদিম জনজাতিরা ছাড়া অন্য কেউ ছিলেন কিনা, ইতিহাসে তার উল্লেখ নেই। প্রাচীন ভারতে ইতিহাস গ্রন্থের অভাবের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, লেখা হয়েছিল কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেকের মতে সেই সময় ইতিহাসের উপাদান থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত সাহিত্য গুণসম্পন্ন ইতিহাস রচনার ইচ্ছা বা উৎসাহের অভাব ছিল। কৃষির সূচনা কাল থেকে সিন্ধু সভ্যতা (খ্রীঃ পূঃ ৩৩০০ অব্দ) পর্যন্ত প্রায় সাত হাজার বছর এদেশে কারা বসবাস করতেন বা তাঁদের ইতিহাস কি ছিল সে বিষয়ে কেউ আলোকপাত করেননি। শুধু মাত্র আগুনের আবিষ্কার, প্রস্তরযুগ, তাম্রযুগ ইত্যাদির প্রসঙ্গ ইতিহাসে উল্লেখ থাকলেও

এদেশের আদিম অধিবাসী তথা মূল বাসিন্দাদের কথা সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান – পাথর ও মাটির পাত্র, ফলক, শীলমোহর, অলঙ্কার, পোড়া ইটের নিদর্শন, হলঘর, লিপি (ব্রাহুই) প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে সিন্ধু ঘাটিতে ওঁরাও জনজাতির অবস্থিতি প্রতিপন্ন করা গেছে। এ প্রসঙ্গে ই.টি. ডাল্টন সাহেবের রচিত 'The Descriptive Ethnology of Bengal', রমেশ চন্দ্র দত্তের রচিত 'The Civilization of India', আনন্দ কুমার দাসের 'The Oraons of Sundarban', রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র রায়ের 'The Oraons of Chotanagpur' এবং জীতু ওঁরাও-এর রচিত 'সিন্ধু ঘাটী কুড়ুখ সভ্যতা ও জনজাতীয় ভূমিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৯] হরপ্পা ও সিন্ধু সভ্যতার যুগকে তাম্রযুগ এবং বিশ্বের প্রাচীনতম উন্নত সভ্যতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস ম্যাশন যখন পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থান সফর করছিলেন তখন স্থানীয় লোক মারফৎ জানতে পারেন যে হরপ্পায় ১৩ ক্রোশ এলাকা জুড়ে প্রাচীন নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশের নিদর্শন থাকতে পারে। ১৮৫৬ খ্রীঃ জেনারেল আলেকজ্যাণ্ডার ক্যানিংহাম ঐ এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর দুই জন ব্রিটীশ ইঞ্জিনিয়ার জন এবং উইলিয়াম ব্রান্টন করাচি ও লাহোরের মধ্যে রেললাইন স্থাপনের কাজ করছেন।[৬০] উঁচু নীচু পাথরের টিলা ভেঙ্গে সমতল করার জন্য মাঝে মাঝে বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করছিলেন। ফলে মাটির ভেতর থেকে ঝামা ইট ও পোড়া ইটের টুকরো বের হয়ে আসছিল। সেই সূত্র ধরে ১৯৭২ – ৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিংহাম প্রথম হরপ্পায় কিছু ফলক, শীলমোহর ও জীবজন্তু গাছপালার ছবি আঁকা তবক আবিষ্কার করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার জন হার্বাট মার্শাল, রায়বাহাদুর দয়ারাম সাহানী, মাধো স্বরূপ ভাট সহ আরও অনেকে মিলে হরপ্পায় খনন শিবিরের আয়োজন করেন। পরবর্তীকালে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে

ডঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মহেঞ্জোদারোতে খনন কার্য শুরু হয়। প্রায় সাড়ে বারো লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১০৫৬টি নগর গড়ে উঠেছিল বলে অনুমান করা হয়, তারমধ্যে ১৯৯৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ৯৬টির খনন কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। এখানে দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর প্রায় দশ লক্ষ মানুষের বসতি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬১] আবিষ্কৃত পোড়া ও ঝামা ইটের টুকরো, গাছপালা জীবজন্তুর ছবিসহ লিপি অঙ্কিত তবক, ফলক, ব্রাহুই লিপি মুদ্রিত শীলমোহর, বিশাল বিশাল হলঘর, স্নানাগার, পাথর ও মাটির তৈরী ভাঙ্গা পাত্র ইত্যাদি উপাদান, স্থাপত্যের নিদর্শন ও তথ্য বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক, গবেষক ও প্রত্নতত্ত্ববিদরা ওখানকার মানুষের জীবনযাত্রা, ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছেন। আবিষ্কৃত তথ্য বিশ্লেষণ করলে ওঁরাও জনজাতির সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েহে।

ইটের নিদর্শন : প্রাচীন যুগের ন্যায় মাটি প্রস্তুত করা থেকে কাঁচা ইট তৈরী করে শুকিয়ে ভাটায় পোড়ানো প্রভৃতি কাজে ওঁরাওরা আজও সমান পারদর্শী। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ইট ভাটা গুলোতে আজও ওঁরাও জনজাতির লোকেদের কাজ করতে দেখা যায় ।[৬২] আবিষ্কৃত ফলক, তবক ও শীলমোহর : প্রাচীন কালে ওঁরাও রমণীরা পিতল, তামা, সীসা প্রভৃতি ধাতুর তৈরী গাছপালা জীবজন্তুর চিত্র খোদাই করা বড় বড় টিকলি বা তবক জাতীয় অলঙ্কার কানে, খোঁপায়ও নাকে পরতে ভালবাসতেন।[৬৩] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, প্রাক্ হরপ্পা যুগকে প্রস্তর ও তাম্রযুগ বলে ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়েছে। সুতরাং সিন্ধু সভ্যতার বহু কাল আগে থেকেই ওঁরাও রমণীরা এই সকল অলঙ্কার ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিলেন। বিশাল বিশাল হলঘর : ওঁরাও যুবক ও যুবতীদের জন্য গ্রামের মধ্যবর্তী প্রশস্থ আখড়ার পাশে পৃথক পৃথক হলঘর বানানো হত, এর নাম ছিল ধুমকুড়িয়া। প্রত্যেক ছেলে মেয়েদের সাত-আট বছর বয়স থেকে কুড়ি-

বাইশ বছর পর্যন্ত নিজ নিজ ধুমকুড়িয়াতে থাকা ছিল বাধ্যতামূলক। যুবকরা যেমন যুবতীদের ঘরে যাওয়ার অনুমতি পেত না তেমনি যুবতীদেরও যুবকদের ঘরে প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। ধুমকুড়িয়া ছিল ওঁরাও কিশোর কিশোরীদের নিকট পবিত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। প্রতি রাত্রে যুবকদের ঘরে বৃদ্ধরা এবং যুবতীদের ঘরে বৃদ্ধারা আশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং তাদের গৃহস্থালি কাজকর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান দান করতেন। অন্য সময় কৃষিকাজ, পশুপালন, শিকার, বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, মাদুর তৈরী, সুচিশিল্প ও অন্যান্য সাংসারিক কাজকর্ম হাতে-কলমে শেখানো হত। সুতরাং হরপ্পার বিশাল বিশাল হলঘর ওরাওঁদের ধুমকুড়িয়ার নিদর্শন হিসাবে প্রতিপন্ন করা যেতেই পারে। স্নানাগার, রাস্তাঘাট, পাথর ও মাটির পাত্র : ওঁরাওরা আদিমযুগ থেকেই দ্বাদশ বৎসর অন্তর নিজ নিজ গোত্রের লোকেরা সমবেত হয়ে 'নাদ-ক্ষজোরনা' পুজো করে আসছেন। তালপাতা বেষ্টিত বড় হলঘরে কয়েকদিন ধরে এই পূজানুষ্ঠান চলতে থাকে ঐ সময় কেউ হলঘরের বাইরে যেতে পারেন না। তাই হলঘরের মধ্যেই স্নানাগার ও শৌচাগার বানানো বাধ্যতামূলক ছিল। রাস্তাঘাট, পাথর ও মাটির পাত্র প্রভৃতি প্রাক হরপ্পা সংস্কৃতির ফসল তথা ওঁরাও সংস্কৃতিরই অঙ্গ বলা যায়। হরপ্পায় দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের বসতি : ভারতবর্ষে যে চারটি ভাষা পরিবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের সিন্ধু ঘাটীতে বসতি ছিল এবং এখনও ভারতবর্ষ ছাড়া পাকিস্থান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, ইন্দোনেশিয়া, ফিজি, মরিশাস, গুয়েনা, মাদাগাস্কার, ত্রিনিনাদ প্রভৃতি দেশে এঁদের বসতি রয়েছে। ওঁরাওদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দ্রাবিড়িয়ান ভাষা গোষ্ঠীর সদস্যরাও যে হরপ্পায় বসবাস করতেন তা সহজেই অনুমান করা যায়, যদিও প্রত্যক্ষ ইতিহাসের প্রমাণ মেলে না। ব্রাহুই লিপির শীলমোহর : ব্রাহুই ভাষীরাও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর সদস্য, বর্তমানে

পাকিস্থানে ২০ লক্ষ এবং আফগানিস্থানে ২ লক্ষ এদের জনসংখ্যা রয়েছে। ভাষাবিদদের মতে ব্রাহুই ভাষা হচ্ছে মলতো এবং কুড়ুখ (ওঁরাও) ভাষার অংশভুক্ত উত্তরাঞ্চলের দ্রাবিড়িয়ানদের উপভাষা।সিন্ধু সভ্যতার তাম্রযুগ ছিল খ্রীঃ পূঃ ৩৩০০ থেকে ১৩০০ অব্দ পর্যন্ত। এই সিন্ধু ঘাটী থেকেই ওঁরাওদের অভিপ্রয়ান শুরু হয়। প্রথমে তাঁরা দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হয়ে কর্ণাটকের বর্গ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সিন্ধু ঘাটী থেকে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে তাদের প্রায় ৫০০ বছর লেগে যায়। ডঃ ফ্রান্সিস বুকাননের মতে এখানে কাড়খ নামে এক রাজা ছিলেন এবং তাঁর দেশের নাম ছিল 'কাড়ুখ' দেশ। সেই দেশের অধিবাসীদের বলা হত কাড়ুখ বা কুরুখ।[৬৪] ভৌগলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাঁরা পুনরায় স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হন। আনুমানিক ৭০০ খ্রীঃ পূর্বে দক্ষিণ ভারত থেকে গোদাবরী নদী অতিক্রম করে নর্মদার তীর ধরে বিন্ধ্য পর্বতের দিকে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত শোন উপত্যকায় পৌঁছে রোহতাসগড়ে আশ্রয় নেন। এখানে ওঁরাওদের রাজা একটি দূর্গ স্থাপন করেন যা আজও 'রোহতাস গড় দুর্গ' নামে খ্যাত।[৬৫] কথিত আছে যে, খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দে রোহতাস গড়ে কুড়ুখ রাজার দুর্গ বহিরাগত শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। ঐ সময় রাণীমা ছিলেন গর্ভবতী। ওঁরাও রীতি অনুযায়ী কারও স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে জীব হত্যা, হিংসা, যুদ্ধ বা খুন-খারাপির কার্য থেকে তাঁকে বিরত থাকতে হয়। তাই ওঁরাও রীতি মেনে রাজা হিংসা পরিত্যাগ করে রাণীকে নিয়ে পাহাড়ী এলাকায় গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নেন। রাজকন্যা সিঙ্গী দাই তাঁর সহচরী কুইলি দাই ও অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে শত্রুপক্ষের সাথে লড়াই করেন। রাজা যে জঙ্গলে আশ্রয় নেন সেই জঙ্গল ছিল 'করম' বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত। সেখানেই রাণীমা পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। আশ্রয় দাতা ও রক্ষাকর্তা হিসাবে করম বৃক্ষের মহান অবদানের কথা স্মরণ করে ওঁরাওরা আজও মহা-সমারোহে

করম পুজোর আয়োজন করে থাকেন। সাধারণত ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথিতে ‘রাজিঃ কারাম’, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ‘জিতিয়া কারাম’, আশ্বিনের শুক্ল পক্ষের দশমীতে ‘দাসাই কারাম’, কার্ত্তিক অমাবস্যায় ‘সোহরায় কারাম’, ইন্দ্রলক্ষ্মী পুজোর দিনে ‘ইন্দ কারাম' এবং অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ হলে বৃদ্ধারা ‘বুড়হি কারাম' করে থাকেন।[৬৬]

ভারতের আদিবাসীরা প্রকৃতি পুজো তথা বৃক্ষ, ভূমি, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, নদী, নক্ষত্র প্রভৃতির আরাধনা আবহমান কাল ধরে করে আসছেন। প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে জীবন ধারণের প্রয়াস এঁদের সংস্কৃতির একটি অঙ্গ বলা যায়। চারদিকে বিষ বাতাসে প্রাণীকুলের তথা মানব জাতির হাঁসফাস অবস্থা তখন ওঁরাওদের এই করম পুজো তথা বৃক্ষপূজা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যে ফুল আহরণ করে আমরা দেবতার চরণে অর্পন করি, যে ফুল দিয়ে আমরা প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং পরস্পরের সহিত শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন। যে পাতা দিয়ে ভেষজ ঔষধ তৈরী হয়, যে পাতা পশু ও মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় - সেই পাতা দেয় বৃক্ষ। প্রখর রৌদ্র তাপে পথশ্রান্ত পথিক, ক্লান্ত শ্রমিক ও কৃষক যে স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় বিশ্রামের সুযোগ পায় – সেই ছায়া প্রদান করে বৃক্ষ। জ্বালানী থেকে গৃহের আসবাব তৈরীতে যে কাঠের প্রয়োজন হয়। সেই কাঠের যোগান দেয় বৃক্ষ। ভূমিক্ষয় রোধ – সেখানেও রয়েছে বৃক্ষের বিশেষ অবদান।[৫৮] পাখপাখালির কলকাকলি ও তাদের নিরাপদ আশ্রয় – সে ক্ষেত্রেও রয়েছে বৃক্ষের বিশেষ ভূমিকা। বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে এবং আমাদের বেঁচে থাকার প্রাণবায়ু অক্সিজেন বাতাসে ফিরিয়ে দেয় – সেই বৃক্ষই। পৃথিবীতে যার এমন মহান অবদান রয়েছে তাকে আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থে, লোভ ও মুনাফা চরিতার্থ করতে নিষ্ঠুরভাবে নির্বিচারে নিধন, ছেদন ও ধ্বংস করে চলেছি।

ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এর পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হতে পারে সে কথা চিন্তা করে বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্র নেতারা, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এবং পরিবেশ সচেতন ব্যক্তিত্বরা আন্তর্জাতিক স্তরে বার বার আলোচনা সভা ডাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এখনও সময় আছে আমাদের প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে অন্যথায় সমূহ বিপদ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। ১৯৭৬ সালের সিডিউল্ড কাস্ট অ্যান্ড সিডিউল্ড ট্রাইব অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট অনুযায়ী ৩৮টি জনগোষ্ঠীকে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়। ভাষাগোষ্ঠীর দিক দিয়ে বিচার করলে এদেরকে দুভাগে ভাগ করা যায়। মুন্ডারী ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল মুন্ডা, সাঁওতাল, হো প্রভৃতি আর দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে আসে ওঁরাও, মালপাহাড়িয়া ইত্যাদি। সুতরাং ওঁরাওরা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এদের ভাষা হল 'কুরুখ'! তবে প্রথমদিকে এই ভাষার কোন লিপি না থাকলেও পরবর্তী সময়ে 'তোলং সিকি'কে এই ভাষার লিপি হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়।[৬৭]

ওঁরাও জনজাতি জল, জঙ্গল ও জমির ওপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল। যেখানে ছিল তাদের নিজস্ব রীতি-নীতি, গোষ্ঠী ভাবনা ও চিন্তা-চেতনার বিষয় গুলি। কিন্তু উপনিবেশ ও উপনিবেশ পরবর্তী সময়ে এই স্বতন্ত্র সমাজ-সংস্কৃতি বিবর্তনের ধারায় বাহিত হতে থাকে। এই বিবর্তন ক্রমশ রূপ নিচ্ছে আত্মপরিচয়ের সংকটে এবং শেষ পর্যন্ত অনিবার্য ভাবে এসে পড়েছে অস্তিত্বের সংকট। ভারতে জনজাতির মানুষকে প্রথম থেকেই লড়তে হয়েছে দুটি বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে। এর একটি পাশ্চাত্য শক্তি, অন্যটি বর্ণ হিন্দু সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদী শক্তি। উপনিবেশিক সরকারের জল, জঙ্গল, জমির ওপর আরোপ করা নানান নিয়ম-নীতির দ্বারা ওঁরাও সমাজের পূর্বতন সংহতি বিনিষ্ট হয়। জনজাতির মানুষের জল, জঙ্গল, জমির ওপর অধিকার হারিয়ে যাওয়ায় তারা তাদের মূল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার

পরবর্তী সময়ে এই বিবর্তন বা পরিবর্তনের ধারা আরো প্রকট রূপ নেয়। স্বাধীন ভারত সরকারের সাংবিধানিক রীতি-নীতি, নতুন অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থার দরুণ তাদের সমাজ-সংস্কৃতি ও চিন্তা চেতনার বিষয়গুলিকে বেঁধে ফেলা হয়। ফলত তারা তাদের পূর্বতন রীতি-নীতি ও গোষ্ঠী ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে নিজেদেরকে অঙ্গীভূত করে ফেলে। ২০১১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী এই জনজাতির ৩৬ শতাংশ মানুষ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে আবার ৩০ শতাংশ খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। [৬৮]

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পূজা-পার্বনের ক্ষেত্রে প্রচলিত জনশ্রুতি 'বার মাসে তের পার্বন' এ বিষয়ে ওঁরাওরা কম যান না। 'ডাণ্ডা কাট্টানা' থেকে শুরু করে গ্রামী, খালিপুজা, ফাগু, খাদি, টাঠখা পারাব, করম, সহরায়, যাত্রা, পুনা-মান্না প্রভৃতি পার্বন বেশ সমারোহ সহকারে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।[৬৯] ওরাওঁদের আরাধ্য দেবতা মূলত চারটি – প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি (Power of Nature)-ই সর্বশক্তিমান চন্দর (হামেস), সূর্যদেব (বিইড়ি বেলাস), ভূমি মাতা (চালা আয়ো) এবং পূর্বপুরুষ (পাচ বালার)। যে কোন পূজা পার্বনে সর্বাগ্রে এঁদের তুষ্টি বিধান একান্ত আবশ্যক।[৭০] প্রথমেই এঁরা বিন্তী (প্রার্থনা) করেন, তারপর নিবেদন বা উৎসর্গ করেন, নাচে-গানে বন্দনা করেন। এই পদ্ধতিগুলো প্রাচীন ভারতের বন্যজাতি তথা আদিবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী পালন করে আসছেন। যার সাথে বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিদের আরাধনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।[৭১] ঋগবেদের মন্ত্র-প্রর্থনা, যজুর্বেদের আহুতি-উৎসর্গ, সামবেদের বন্দনা-প্রশস্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদিম জনজাতিরা না বৈদিক মুনি-ঋষিরা কারা আগে এই পদ্ধতিতে আরাধ্য দেবদেবীর পূজা অর্চনা

করেছেন সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে ওরাওঁদের বিশ্বাস, সংস্কার, সংস্কৃতি প্রভৃতি একইভাবে আবহমানকাল ধরে প্রাচীন রীতি মেনেই অনুসৃত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।

ওঁরাওরা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে নিজস্ব তাগিদে সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যেমে আপন আপন বংশধারা অটুট রাখতে গোত্রনামের প্রচলন শুরু করে। এখনও পর্যন্ত যে পঁচাত্তরটি গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে এক্কা, মিজ, তিরকী, লাকড়া, কিণ্ডো, বাণ্ডো, কেরকেটা, কুজুর, খাঁকা, খালকো, টপো, টিপ্পা,বালা, বেক, লিণ্ডা অন্যতম।[৭২] সূর্যদেবকে সর্বশক্তিমান 'ধার্মেস' বা ঈশ্বর হিসাবে আরাধনা করলেও প্রাচীন আরণ্যক ভিত্তিক ওঁরাও সমাজের লোকেরা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শুভ-অশুভ রূপ বা শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করে থাকে। ভূমি অর্থাৎ 'ক্ষেখেল' কে এরা ধরিত্রী মাতা বা 'চালা-আয়ো' বলে স্মরণ করে কৃষির প্রারম্ভ ও সমাপ্তিতে ভূমি পুজো করে থাকে।[৭৩] ওঁরাওদের বিশ্বাস এই যে, সূর্যদেবের ঔরসে ভূমি-মা (চালা-আয়ো) গর্ভবতী হয়ে ধরাধামে জীবজগৎ, সবুজ বনানী, লতা-পাতা ও শস্য উৎপাদন (প্রসব) করে থাকেন। তাই ধার্মেস অর্থাৎ সূর্যদেবের পাশাপাশি ভূমি-মায়ের পুজো করা এদের একান্ত আবশ্যক। বন্যা, ঝড় (বায়ু), দাবদাহ, খরা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির নিকট নিবেদ্য সামগ্রী উৎসর্গ করা ওঁরাওদের এক পুরাতন প্রথা। কারণ এদের বিশ্বাস যে, তাতে প্রকৃতি তুষ্ট হ'ন এবং পরিবেশ শান্ত থাকে। এর মধ্যে সুউচ্চ বিশালাকার পর্বতের অধিপতি গিরিশও এদের কাছে শিলাখণ্ড রূপে পূজিত হয়ে থাকেন।[৭৪] ওঁরাওদের প্রত্যেকের বাড়িতে পুজোর থানে শিলাখণ্ড রাখা বাধ্যতা মূলক। পুথিগত বিদ্যা ছাড়াই প্রাচীন কালে প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট রাখার মাধ্যমে অধিক শস্য উৎপাদন, সন্তান সন্ততির মঙ্গল কামনা ও অশুভ শক্তির বিনাশে যেভাবে নৈবেদ্য উৎসর্গ করত আজও ওঁরাও সমাজে নিয়মিত ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে। পুজোর উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হতো

দূর্বাঘাস, তুলসী, আম্রপল্লব, কলাপাতা, ফল-মূল, আতপচাল, চিঁড়া, মধু, ধুনো (শাল গাছের শুকনো আঠা), রান্না করা ভোগ(সুরি মাণ্ডি) ইত্যাদি। এছাড়াও ছাগ, মোরগ, শূকর, মেষ, মহিষ প্রভৃতি দেবতার নিকট বলি দান দেওয়া এদের প্রাচীন রেওয়াজ যা আজও বিদ্যমান। নৈবেদ্য সাজাতে পুজোর পাত্র তথা রেকাব হিসাবে এরা বট, শাল, মহুয়া বা কেন্দুয়া পাতা ব্যবহার করে থাকে।[৭৫] প্রকৃতির রূপ, কৃপা বা ক্রোধ যা কিছু প্রতক্ষ্য করা যায়, উপলব্ধি করা যায় এবং বাস্তব, সেই শক্তি এদের কাছে দেবতা, যার কোন মূর্ত প্রতীক নেই। তাই এরা কোন কাল্পনিক মূর্ত্তির পুজো করে না। তেত্রিশ কোটি না হলেও ওঁরাও জনজাতির প্রাচীন আরাধ্য সূর্য (ধার্মেস), বৃষ্টি, বায়ু, বজ্র, শিলা, অমা, বসুমাতা (চালা আয়ো) প্রভৃতি দেব-দেবীরা বৈদিক যুগে মুনি-ঋষিদের কাছে যথাক্রমে নারায়ণ, বরুণ, পবন, ইন্দ্র, শিব, কালী ও লক্ষ্মী রূপে পূজিত হয়েছেন বা বর্তমান কালেও পূজিত হচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ঋগবেদের মন্ত্র-প্রর্থনা, যজুর্বেদের আহুতি-উৎসর্গ, সামবেদের বন্দনা-প্রশস্তি ও অথর্ব্ববেদের অপার্থিব-আধিভৌতিক বিষয়গুলো প্রাচীন ভারতের বন্যজাতি তথা আদিবাসীরা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ পদ্ধতিতে নিবেদন, আহুতি, প্রর্থনা ও উৎসর্গ করেছে তা আজও এদের সমাজে একই ভাবে প্রচলিত ।[৭৬]

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত ওঁরাও সমাজ নিজেদের ঐতিহ্যকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য অন্য ধর্মের ছত্র ছায়ায় আশ্রিত হওয়ার চেষ্টা করছে। এই বৃহত্তর সমাজে অঙ্গীভূত হওয়ার মানসিকতাকে মার্টিন ওরাঙ্গ ‘Rank Concession Syndrome’ বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৭] আবার সংরক্ষণ ব্যবস্থার কল্যাণে এই জনজাতির মানুষদের মধ্যে বিশাল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। চাকরীর সুবিধাতে এই জনজাতির বহু মানুষ শহর ও শহরতলীতে বসবাস করছে। এই

শহরবাসী জনজাতি মানুষদের মধ্যে ‘এলিট’ শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে। এই শ্রেণীর মানুষরাই পারত তাদের ইতিহাস ও সামাজিক ব্যবস্থা সকলের কাছে তুলে আনতে কিন্তু সেটা না করে তারা তাদের পূর্বতন জনজাতির পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করে। অনেকে আবার নাম ও গোত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই জনজাতি সমাজ সংস্কৃতির যে টুকু বেঁচে রয়েছে তা হল গ্রাম্য ওঁরাও দের মধ্যে। ভবিষ্যতে সেটাও থাকবে কি না সেই অনিশ্চিয়তা থেকে যায়। বর্তমানে এই অধ্যায়টি আমার গবেষণার উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করে এবং ওঁরাওদের উৎস ,আদি ইতিহাস, ও প্রাচীন সমাজ ব্যাবস্থা সম্পর্কে কিছু ধারনা করে দেয়। স্বাধীনতার পরে বিংশ শতকে ওঁরাওদের সমাজ ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত আলোচনা তার আগে স্বাধীনতার পরে ওঁরাওদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি।

সূত্র নির্দেশক

১. R.O, Dhan These are my Tribesmen: the Oraons. Ranchi.1967.pp,71-77.

২. J. H. Hutton, Caste in India, Oxford University Press.second edition Mumbai 1951.p.4

৩. W.W Hunter,.*The Annals of Rural Bengal* Hansebooks Publishers, New York, 1868.pp,39-44.

৪. Ibid,pp,67-69.

৫. Ibid,pp,77-83.

৬. The Story of Anthropology from the Indian Viewpoint. Quoted in Sangeeta Dasgupta's The Journey of an Anthropoligist in Chotanagpur, The Indian Economic and Social History Review 41:2 (2004), New Delhi, pp.171-177.

৭. J.K Das,. Report on Scheduled Tribes of Orissa, Part-V-B, Volume-XII, Orissa-Census 1961. Director of Census Operations, Orissa.1971.pp.212-232.

৮. E. T. Dalton, Descriptive Ethnology of Bengal, Government Printing Press. Calcutta.1872.pp,44-49.

৯. Ibid,pp.53-59.

১০. Sir William Jones, On the Chronology of the Hindus, an Article published in Asiatik Researches, Kolkata, 2006, Vol. II.pp.31—37.

১১. Joe K.W. Hill. Agriculture, Irrigation and Ecology in Adivasi Villages in Jharkhand: Why Control and Ownership over Natural Resources Matter. Journal of Adivasi and Indigenous Studies 2014.pp.59-63.

১২. Daniel J. Rycroft. Looking Beyond the Present: The Historical Dynamics of Adivasi (Indigenous and Tribal) Assertions in India. Journal of Adivasi and Indigenous Studies 2014.pp.69-77.

১৩. Priyadarsi Mukherji. The Santal and Oraon Cosmogonic Myths and Certain Parallels in China: A Reflection of Socio-Cultural Realities. Vol. 36, No. 1/2, Indian Anthropological Association Jan-Dec 2006,pp.33-39.

১৪. M.N Srinivas,: Social Change in Modern India, Berkly University,1963, pp.78-89.

১৫. H Coupland, Manbhum District Gazetteers series, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1911.pp.149-155.

১৬. Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, 1960 vols I-II, ed. Verrier Elwin in A New Deal for Tribal India, (Ministry of Home affairs, New Delhi 1963.pp.101-119.

১৭. S. T. Das, :Tribal Development and Socio-Cultural Matrix. Delhi: Kanishka Publishers.1993.pp.69-77.

১৮. ibid.pp.88-93.

১৯. E. Campion, :My Oraon Culture. Ranchi, Jharkhand, India: Catholic Press.1980.pp.87-91.

২০. Ibid.pp.97-103.

২১. Op.cit.pp E. T. Dalton, 1872.pp.93-102.

২২. Ibid.pp.127-133.

২৩. Gopa Majumder (Paul).The Oraons of Barasat : A Study on Some Aspects of Demography, Journal of Human Ecology, Volume 14, Haryana,2003.pp.36-44.

২৪. K. C Pradhan. Tribal Development and Provisions of PESA. In S. N.Tripathy (Ed.), Rural Development and Social Change. New Delhi: Sonali Publications.2006, pp.77-82.

২৫. Ibid.pp.89-103.

২৬. S. C. Dube, (Ed).Tribal Heritage of India. Delhi: Vikash Publishing House.1977.pp.44-46.

২৭. Ibid.pp.63-66.

২৮. S. C. Roy. The Oraons of Chhotanagpur, Abhijeet Publication New Delhi.1915. p. 10.

২৯. Ibid.pp.19-27.

৩০. A. Bose, (Ed.). Demography of Tribal Development. New Delhi: B. R. Publishing.1990.pp.96-99.

৩১. Ibid.pp.107-113.

৩২. P. K. Bhowmik. Re-thinking Tribal Culture in India. Kolkata, 2001.pp.22-31.

৩৩. Ibid.pp.39-44.

৩৪. S. T Das,.Tribal Development and Socio-cCultural Matrix. Delhi: Kanishka Publishers.1993.pp.111-117.

৩৫. Ibid.pp.119-123.

৩৬. Ibid.pp.127-136.

৩৭. J. M Kujur,. Jharkhand its Administration and Development. In N. Mahanti (Ed.), Small State Approach in Tribal Development: A Paradigm Shift Delhi : Inter India Publication.2005.pp.29-54.

৩৮. ibid.pp.61-67.

৩৯. W Fernandes, Indian Tribals and Search for an Indian identity. Social Change.1993.pp.33-42.

৪০. Iibid.pp.49-56.

৪১. V.Elwin.Tribal world of Verrier Elwin, Oxford University Press.India,1964.pp.43-54.

৪২. Ibid.pp.67-73.

৪৩. Ibid.pp.81-93.

৪৪. S.C Dube, (Ed).Tribal Heritage of India. Delhi: Vikash Publishing House.1977.pp.34-41.

৪৫. Ibid.pp.44-53.

৪৬. A.Kujur, The Oraon Habitat a Study in Cultural Geography. Ranchi: The Daughters of St. Anne.1989.pp.21.37.

৪৭. Ibid.pp.41-49.

৪৮. Ibid.pp.57-66.

৪৯. J. M Kujur,.& S. J Minz,. (Eds.). Indigenous People of India Problems and Prospects. New Delhi: Indian Social Institute.2007.pp11-19.

৫০. Ibid.pp.21.28.

৫১. L. K. Mahapatra, Tribal Rights and Entitlements in land, Forest and Other Resources. Paper prepared for the UNDP Orissa Resettlement Policy Project.2005.pp.37-44.

৫২. Op.Cit kujur.pp,68-72.

৫৩. Ibid.*pp.89-94.*

৫৪. Migration Report of 1924-1945, Employee Centre, Dumka.p.21-29.

৫৫. K. S. Singh, Status of Scheduled Ttribes: Some Reflections on the Debate on the Indigenous People. Social Change.1993, pp 23-29.

৫৬. Ibid.pp.33-39.

৫৭. সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস/ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, ভূমিকা, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা-৬, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ৪১।

৫৮. S.R.Toppo.Tribes of India. Indian Publishers Distributors. Delhi, 2000.pp.66-72.

৫৯. Ibid.pp.79-84

৬০. Ibid.pp.89-95.

৬১. A. K. Pandey, Tribal Society in India. New Delhi: Manak Publication Limited.1997.pp.145-167.

৬২. Ibid.pp.171.182.

৬৩. B. R Pant.Tribal Demography of India. New Delhi: Anamika Publishers & Distributors (P) Ltd.2004.pp.66-77.

৬৪. Ibid.pp.88-91.

৬৫. H. M Mathur. Tribal land issue in India: Communal management rights and displacement. In J. Perera (Ed.). Land and Cultural Survival: The communal land rights of indigenous people in Asia Philippines: Asian Development Bank.2009 pp.164-192.

৬৬. Op.Cit Kujur.pp.111-119.

৬৭. Md. A Mallick. Development programs and tribal scenario: A study of Santhal, Kora and Oraon. Kolkata: Firma KLM Private Limited.2004.pp.79-87.

৬৮. Ibid.pp.97-105.

৬৯. Op.Cit,Mahapatra.pp.84-91.

৭০. K. S. Singh, Transformation of tribal society: Integration vs. Assimilation. Economic and Political Weekly.Mumbai,1982, Vol. 17, No. 34, 1376-1384.

৭১. Op Cit.Toppo.pp.92-101.

১২. Ibid.pp.132-139

১৩. Ibid.pp.144-149.

১৪. Op.Cit. Roy.pp.129-139.

১৫. R. Ekka. The Karam festival of the Oraon tribals of India: a socio-religious analysis. Proceedings of ASBBS. Vol.16. No.1. Paper presented at 18th annual conference of American Society of Business and Behavioral Science, Los Vagas.2009, pp19-23.

১৬. V.Xaxa. State, society and tribes: issues in Post-Colonial India.: Pearson Education, New Delhi,.2008,pp.69-73.

১৭. Op.Cit. Kujur.Pp.77-89.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওঁরাও জনজাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট

এই অধ্যায়ে, আমি প্রথমে ওঁরাও জনজাতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তন পরীক্ষা করি। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতির দ্বারা কি ভাবে তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গড়ে উঠল তা বর্ণনা করি। পরিশেষে, আমি ওঁরাওদের বিকল্প জীবিকার কৌশল এবং পরিবর্তনশীল অর্থনীতিতে তারা কীভাবে তাদের জীবন পরিচালনা করে তা বিবেচনা করি। জীবিকা নির্বাহ এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের শর্তগুলি তাদের পরিবেশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের অন্যান্য গোষ্ঠীর সাথে মিথস্ক্রিয়া দ্বারা তৈরি হয়।[১] এই বিষয়টি মাথায় রেখে, এই অধ্যায়ের মূল উদ্বেগের বিষয় হল কীভাবে ওঁরাও জনজাতির মানুষেরা কঠিন এক অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে টিকে আছে তা অন্বেষণ করা যা আমি নীচে বিশ্লেষণ করছি।

ওঁরাওরা তাদের ইতিহাসের পথে অনেক বাধা, দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছে।[২] সাহিত্য অনুসারে, দক্ষিণ ভারত, উত্তর ভারত এবং ছোটনাগপুরে তাদের বসতি সহ তাদের অভিবাসনের সময় পূর্ববর্তী আবাস স্থলগুলিতে তাদের তুলনামূলক ভাবে সমৃদ্ধ জীবন ছিল। তারা প্রকৃতি এবং জমি থেকে উৎপাদিত পণ্য থেকে বেঁচে ছিল। বন ও নদী থেকে তারা যে উপকরণ সংগ্রহ করেছিল তা তাদের জীবিকা নির্বাহকে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাহায্য করেছিল। দারিদ্র থাকলেও তাদের সমস্ত গ্রামগুলো অর্থনৈতিক ভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।[৩] সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে জনগোষ্ঠীগত ব্যবধান এ-দেশে ব্যাপক। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আদিবাসীদের মতো অতি অনগ্রসর জনগোষ্ঠীদের কোন ভাবেই সাঙ্গীকৃত করা হয়নি। বরং সমাজ ও সভ্যতা

থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। বসবাসের এলাকায় 'বহিরাগত দিকুরা' প্রবেশ করেছে। বনের ফল-মূল খেয়ে, কাঠ-পাতা বেচে, বন্যপ্রাণী শিকার করে, শামুক ইত্যাদি খেয়ে এঁরা এঁদের মতোই ছিলেন। বন তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছিল। ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণি আইন করে সমস্ত বন-জঙ্গল সংরক্ষণ করে নিল। অরণ্য এবং আদিবাসীরা ছিল অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। অরণ্যকে ঘিরেই এঁদের সংস্কৃতির গড়ে ওঠা। অরণ্যে বেঁচে থাকার প্রেক্ষিতেই গ্রাম প্রশাসন গঠন করা।[৪] এঁদের গোটা অস্তিত্বের সাথে নিবিড়ভাবে মিশে আছে আরণ্যক আবহ। ব্রিটিশ শাসনে আইন করে আরণ্যক প্রকৃতি-পরিবেশ থেকে অর্জিত তাঁদের সহজাত প্রত্যয়কে শেষ করে দেওয়া হয়। এর প্রভাব পড়ে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনে। বৃটিশ সরকার আইন করে সমস্ত বনজঙ্গল সংরক্ষণ করে দেওয়ার ফলে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আঘাত আসে।[৫] যাইহোক, তাদের জীবনধারায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং হিন্দু, মুসলমান এবং ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এই ভাবে তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রায় নানা সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ওঁরাও, সাঁওতাল, মুন্ডা এবং অন্যান্য জনজাতিরা যখন এই অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেছিল, তখন অঞ্চলটি বন ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। এই জঙ্গলাকীর্ণ জমি চাষের উপযোগী করে কৃষিকাজ কে প্রধান জীবিকা হিসাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। জঙ্গলের পরিবেশে বসতি স্থাপনের প্রাচীন অভিজ্ঞতা এবং নৃতাত্ত্বিক জনজাতির দক্ষতা জঙ্গল পরিষ্কার এবং কৃষির সাথে সম্পর্কিত।[৬] ব্রিটিশ ভারতের উপনিবেশকারীরা, নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের এই দক্ষতাগুলি পর্যবেক্ষণ করে, বড় আকারের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণে তাদের নির্মমভাবে ব্যবহার করেছিল, যা এই জনজাতির জীবিকাকে প্রভাবিত করেছিল। এই জনজাতির মানুষদের রেলপথ নির্মাণের জন্য কাঠ কাটা এবং বনকে কৃষি জমিতে রূপান্তর করার

কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৭] ফলস্বরূপ, বন ও জঙ্গল বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং একটি মিশ্র বন-খামার অর্থনীতি থেকে ধান-চাষ উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হয়। এই পরিবর্তনগুলি পরিবেশগত ভারসাম্য এবং জনজাতিদের জীবিকা ও অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে। তবে ব্রিটিশ সরকারের সময় ওঁরাওরা অনুরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল। ওঁরাও জনজাতির মানুষেরা বন উজাড় করে জমি চাষ করত, কিন্তু তাদের সেসব জমির মালিকানা দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও, তারা স্থানীয় জমিদারদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রেখে প্রজা বা ভাগচাষী হিসাবে তুলনামূলকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, তার একটা অন্যতম কারণ হল তাদের চাহিদাবিহীন অপেক্ষাকৃত সহজ জীবন যাত্রা।[৮] এছাড়াও, ওঁরাওরা উৎপাদনমুখী অর্থনীতিতে অভ্যস্ত ছিল না। মুদ্রা বা নগদ অর্থনীতির সংস্কৃতি নিয়ে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা বন ও জঙ্গলে খাদ্য সংগ্রহের উপর আংশিকভাবে নির্ভরশীল ছিল এবং প্রধানত একটি জীবিকা নির্ভর অর্থনীতির অনুশীলন করত, যা লাভ-ভিত্তিক ছিল না। জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি বজায় রাখা ছিল তাদের অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য অথচ সমগ্র ভারতের অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন কালে শোষণ সত্ত্বেও ব্রিটিশরা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা ও বৃদ্ধি করে। ওঁরাও দের পশুচারক অর্থনীতি সেই প্রেক্ষিতে পশ্চাদপর হয়ে ওঠে। আধুনিক জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী তারা দারিদ্র সীমার নিচে (BPL) বসবাসকারী গোষ্ঠীতে পরিনত হয়, যা তারা সভ্যতার আদিকালে ছিল না। উপরুন্তু, ওরাওঁরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, কারণ জঙ্গল ও বন উজাড়ের ফলে তাদের শিকার এবং সংগ্রহের অর্থনীতি নষ্ট হয়ে যায়। এই পরিবর্তনটি সমস্যাযুক্ত ছিল, কারণ তারা তাদের অর্থনৈতিক সঙ্কট পরিচালনা করার জন্য স্থানীয় ঋণদাতার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। তবে, তারা

মহাজনদের কাছ থেকে ঋণের সাথে যুক্ত সুদের প্রভাব বুঝতে পারেনি।[৯] ওঁরাওদের অর্থনীতি ও জীবিকার এই রূপান্তর ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, যার ফলশ্রুতিতে ওঁরাওদের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও দুর্বল হয়েছিল। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অনেক ওঁরাওরা জমি, গবাদিপশু, বাড়িঘর এবং সম্পত্তি ছেড়ে দেশের অন্যান্য অংশে জীবিকার সন্ধান করে এবং নতুন জীবিকার সহায়তায় অন্যান্য জনজাতির সাথে মিলেমিশে স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করে।[১০] স্বাধীনতার পরে এই সব কারনেই তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ওঁরাওদের জীবনযাত্রার ব্যাঘাত মূলত ছোটনাগপুরেই শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ মধ্যস্থতাকারীরা কর বা রাজস্ব সংগ্রহ করতে গিয়ে, এই জনজাতির মানুষদের অত্যাচার করত এমনকি অবৈধভাবে জমি দখল করে নিয়েছিল। এই ভাবে ধীরে ধীরে বেশিরভাগ এই জনজাতির মানুষেরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়ে পড়েছিল।[১১] জনজাতিদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে একটা লোকগান পাওয়া যায়।

'মুলুকে নাহি মিলে কাম বিহানে হয় টান। কৈসে বাঁচে প্রাণ? সাঁঝে খালে পরের ঘরের পর খাটালী সকাল হ'লেই যায় বাগালীরে খ্যাটে খ্যাটে পিঠে বহে ঘাম কৈসে বাঁচে প্রাণ? নওয়াগড়ের কুটুম অ্যাল খাওয়া- দ্যাওয়া স্যারে গেল মাড়ভাতে রাখলই মান কৈসে বাঁচে প্রাণ"। জনজাতিদের জীবনের কান্না জড়ানো আছে এই গানের প্রতিটি ছত্রে। নিত্যদিনের জীবনসংগ্রাম লেখা আছে। ফুটে আছে অর্থনৈতিক জীবনের করুণ কথা। ঝাড়খণ্ড থেকে গানটি সংগ্রহ করেছেন নৃবিজ্ঞানী ড. পশুপতি প্রসাদ মাহাতো। তাঁর মতে, বৃটিশ সরকার আইন করে সমস্ত বনজঙ্গল সংরক্ষণ করে দেওয়ার ফলে এই সব জনজাতিদের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আঘাত আসে।[১২] জঙ্গলের গাছপালা কাটা, বন্য পশুপক্ষী শিকার, ফলমূল, মধু সংগ্রহ সংরক্ষণ করার ফলে, যারা কেবল

বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ছিল তাদের খাদ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। ফলে তাদেরকে জঙ্গলচ্যুত হতে হয়। অসহায় অবস্থায় তারা জঙ্গলের বাইরে বাসস্থান তৈরি করে।[১৩] কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য নানাবিধ অসামাজিক কাজের মধ্যে নিজেদেরকে নিযুক্ত করে। আদিবাসী গোষ্ঠীর অনেকে নিজ বাসভূমি বা চাষের জমি হারিয়েছে। যে সমস্ত আদিবাসী, সমতলভূমিতে চাষের উপর নির্ভরশীল, বিংশ শতকে তাদের চাষের জমি নানাভাবে হস্তচ্যুত হয়েছে। প্রতিবেশী মানুষ টাকা ধার দিয়ে অল্প মূল্যে অধিকাংশ জমি গ্রাস করে নিয়েছে। ফলে আদিবাসীরা ভূমিহীন হয়ে পড়েছে। অনেক সময় কাজ করার পদ্ধতি না জানায় অপরের হাতে জমি তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। এইভাবে ব্রিটিশ আমলে অরণ্যচারী আদিবাসীদের অর্থনেতিক কাঠামোকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় নানা সমস্যা। এদের স্বাভাবিক জীবনছন্দ বিনষ্ট হয়ে পড়ে ।[১৪] স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ওঁরাওরা ভারত সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতির দ্বারা নিজেদেরকে কিছুটা হলেও সুরক্ষিত মনে করেছিল যা, ওরাওঁদের পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[১৫] এই জনজাতির পরিবর্তিত জীবিকা ও অর্থনীতির বর্ণনা করতে গিয়ে, প্রথমে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কিভাবে এই জনজাতির মানুষেরা দেশের ঘন জঙ্গলে বসবাস করত তা আরো বিস্তৃত বলা যায়। ব্রিটিশ উপনিবেশকারীরা ও স্থানীয় মধ্যস্থতাকারী, এই জনজাতির মানুষদেরকে কৃষিকাজ করার জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করতে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এমনকি ব্রিটিশরা ঘোষণা করেছিল যে, এই জনজাতির লোকেরা যদি ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং কৃষিকাজ করে তবে সরকার তাদের করমুক্ত এবং রাজস্বের জন্য সেই জমিগুলির মালিকানা দেবে। কিন্তু ব্রিটিশরা তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হয়।[১৬] ফলে স্থানীয় জমিদাররা জমির মালিক থেকেই যেত। জমির মালিকানা বিষয়ে

ধারণা জনজাতিদের কাছে অচেনা। প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক জন কে টমাসের ভাষায় : 'More important, the notion of permanent, individual ownership of land was foreign to most tribals. Land, if seen in terms of ownership at all, was viewed as a communal resource, free to whoever needed it. By the time tribals accepted the necessity of obtaining formal land titles, they had lost opportunity to lay claim to lands that might rightfully have been considered theirs.' [১৭]

ব্রিটিশ শাসক-প্রবর্তিত স্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে আদিবাসীদের যৌথ অধিকার বিনষ্ট হয়। একসময় ওঁরাওরা নিয়মমাফিক জমির স্বত্ত্বাধিকারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। স্বত্ত্ব-ই তো জমি মালিকানার প্রাথমিক দলিল। কাজেই তাঁরা স্বত্ত্ব দখলে সচেষ্ট হন। কিন্তু তাতে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। মি. টমাসের ভাষায় : 'Generally, tribes were severely disadvantaged in dealing with government officials who granted land titles.' এই বঞ্চনার তীব্র নজির স্বাধীন ভারতের সত্তর দশকেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়।[১৮] স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জনজাতিরা যা কিছু সুবিধা পেয়েছিল, সত্তর দশকের পর থেকে তা ক্রমশ কমতে থাকে।[১৯] বহিরাগতদের আগমন বাড়তে থাকে। নাটকীয়ভাবে আদিবাসীদের অভিপ্রয়াণ (migration) বৃদ্ধি পায়। আদিবাসী এলাকার কনস্টেবল বাহিনী এবং খাজনা আদায়কারী জমিদাররা ছিলেন আদিবাসীদের কল্যাণ বিষয়ে অনাগ্রহী। এছাড়াও ছিলেন এমন সমস্ত অ-আদিবাসী সমাজের মানুষ যারা স্থানীয় অফিসারদের ঘুষ দিয়ে নানা অনৈতিক কাজ করিয়ে নিতে পারত। এই অনৈতিক কাজে সভ্যজনের অভিপ্রায়ের কোন খামতি ছিল না। এই দুই দুষ্টচক্রের ক্ষতিকারক মধুচন্দ্রিমা অজস্র আদিবাসীদের

জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সহায়ক শক্তি ছিল। জমি হারানোর অর্থ এঁদের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হওয়া, জমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মূল্যবোধ, জীবনবোধের স্বাভাবিক বিশ্বাসভূমি ছন্দহীন হওয়া।[২০] এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি বিষয়ে, মি. টমাস লিখেছেন : "The twentieth century, however, has seen far-reaching changes in the relationship between tribals in India and the larger society and by extension traditional tribal economics."[২১] এই সব জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা বসবাস করে রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলে। সেখানকার জমি অনুর্বর, রুক্ষ এবং জঙ্গলাকীর্ণ। সেচের সম্প্রসারণের সুযোগও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এর উপর প্রায় সত্তর শতাংশ পরিবার একেবারেই ভূমিহীন। শিক্ষায় অনগ্রসরতা এবং দুর্গম স্থানে বসবাসের কারণে আধুনিক কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জিত হয়নি। সে কারণে বৃহত্তর অংশের জীবিকা দিনমজুরি অথবা জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা।দিনমজুরি এবং কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা অর্জন ছাড়াও আছে খাদ্য অন্বেষণ, পশুপালন, হস্তশিল্প, স্থায়ী চাষ, স্থানান্তর প্রথায় চাষ। আদিবাসীদের যাঁরা সমভূমিতে বসবাস করেন তাঁরা স্থায়ী চাষের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতাল ও ওঁরাওরাই প্রধান।[২২] এই ভূমিলগ্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর জীবনে কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে পূজা ও উৎসব সবকিছুই পালিত হয়। অবশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি, উপযুক্ত আবাসের অভাবে যখন এইসব জনজাতির মানুষ শ্রমশক্তিকে মূলধন করে নিজ নিজ ভৌগোলিক বৃত্তের বাইরে চলে আসে তখন স্বাভাবিকভাবে অন্য উপজীবিকা বা সংস্কৃতির মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের দিন-চর্যা পরিবর্তিত হতে থাকে। 'নতুন জায়গায় নতুন জীবিকা গ্রহণ করলে সেখানকার পরিবেশের প্রভাব আদিবাসী জীবনের উপর পড়ে। অর্থনৈতিক জীবনের হেরফের

হওয়ার ফলে সাংস্কৃতিক জীবনও অনেকটা পাল্টে যায়। পাল্টায় মন-মানসিকতা এবং জীবনধারাও।[২৩]

অতীতে জনজাতিদের অর্থনৈতিক জীবন ছিল অতি সরল প্রকৃতির।বনবাসী সহজ-সরল মানুষগুলোর কাছে জীবনধারণ মানেই জীবিত থাকা। অস্তিমান থাকাই যে জীবন নয়, তা কেবল টিকে থাকা এ-সত্য তাঁদের উপলব্ধি করতে অনেক সময় লেগেছে। সময়ের তালে তালে চারদিকে নানা পরিবর্তন ঘটে চললেও আদিবাসীদের অর্থনীতি অস্তিত্ব নির্ভর (subsistence economy) হওয়ায় তাঁদের জীবনে তেমন কোন উত্তরণ আসেনি।[২৪] আদিবাসী অর্থনীতি বিষয়ে ড. প্রকাশচন্দ্র মেহতা লিখেছেন :'Moreover, their economy can be said to be subsistence type, they practise different types of occupations to sustain themselves and live on 'Marginal economy'. We find the tribals of India belonging to different economic stages, from food gathering to industrial labour, which present their overlapping economic stage in the broader frame work of the stage economy. And the last important point to be emphasized is that a tribe is usually considered an economically independently group of people having their own specific economy and thus having a living pattern of labour, division of labour and specialization, gift and ceremonial exchange trade and barter, credit and value, wealth, consumption norms capital formation, land tenure and good tangible and intangible economic status, all these have

their own speciality which identified the tribal economy in the broader set-up of Indian economy."।[২৫]

অর্থনৈতিক জীবনে তাঁরা নানা পর্যায় অতিক্রম করে এসেছেন। কোনো কোনো গোষ্ঠী খাদ্যান্বেষণ থেকে শিল্প মজুরিকে জীবিকা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আদিবাসী-এলাকায় কোনো বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা সেখানে শিল্পমজুর হয়েছেন, কখনও-বা জঙ্গলচ্যুত হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। নতুন পরিবেশ, পরিমণ্ডলে জীবিকাও গেছে পাল্টে। তাঁরা কখনো জন্ম-অরণ্যভূমি ছেড়ে চা-বাগানের শ্রমিক হয়েছেন। রেলের মজুর, অন্যের বাড়িতে কৃষিমজুরও হয়েছেন। যেটি গুরুত্ব দিয়ে বলার তা হল, আদিবাসীদের অর্থনীতি আদিবাসীদের মতই পশ্চাদপর। প্রতিটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীরই রয়েছে নিজস্ব বিশেষ অর্থনীতি। এঁরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন জনগোষ্ঠী।[২৬] এদের শ্রমবিন্যাস ও শ্রমবিভাজন, ব্যবসা ও পণ্য বিনিময়, উৎসব অনুষ্ঠানে উপহার বিনিময়, হিসাব-নিকাশ ও মূল্য নির্ণয়, সম্পদ, খরচরীতি, পুঁজি গঠন, জমির ভোগদখল, অধিগম্য ও অনধিগম্য অর্থনৈতিক অবস্থান-এ সমস্ত কিছুই ভারতীয় অর্থনীতি তথা আর্য অর্থনীতি তথা মূলস্রোত অর্থনীতি থেকে বিশেষভাবেই স্বতন্ত্র। অধ্যাপক হিমাংশুমোহন রায় আদিবাসীদের অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন –

(১) এঁদের অর্থনৈতিক কাঠামোতে বিনিময়ই যথেষ্ট, মুদ্রার চলন নেই।

(২) নিজেদের জীবনধারণের জন্যই এঁদের আহরণ ও উৎপাদন, তাই লাভ-এর হিবেস-নিকেশ জরুরি নয়।

(৩) অনুন্নত, সরল ও সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাপ কম।

(৪) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে যৌথ প্রচেষ্টার উপর অর্থনৈতিক কাজ বেশি নির্ভরশীল।

(৫) জীবনের চাহিদা কম বলে অর্থনৈতিক জীবনও সাদামাটা ও সাবেকি।

(৬) বাইরের পণ্য আমদানি নেই, সমবায় সমিতি নেই, ব্যাঙ্ক মাধ্যম নেই।

(৭) খাদ্যান্বেষণে সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকতে হয় বলে অর্থনৈতিক গঠন বলতে যা বোঝায় তা গড়ে ওঠেনি।

জীবনের কর্মবিন্যাসকে কেন্দ্র করেই নির্মিত তাঁদের অর্থনৈতিক কাঠামো।[২৭] আদিবাসী অর্থনীতির মূল্য বৈশিষ্ট্য-অরণ্য-প্রকৃতির সাথে তাঁদের অর্থনৈতিক জীবনের নিবিড় সম্পর্ক। তাঁরা অরণ্যসন্তান। অরণ্যই আদিবাসীদের প্রতিপালনকারী মা। ড. মেহতার ভাষায়,"The linkage between the tribals and forests is traditional. Tribals are economically and ecologically inseparable from forests. Be it food, fodder or fuel needs, the tribals inescapably and assuredly depended on his surrounding forests for sustenance even during troubled time of droughts."।[২৮] সংবিধানের ১৬ নং ধারার চতুর্থ অনুচ্ছেদে তফসিলভুক্ত আদিবাসীদের জন্য সাংবিধানিক রক্ষাকবচের বাবস্থা করা হয়েছে। এই ধারা যাতে যথাযথ বাস্তবায়িত হয় তার জন্য রাষ্ট্রপতিকে ৩৪১ এবং ৩৪২ ধারানুসারে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপাল বা মুখ্য প্রশাসকের সাথে আলোচনা করে তিনি অনগ্রসরদের তালিকাভুক্ত করবেন, যাতে তালিকাভুক্ত অনগ্রসররা সাংবিধানিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে অগ্রসর হতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮১ সালে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৩৮টি। সংবিধান অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি একজন কমিশনার নিয়োগ করেন। তাঁর কাজ তফসিলভুক্ত জাতি-উপজাতিদের স্বপক্ষে যে সমস্ত আইন রয়েছে সেসব যথাযথ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা দেখা। অধ্যাপক রায় ‘ভারতের আদিবাসী' গ্রন্থে লিখেছেন, প্রত্যেক রাজ্যের আদিবাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্যপালের। তার বদলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী

উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্বে থাকবেন। যে সমস্ত রাজ্যে আদিবাসীরা সংখ্যায় অধিক, সেখানে স্বনির্ভর আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্থাপিত হবার কথা। সংবিধানের পঞ্চম তালিকা (Fifth Schedule) অনুসারে, আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিনে আদিবাসী গবেষণা কেন্দ্র এবং আদিবাসী উপদেষ্টা সমিতি নামক দুটি কার্যনির্বাহী সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতির কাজ আদিবাসী কল্যাণ পরিকল্পনার কাঠামো তৈরী করা এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিষয়ে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া। এ সমস্ত পরিকল্পনা যথাযথ রূপায়ণের জন্য এবং কেন্দ্র-রাজ্যের সমন্বয় রচনার জন্য একদল উপ-অধিকর্তা নিযুক্ত করা হয়। এদের সকলের মাথার উপর রয়েছেন রাষ্ট্রপতির অধীন একজন জাতীয় কমিশনার যাঁকে সাহায্য করার জন্য বর্তমান রয়েছেন দশজন সহ-কমিশনার।[২৯] সংবিধানের ১৬ নং ধারায় প্রত্যেক নাগরিকের 'equality of opportunity' সুনিশ্চিত করার কথা দেওয়া আছে। এক্ষেত্রে জাত-বর্ণ-ধর্ম-জন্ম-সম্প্রদায় কোন কিছুই অন্তরায় হবে না। সংবিধান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শিবানী কিঙ্কর চৌবে-এর বিশ্লেষণ : Articles 15, 16, 17 and 18 broadly, relate to social economic equality.' অর্থাৎ, বৃহৎ অর্থে সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ এবং ১৮ নং ধারার লক্ষ্যই হল, আর্থ-সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। এভাবে দেখা যায়, তফসিলভুক্ত জনজাতিদের অনগ্রসরতা দূর করতে সাংবিধানিক রক্ষাকবচের কোনো ঘাটতি নেই। যত ঘাটতি তাদের যারা আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রূপায়ণের দায়িত্বে থাকেন। আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রখ্যাত আদিবাসী গবেষক সুহৃদকুমার ভৌমিকের নিবিড় অভিজ্ঞতা জাত বিশ্লেষণ, ‘মেদিনীপুরের বহু উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় কুঁয়া খুঁড়ে দেওয়া, সমবায়ের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক জীবনকে আরও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে এসব মুনাফাখোর ব্যক্তিদের কবল থেকে এদের রক্ষা করার জন্য সমবায়

শস্যভাণ্ডার (Co-operative grain gola) গড়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও এই সকল শস্যভাণ্ডার ব্যর্থতার নিদর্শন হয়ে রয়েছে। এরপর কোন কোন স্থলে কৃষিজীবী উপজাতিদের জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। কোথাও-বা সরকারী চেষ্টায় এদের বলদ বা ছাগল কিনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে উপজাতি মানুষগুলোকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার চাইতে একরকম ভিক্ষুকশ্রেণীতে পর্যবসিত করা হয়েছে বলে অনেকের অনুমান। কেননা, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্গী হলেও তারা সমাজের দূরে সরে না থেকে অন্যান্য প্রতিবেশী মানুষের আরও নিকটে আসবে"।[৩০]

এই জনজাতিদের সার্বিক বিকাশে স্বাধীন ভরতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পঞ্চশীল নীতিও করেছেন কিন্তু এই নীতিগুলি যে পুরোটাই নেহেরুর নিজস্ব ভাবনা তা কিন্তু বলা যায় না।[৩১] কারন, তাঁর প্রথম নীতিতে, আদিবাসীদের নিজস্ব সৃজন ক্ষমতার পথেই তাদের উন্নয়ন ঘটাতে হবে, বাইরে থেকে জোর করে তাঁদের উপর কোন কিছু আরোপ করা যাবে না। জমি ও জঙ্গলের উপর আদিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণের কথা নেহেরু তাঁর দ্বিতীয় নীতিতে স্থান দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর পূর্বেই সংবিধানে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। আদিবাসী জনগোষ্ঠী জমি ও জঙ্গলের সঙ্গে এতটাই নিবিড়ভাবে বিজড়িত যে, জমি-জঙ্গল থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা হলে সমগ্র সম্প্রদায়টাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।[৩২] ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে আদিবাসীদের জন্য এই ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে। ষষ্ঠ তফসিলের ৩(১) (ক), (খ) ও (ঘ) অনুচ্ছেদে সব স্বশাসিত জেলা পরিষদকে জমি ও ঝুমচাষ নিয়ন্ত্রণ এবং অসংরক্ষিত জঙ্গলে পরিচালনা বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে যে সকল পার্বত্য এলাকায় ষষ্ঠ তফসিল কার্যকর নয়, সেখানে আদিবাসীদের জমি-জঙ্গল সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সংবিধানের ৩৭১ নং ধারানুসারে কেন্দ্র

রাজ্যকে পার্বত্য এলাকায় প্রশাসন বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারেনি। সেই ধারা বলে ১৯৭১ সালে সংসদে Manipur (Hill Areas) District Councils Act প্রণয়ন করা হয়, যেখানে মণিপুরের সমস্ত পার্বত্য এলাকা নিয়ে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়। এই পরিষদ ষষ্ঠ তফসিলি বহির্ভূত হলেও আদিবাসী জমি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিষদের হাতে অনুরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ১৯৬০ সালে মণিপুরে Manipur Land Revenue and Land Reform Act নামক যে-আইন প্রণয়ন করা হয়, তাতেও আদিবাসী জমি অ-আদিবাসীদের কাছে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।[৩৩] ১৯৬০ সালে ত্রিপুরাতেও মণিপুরের মতো অনুরূপ আইন পাস করা হয়। বি পাকেম তাঁর 'Jawaharlal Nehru's Tribal Panchshila and the Hill People of North-East India: A Critique' শীর্ষক দীর্ঘ গবেষণাপত্রে উক্ত ত্রিপুরা আইন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'This Tripura Act has been regarded as one of the most progressive legislations of the country.'।[৩৪] আদিবাসী জমি ও জঙ্গল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই সব আইনি বিধান নেহেরুর পঞ্চশীল নীতি নয়, আম্বেদকর-রচিত সংবিধান অনুসারেই এসেছে। নেহেরুর তৃতীয় নীতিতে, আদিবাসী এলাকায় উন্নয়নমূলক এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য তাদের-কে প্রশিক্ষিত করে, তাদের দিয়েই টিম তৈরি করার কথা এবং আদিবাসী অঞ্চলে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কথাও বলা হয়েছিল।[৩৫] এই নীতি কার্যকর করতে নেহেরু আদিবাসীদের জন্য চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। আদিবাসীদের প্রতি যখন নেহেরুর প্রীতি, প্রত্যয় ও প্রভাব সংহত হয়নি তার পূর্বেই বাবাসাহেব জনজাতিদের উন্নয়নের প্রশ্নে সংরক্ষণের জন্য আন্দোলন করেছেন।[৩৬] ভারতবর্ষে সংরক্ষণের মাধ্যমেই যুগ-যুগান্তের অবহেলিত জাতি-জনজাতিদের অন্ধকার-অবহেলার বলয় থেকে তুলে আনা

যায়, তা বাবাসাহেব অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই নির্যাতিত শ্রেণির রক্ষাকবচের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত ধারা সংবিধানে অঙ্গীভূতকরণের জন্য তিনি দাবি জানিয়েছিলেন। নেহেরু যখন আদিবাসীদের কথা ভাবেনইনি, তখন ড. আম্বেদকর তাঁদের 'rightful due'-এর জন্য লড়াই করেছিলেন।[৩৭] সংরক্ষণকে ড. আম্বেদকর 'compensatory justice' – ক্ষতিপূরণমূলক ন্যায় বলে মনে করেছেন। গবেষক এস কে বিশ্বাসের ভাষায় :'The backward communities were awarded their due rightful privileges under article 15 (4), 16 (4), 46, 330 and 335 and to the OBC under article 340 of the Constitution. These rights and privileges conferred by Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar the Great through the Constitution on the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the OBC's in the sixteen states and two Union territories are termed as reservations in Indian context."।[৩৮] ১৯১৯ সালে সাউথ বোরো কমিটির কাছে বাবাসাহেব নির্যাতিত শ্রেণির জন্য যে সকল সুপারিশ করেছিলেন তার পরিণতিতেই ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজবিন্যাসের বাইরে অবস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্যাতিত শ্রেণির ভারতীয় ইতিহাসে প্রথম রাজনৈতিক সাংবিধানিক অধিকার স্বীকৃত হয়। এই জয় শুধু ড. আম্বেদকরের নয়, সমগ্র নির্যাতিত শ্রেণির। বাবাসাহেব যখন এইসব করেছিলেন, নেহেরু তখন আদিবাসীদের উন্নয়নে পঞ্চশীল নীতির কথা ভাবতেই পারেননি। প্রকৃত গণতন্ত্রে সাময়িকের জন্য সংরক্ষণ কোন অন্যায় নয়। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিষাক্ত জাত ব্যবস্থার কারণে যে অক্ষমতা ও পঙ্গুতা বৃহত্তর নিপীড়িত নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের সহ্য করতে হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে তা নিরসনে সংরক্ষণ ব্যবস্থা হল একটি ক্ষতিপূরণমূলক পন্থা। ড. অমিতাভ নাগরালের ভাষায় সংরক্ষণ হল 'a matter

of participation' অর্থাৎ, অংশগ্রহণের বিষয়। বাবাসাহেব Social Imbalance দূরীকরণে সংরক্ষণ সমর্থন করেছিলেন। বাবাসাহেবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জাস্টিস পি ভেনুগোপাল বলেছিলেন, Reservation is not a device to secure jobs in Government services and better economic conditions of the backward classes, scheduled castes and tribes. It is compensatory justice to off-set the accumulated disabilites of historically handicapped sections of the society. It is compensatory preference to liberate the oppressed and depressed from their age-long social and cultural shackles. It is acting as a stimulus and catalyst for thier uplift and their advance.।[৩৯] তাদের অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য এই ব্যবস্থা উদ্দীপক বস্তু এবং অনুঘটকের কাজ করছে। সংরক্ষণ হল প্রশাসনে অংশগ্রহণের এবং ক্ষমতায় সমানুপাতিক অংশীদার পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি মাধ্যম। অধিকারহীনদের কল্যাণে এটি একটি অনিবার্য নীতি। Reservation is a matter of participation, or participation in education, services, politics etc. It is never a mercy given by the Government. It is a legitimate right of the oppressed. Exploitation is not automatic or natural, it is intentioal. So reservation has been evolved for removal of disabilities arising out of untouchability.।[৪০] নেহেরুর পঞ্চশীলের তৃতীয় নীতির দ্বিতীয়াংশে রয়েছে আদিবাসী এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশাধিকারের বিধিনিষেধ। উদ্দেশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অত্যাচার থেকে আদিবাসীদের রক্ষা করা। ত্রিপুরা রাজ্যে এককালে যেখানে প্রায় ১০০ শতাংশই ছিল আদিবাসীর বাস, সেখানে আজ ভূমিপুত্র আদিবাসীরাই

সংখ্যালঘু। সেখানে আজ বাঙালি-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। ওবিসি, এসসি, এসটির সমন্বয়ে গঠিত Depressed Class-কে সুরক্ষা দিতে বাবাসাহেব তিরিশের দশকে জোরালো সওয়াল করেছিলেন।[৪১] ১৯৩১ সালের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে তিনি বর্ণহিন্দুদের পীড়নমূলক আচরণ থেকে নিপীড়িত শ্রেণিকে রক্ষা করার কথা বলেছিলেন। 'We agree that this tyranny of the majority must be put down with a firm hand if we are to guarantee the Depressed Classes the freedom of speech and action necessary for their uplift.[৪২]

নেহেরুর উপরোক্ত তিনটি আদিবাসী উন্নয়ন নীতিগুলি মূলত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক। তাঁর চতুর্থ নীতিটি হল আদিবাসীদের রাজনৈতিক রক্ষাকবচ প্রদানের পক্ষে সহায়ক নীতি। এই নীতির মাধ্যমে নেহেরুজি আদিবাসীদের অগ্রগতির জন্য আইনসভায় তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তবে নেহেরুর এই Reservation of Seats কংগ্রেসের উচ্চবর্ণীয় নেতৃবৃন্দ প্রথম দিকে মেনে নেননি। গণপরিষদের সকল কংগ্রেসি সদস্য আসন সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছিলেন। এবং নেহেরুজি এই বহু বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর মন স্থির করতে পারেননি। নির্যাতিত শ্রেণির অনুকূলে আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নেহেরুজির প্রচেষ্টার দুই দশক আগে বাবাসাহেব এই প্রশ্নে আন্দোলন শুরু করেছিলেন।[৪৩] চতুর্থ নীতিতে আদিবাসীদের উপর অতিরিক্ত প্রশাসনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। বি পাকেম এই প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেওয়া থেকেই এই অতিরিক্ত শাসন উঠে আসতে পারে। এই কারণেই আদিবাসী কল্যাণে নেহেরু চতুর্থ নীতি রচনা করেন।[৪৪] শঙ্করানন্দ শাস্ত্রী তাঁর 'My Memories and Experiences of Babasaheb Dr. BR Ambedkar and His Contribution to Nation' নামক

অসাধারণ গ্রন্থে লিখেছেন, "The Hindu is such a powerful poision that it enslaves the mind. An enslaved mind needs no bullet to suppress. It willingly surrenders'[৪৫] পঞ্চশীলের পঞ্চম অর্থাৎ শেষ নীতিটি অবশ্য আন্তরিক ও মানবিক। এতে বলা হয়েছে, উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার কার্যকারিতা কোন পরিসংখ্যান বা অর্থব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা বিচার করা হবে না, তা করা হবে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা গুণগত মান কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে একমাত্র তার দ্বারাই। এর মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের প্রতি নীতি রচনাকারের অগাধ সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। দুঃখের হলেও সত্য, এই নীতির রূপকার হলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তার দীর্ঘ রাজত্বকালে তার মেয়ে, নাতি এবং অনুগামীদের সুদীর্ঘ শাসনকালেও উক্ত রূপকারের আন্তরিকতা কার্যকরী রূপ পায়নি। ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও দেখা যায় যে, আদিবাসীদের জীবনের গুণগত উৎকর্ষ সত্য হয়ে ওঠেনি। আসলে, আদিবাসী কল্যাণের সদর্থক রূপরেখা থাকলেও তা রূপায়ণে সরকারি তাগিদ, প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল না।[৪৬] নেহেরুজির পঞ্চশীল নীতি তাই প্রতারণামূলক প্রচেষ্টার মাত্রা ধারণ করেছে। বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর বিশ্বাস করতেন, জাত ব্যবস্থায় প্রত্যয়শীল বর্ণহিন্দুরা শাসক হয়ে কোনোদিনই আন্তরিকভাবে নির্যাতিত শ্রেণির মঙ্গলসাধন করবে না। তাই দেখা যায়, জনজাতিদের জন্য পর্যাপ্ত রক্ষা কবচ এবং অসংখ্য কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্প থাকা সত্ত্বেও তাঁদের উন্নতি হচ্ছে না। সুচতুর বর্ণহিন্দুরা শাসক হয়ে পরিকল্পনায় যতটা গুরুত্ব দিয়েছে, রূপায়ণে ততটাই অবহেলা-অনীহা দেখিয়েছে। এভাবে দেখা যায়, জনজাতি কল্যাণে নেহেরুর পঞ্চশীল নীতির মধ্যে অভিনবত্ব ও মৌলিকত্ব নেই। নেহেরুর পঞ্চশীল নীতি আম্বেদকরীয় সংগ্রাম ও সংবিধানের আলোকেই রচিত। তার

কৃতিত্ব হল বর্ণহিন্দু ভাইদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও তিনি তার নীতিতে আন্তরিক থাকতে চেষ্টা করেছিলেন।[৪৭]

প্রথম অধ্যায়ে আমি ড. ভেরিয়ার এলুইনের আদিবাসী ভাবনা নিয়ে আলোকপাত করেছি।তাঁর আদিবাসীদের নিয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গুলি হল, The Tribal World of Verrier Elwin, A Philosophy for NEFA, The Aboriginals, Issues in Tribal Policy Making, For the Tribal Way, The Tribal People of India, A New Deal for Tribal India-এই গ্রন্থাবলির মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সভ্যতার সংস্পর্শে এসেই আদিবাসী সমাজ নষ্ট হতে বসেছে। আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত সংস্কৃতি সংরক্ষণের পক্ষে তিনি জোরালো সওয়াল করেছিলেন। তিনি আদিবাসীদের বস্তুগত উত্থানে অধিক আগ্রহশীল ছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার উপরেও তিনি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ভারতীয় আদিবাসীদের নিয়ে তাঁর নৃতাত্ত্বিক গবেষণাকে তিনি 'Philanthropology' বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। ড. এলুইনের এই মানবহিতৈষণা নেহেরুজির আদিবাসী ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল। আদিবাসীদের উন্নয়ন প্রশ্নে ড. এলুইন প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজির 'Consultant for Tribal Affairs' হিসাবে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি নেহেরুজির Adviser for Tribal Affairs হয়েছিলেন। ড. এলুইন 'A Philosophy for NEFA' নামক যে-গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, ১৯৫৭ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহললাল নেহেরু সেই গ্রন্থের ভূমিকায় আদিবাসী-অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নমূলক প্রকল্পের যে পাঁচটি নীতির অবতারণা করেছিলেন, ইতিহাসে তাই পঞ্চশীল নামে পরিচিত। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহ আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল সম্পর্কিত কর্মপন্থা এই নীতিগুলির মধ্যে রূপায়ণ করা হয়েছে। এই

জনজাতিদের স্বাভাবিক চিরাচরিত জীবনযাত্রাকে অব্যাহত রেখে স্বাভাবিক অগ্রগতি আনার ক্ষেত্রে ড. এলুইন অরন্য ও পার্বত্য অঞ্চলে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। সেই উপনিবেশে আদিবাসীরা তাঁদের সাবেকি জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্যের পথেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে। সেখানে যে কোন মিশনারীদের প্রবেশ হবে নিষিদ্ধ। আবগারি আইন, জঙ্গল আইন, ভূমি আইন বলে কিছু থাকবে না। ঝুমচাষ হবে অবাধে। বাইরের কোনো সংস্কৃতি সেখানে প্রবেশাধিকার পাবে না। অন্য গোষ্ঠীর মানুষের সংস্পর্শ থেকে যতটা দূরে থাকা যায় ততই আদিবাসীদের মঙ্গল—এমনই ছিল তাঁর অভিমত। তাঁর এই চিন্তাধারা 'ন্যাশনাল পার্ক থিওরি' নামে পরিচিত। আদিবাসী জীবনের উপর যাতে বাইরের কোনো ছাপ না পড়ে, যাতে নিজস্ব অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনধারার বন্ধনে নিজেদের জীবনকে উপলব্ধি করতে পারেন, বিকশিত করতে পারেন সে-কারণেই ১৯৪৬ সালে তিনি 'স্বাতন্ত্র্যকরণ' নীতিকে প্রকটরূপে বৃহত্তরভাবে ফলপ্রসূ করার জন্য সমর্থন জানিয়েছিলেন। ড. এলুইনের প্রভাবেই স্বাধীনতার প্রারম্ভে নেহেরু সরকার আদিবাসীদের জন্য স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে ড. এলুইন ও নেহেরুজি উভয়েই স্বতন্ত্রকরণ নীতি থেকে সরে এসে সমন্বয়করণ নীতিকেই আদিবাসী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।[৪৮]

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁর আদিবাসী ভাবনাকে সংহত করতে, তাঁর পঞ্চশীল নীতিকে সার্থক করতে ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক ড. এলুইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।আদিবাসী বিষয়ক নেহেরু-এলুইনের যৌথ পরিকল্পনা ইতিহাসে ‘Nehru-Elwin Policy' নামে পরিচিত।[৪৯] ড. আম্বেদকর-প্রণীত ভারতীয় সংবিধান আদিবাসী কল্যাণের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ আইনি দলিল। এঁদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা

আছে খোদ মৌলিক অধিকার অধ্যায়েই। ভারতের জনসংখ্যায় আদিবাসী জনগোষ্ঠী হল সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ। সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে : 'The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker section of the people and in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation." অর্থাৎ, রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো, সমাজের দুর্বলশ্রেণি, বিশেষ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের বিশেষ যত্নসহকারে শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিকভাবে উন্নয়ন করতে হবে। সর্বপ্রকার সামাজিক অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করতে হবে। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭.৮ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৫.৬৩ শতাংশ আদিবাসী। নতুন শতকেও এঁরা সর্ব অর্থেই দুর্বলতম। এঁরা 'orphans of the world'।[৫০] এঁদের সার্বিক উন্নয়নের কথা জওহরলাল নেহেরু গভীরভাবে ভাবতেন। প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর দৃপ্ত ধারণা ছিল "My point is that the government should and must have a special department to deal with the tribal people to protect them and help them to grow." ১৯৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর গণ-পরিষদের প্রথম শেসনের পঞ্চম দিনে তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে আদিবাসীদের কল্যাণে সংবিধানে রক্ষাকবচ সন্নিবেশিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আদিবাসীদের কল্যাণের কথা ভেবে পঞ্চশীল ভাবনায় ১৯৫৮ সালে নেহেরুজি বলেছিলেন, নিজেদের মধ্যে সৃজনশীল মানসিকতার আদিবাসী পঞ্চশীল প্রণয়ন করেন। আদিবাসীদের তিনি ‘our own people' বলে অভিহিত করেছিলেন। জঙ্গল ও জমির উপরে তাঁদের স্বত্বের স্বীকৃতি মানতে হবে। প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নিজেদের মধ্যে থেকেই যোগ্য লোক তৈরী করতে হবে এবং আদিবাসী

এলাকায় প্রশাসনের বোঝা ও প্রকল্পের চাপ যেন বেশি না হয়, পরিসংখ্যান ও অর্থের ব্যয় দিয়ে আদিবাসীদের উন্নয়ন যেন যাচাই করা না হয়।পঞ্চশীল আসলে একটি প্রকল্প। এই প্রকল্প নীতি ও তত্ত্ব হিসাবে নিঃসন্দেহে মানবিক ও সামাজিক। থেবর কমিশন এই প্রকল্পকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কারণ, এই নীতি আপাত দৃষ্টিতে বিজ্ঞানসম্মত। পঞ্চশীল ভাবনার উদ্দেশ্য আদিবাসীদের শোষিত হবার ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান, তাঁদের স্বায়ত্তশাসনের ঐতিহ্য, জমি-জঙ্গলে তাঁদের অধিকার এবং তাঁদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংরক্ষণ। কিন্তু পরিতাপ ও পরিহাসের বিষয় হল যে, এগুলি কখনই বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৫৫ সালে লোকসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেহেরুজি বলেছিলেন, পঞ্চশীল ভারতীয় মননে নতুন কোন ধারণা নয়। এটি ভারতীয় চিন্তন ও সংস্কৃতিতে নিহিত আছে। নেহেরুজির ভাষায়, 'Panchasheel ultimately is the message of tolerence.' কিন্তু নেহেরু নিজে তাঁরই অঙ্কিত আদিবাসী পঞ্চশীল রূপায়ণে সহিষ্ণুতা দেখাতে পারেনি। তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধি ও নাতি রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর পথ অনুসরণ করেননি। কেউ কেউ নেহেরুজির পঞ্চশীল প্রকল্পে “Humanist Socialism' মানবতাবাদী সমাজতন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক উদাসীনতা ও আমলাতান্ত্রিক অসহযোগিতার কারণে উচ্চবর্ণীয় শাসনে আদিবাসী কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি কার্যকরী হয়নি। এছাড়াও জনজাতিদের জন্য ভারতীয় সংবিধানে নানাবিধ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ৪৬ নং ধারায় তফসিলি জাতিসহ আদিবাসীদের সব রকম অন্যায় ও শোষণ থেকে মুক্তি দেবার জন্য সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৬৪ নং ধারায় আদিবাসীদের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রকের (Ministry of Tribal Welfare) উল্লেখ আছে।[৫১] সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী, আদিবাসীদের অন্যান্য নাগরিকদের সমপর্যায়ে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট

সময়ের জন্য কয়েকটি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন ৩৩৪ নং ধারায় এঁদের জন্য লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩৩৫ নং ধারানুযায়ী, সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার দান ও নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সংবিধানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের নানারকম বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। উপরোক্ত সব সুযোগ-সুবিধাগুলি আদিবাসীদের স্বার্থে যথাযথ ভাবে কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা দেখভাল করার জন্য ৩৩৪ নং ধারানুযায়ী তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের স্বার্থে একটি জাতীয় কমিশনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৭৫ নং ধারা মতে, জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে আদিবাসীদের সমবায়কে ৮০,০০০ থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ ও অনুদান দেবার ব্যবস্থা আছে। ২৭৫(১) নং ধারা মতে, আদিবাসী এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা,আদিবাসী এলাকায় দাতব্য চিকিৎসালয়কে সাহায্য দান। এমনকি অন্যান্য সমবায় সমিতির সদস্য হবার জন্য আর্থিক সাহায্য, আদিবাসী মহিলাদের রোজগার করে স্বনির্ভর হবার প্রকল্প, আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবাসিক স্কুল স্থাপন, আদিবাসী সংস্কৃতি, ভাষা, সংগঠন ও অবসর বিনোদন ব্যাপারে সাহায্য প্রদান ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হয়েছে।[৫২] ওঁরাওদের অর্থনীতির ভিত্তিই ছিল কৃষিকাজ । কিন্তু তারা কৃষিকাজের সাথে সাথে কিছু সহায়ক জীবিকাও বেছে নিয়েছিল, যেমন দৈনিক শ্রমিক , বাড়ির চাকর, ব্যবসা ও মৎস্য শিকার ইত্যাদি। প্রথমদিকে তারা জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে শ্রমিকের কাজ করলেও ধীরে ধীরে কৃষিকাজের দিকে ঝুকে পড়ে। ওঁরাওদের মধ্যে ৮০ শতাংশ মানুষের মুখ্য জীবিকা হল কৃষিকাজ কিন্তু যাদের কৃষি জমি থাকত না তারা অন্য জীবিকার মাধ্যমে ও মালিকের জমিতে ভাগচাষী হিসাবে কাজ করে নিজেদের চাহিদা পূরণ করে থাকত। যারা কৃষিকাজকে মুখ্য জীবিকা হিসাবে

বেছে নিত তারা আবার বছরের আট মাস কৃষিকাজের উপর সময় ব্যয় করত আর বাকি চার মাস সেই অঞ্চলে নানান সংস্থার উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে শ্রমিকের কাজ করে থাকত। তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাঁদের জীবনের সকল চাহিদা কৃষিকাজ দ্বারা মেটানো সম্ভব নয়, তাই তারা নগদ টাকা উপার্জনে উৎসাহী হয়ে পড়ে । শ্রমিকের কাজের পাশাপাশি তারা শাকসবজি,মাছ ও ডিম বিক্রি করে নগদ টাকা উপার্জন করে নিজেদের চাহিদা পূরণ করত।[৫৩]

ওঁরাও জনজাতির অর্থনৈতিক ব্যাবস্থাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। ভাগচাষী- মালিক ও শ্রমিকের যৌথ উদ্যোগে শস্য উৎপাদন করাকে ভাগচাষ বলা হয়। এই ব্যাবস্থায় মালিক শস্য বীজ দিত আর ফসল ফলানোর জন্য বাকি সবকিছু ওঁরাও কৃষকরা দিয়ে থাকতো এবং উৎপাদিত শস্যের চার ভাগের তিন ভাগ মালিককে দিতে হত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ১৯৫৫ সালের জমি সংশধন আইন অনুযায়ী উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক অংশ জমির মালিককে দিতে হয়। বলা বাহুল্য বর্তমানে এই ব্যাবস্থা বিভিন্ন ওঁরাও গ্রাম গুলিতে এখনও টিকে আছে। বাটা – এই ব্যবস্থায় চাষ করার জন্য ভাগচাষীর কাছে গবাদি পশু ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকে তাহলে তারা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার নিত এবং উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ সেই প্রতিবেশীকে দিতে হত। এই ব্যবস্থায় ভাগচাষীর তেমন লাভ না হলেও, এখনও কিছু কিছু ওঁরাও গ্রামগুলিতে এই ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। মাহিন্দার- এই ব্যবস্থায় ওঁরাও পুরুষরা মালিকের (ওঁরাও) বাড়িতে শ্রমিকের কাজ করে। বাড়ির সমস্ত কাজ যেমন পালিত পশুর দেখাশোনা, বাড়ি পরিষ্কার, জল ধরা, চাষবাস, বাগান পরিষ্কার ও বাড়ি মেরামত ইত্যাদি কাজ তাঁদেরকেই করতে হত। এর পরিবর্তে তারা আশ্রয় ও

নগদ টাকা পেয়ে থাকতো। এই ব্যবস্থা ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের ওঁরাও গ্রামগুলিতে কমবেশী এখনও লক্ষ্য করা যায়।[৫৪]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ওঁরাওরা নিদারুণ দারিদ্র্যের স্বীকার। তাদের সামান্য আয়ে নিত্য প্রয়োজনীয়তা মেটানো কঠিন হয়ে পড়ে। ফলত তারা গবাদি পশু বিক্রি বা জমি বন্দক রেখে ধার দেনা করতে থাকে। এই আর্থিক দুরবস্থার পিছনে মুল কারণ গুলি হল- স্বল্প পরিমাণে চাষের জমি, গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, কীটনাশক সারের বেঠিক ব্যাবহার ও অত্যাধিক মাত্রায় মদ্যপান ইত্যাদি। এছাড়াও পূর্বপুরুষের থেকে ঋণ মেটানোর দায়ও তাদের নিতে হত। ওঁরাও পরিবারের সম্পদ বলতে যা বোঝায় তা হল- কিছু জমি, বাড়ি, গবাদি পশু ও আসবাপত্র ইত্যাদি। এই সম্পদগুলি ওঁরাওদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে হয়ে থাকতো। অস্থায়ী অর্থনীতি ও বেশি মাত্রায় ঋণ নেওয়ার কারনে এদের মধ্যে বিষয়-সম্পত্তি দ্রত কমতে থাকে। অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় জন্য বিশেষ করে যারা অত্যন্ত দরিদ্র তাঁদের কে জমি বন্ধক রাখতে বা বিক্রি করতে হত। ঐতিহ্যগত ভাবে ওঁরাও দের অর্থনীতি অত্মনিয়ন্ত্রিত,স্বনির্ভর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কালক্রমে আধুনিকতার ছোঁয়াতে তাদের স্বনির্ভর অর্থনীতি আত্মহারা হয়ে পড়ে। ফলত তাদের কে নগত টাকা সঞ্চয়ের উদ্দ্যেশে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে স্থান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়াও তাদের মদ্য পানের প্রতি দুর্বলতাও অর্থনৈতিক দুরবস্থার মূল কারণ। ভারত সরকারের কিছু পরিকল্পনা ও নীতির দ্বারা তাদের অর্থনীতি কিছুটা উন্নত হলেও বাস্তবে শিক্ষার অভাবে এমনকি সরকারি অফিসারদের উদাসীনতার কারনে আনেক পরিকল্পনা ও নীতির থেকে বেশীরভাগ এই জনজাতির গ্রামগুলি বঞ্চিত থেকেই যেত। ফলত তাদের উন্নয়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতি থাকলেও বাস্তবে এখনও তারা

অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রথমদিকে প্রতিটি ওঁরাও গ্রামে একটি গ্রাম পরিষদ ছিল। এটি ছিল ওঁরাও জনজাতির সমাজে ঐতিহ্যবাহী একটা রাজনৈতিক সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তর এটি সাধারণত পাদ্দা পঞ্চ নামেও পরিচিত ছিল। কালের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিপ্রয়ানের মাধ্যমে বসতি নির্মাণ করার দরুন এবং বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে মিলেমিশে বাস করার ফলে ধীরে ধীরে এই ওঁরাও জনজাতির ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠনের সর্বনিম্ন স্তরটি হারিয়ে যাচ্ছে, তবে কিছু কিছু ওঁরাও গ্রামে এই সংগঠনটির এখনো অস্তিত্ব রয়েছে। এইসব গ্রামগুলির জন্যই ওঁরাও জনজাতি আজও সমাজের মানুষের কাছে হারিয়ে গেলেও এখনো বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এই পাদ্দা পঞ্চের প্রধান কাজই ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং এই জনজাতির সামাজিক আচরণবিধি প্রয়োগের ব্যাপারে নজর রাখা। সাধারণত পারিবারিক সম্পত্তির বিভাজন সংক্রান্ত বিরোধ, প্রথাগত আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ, বিশেষ করে বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ের মামলাগুলি এখানে আলোচনা হয়ে থাকতো। যা রায়দান করা হতো সেই রায় এই জনজাতির মানুষের কাছে মানা বাধ্যতামূলক ছিল। শাস্তি হিসেবে সাধারণত দোষী ব্যক্তি কে কিছু জরিমানা দিতে হতো কিন্তু গুরুতর ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘন করলে সেই ব্যক্তিকে শাস্তি স্বরূপ ওঁরাও সমাজ থেকে আলাদা করে দেওয়ার নিয়মও ছিল। এই পাদ্দা পঞ্চ শুধুমাত্র প্রচলিত আইনেই বাস্তবায়নের জন্য কাজ করত তা নয়, বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মগুলো দেখাশোনা করে থাকতো। উদাহরণস্বরূপ যখন কোন গ্রামে কোন সমস্যা দেখা দিলে বা কোন সরকারি আধিকারিক এসে সমস্যা তৈরি করলে এই সমস্যা সমাধানের জন্য পাদ্দা পঞ্চের সভা ডাকা হতো। বর্তমানে বিহার ও ঝাড়খন্ড রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামগুলিতে এই পাদা পঞ্চের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও মানভূম জেলায় বিশেষ

করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই পাদ্দা পঞ্চের অস্তিত্ব হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করার ফলে একেবারেই সংকটের মুখে চলে গেছে। এই ওঁরাও জনজাতির একটি গ্রাম কনফেডারেশনও থাকতো। এই গ্রাম কনফেডারেশন সাধারণত কয়েকটি গ্রাম পরিষদ নিয়ে গঠিত হতো। এই গ্রাম ফেডারেশন পাহান নামেও পরিচিত ছিল। প্রতিটি ফেডারেশনে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল থাকতো যার মধ্যে কৃষি জমি, গ্রামে বনভূমি, চারন ভূমি, আরো অনেক কিছু গঠনের বিষয়ে যোগাযোগ রাখত। বিভিন্ন বিপদ থেকে গ্রামগুলি রক্ষা করা এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়ে এই সংগঠন গুলির অবদান অপরিসীম। সময়ের সাথে সাথে এই জনজাতির মানুষের বিভিন্ন অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে কিছু ওঁরাও গ্রামগুলিতে এই সংগঠন গুলির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামগুলিতে প্রথম দিকে এই গুলির অস্তিত্ব থাকলেও বর্তমানে এই গুলির অস্তিত্ব নেই বল্লেই চলে।[৫৫]

একমাত্র স্বাধীন ভারতেই ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমে এই জনজাতির সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হয়েছিল। চির অবহেলিত আদিবাসীদের ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন তথা মূলস্রোত সমাজের সাথে সমন্বিত করার কাঙ্খিত ইচ্ছাকে বাস্তবিক করতেই বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর সংবিধানে যথাযথ রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন।এভাবে দেখা যায়, এই জনজাতির কল্যাণের স্বার্থে ভারতীয় সংবিধান যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। কিন্তু সংবিধান রচনার পঞ্চাশ বছর পরেও আদিবাসীরা তাঁদের সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধাগুলি উপভোগ করার অধিকার অর্জন করেনি। সংবিধানে তাদের জন্য যে সব অনুকূল ও ইতিবাচক ব্যবস্থাগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, আদিবাসীরা তা আজও জানতেই পারলেন না বা তাঁদেরকে জানানো হল না। অধিকার সম্পর্কে অসচেতন থেকেছেন বলেই তারা কখনো বিদ্রোহী হয়ে উঠতে

পারেনি। ভারতীয় সংবিধান জনজাতিদের প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন হলেও, সংবিধান নিয়ন্ত্রক ও উচ্চবর্ণীয় শাসক গোষ্ঠীর উদাসীনতা ও উন্নাসিকতায় আদিবাসী জীবনে পরিবর্তনের তরঙ্গ আসেনি।পঞ্চশীল যে মডেল তৈরি করা হয়েছিল, ইন্দিরা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীরা সেই কাঠামোর বাইরে গিয়ে আদিবাসীদের জন্য বিকল্প চিন্তা ভাবনা করেননি। ভারতীয় সংবিধান অনুসারেও আদিবাসীদের জন্য আরো অনেক কল্যানকর কাজ করা যেত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরশিমা রাও, অটল বিহারী বাজপায়ী ও মনমোহন সিং-এর সময়কালেও আদিবাসী কল্যানের পূর্ববর্তী কাঠামোর তেমন ভাবে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি। ওঁরাওদের দ্বারা ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত kurukh Literary Society of India তে বিস্তারিত ভাবে তাদের ভাবনা চিন্তার কথা তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়। তবুও বাস্তবে তা রুপায়িত হয়নি,ওঁরাওদের দারিদ্র্যের অবসানও হয়নি, শিক্ষা ক্ষেত্রে আজও তার পিছিয়ে আছে। ফলে তাদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজনৈতিক ভাবে বিরোধী চরমপন্থী দলগুলি ওঁরাও অঞ্চলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নানাভাবে সন্ত্রাসের প্রকাশ ঘটাচ্ছে। এই সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রকৃত সমস্যার অবসান ঘটবে না। শান্তিপূর্ণ ও সমমনস্ক গনতান্ত্রিক অবস্থান এবং রাষ্ট্রের কাজের মাধ্যমে ওঁরাওদের অধিকতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ভবিষ্যতে হয়তো এই বিপুল সমস্যার সমাধান হবে।

সূত্র নির্দেশক :

১. S.R Bakshi, and Balak, Social and Economic Development of Scheduled Tribes, New Delhi. Deep and Deep Publications Pvt. Ltd.2000,pp.39-44.

২. A. Ghosh. History and Culture of the Oraon Tribe: Some Aspects of Their Social Life, Mohit Publication, New Delhi, 2003.pp.71-79.

৩. Ibid.pp,83-86.

৪. Ibid,pp.93-99.

৫. S C Roy. Oraon of Chota Nagpur Their History, Economic Life and Social Organization.Crown Publication.Ranchi,2004,pp.105-111.

৬. N. K. Bose “Tribal Life in India”, National Book Trust, New Delhi.1977.pp.77-83.

৭. OECD Country, (2001), "Organization for economic co-operation and development", Policy brief Our Common Future. Oxford University Press, Oxford. 1987.pp.29-36.

৮. Op.Cit.Roy.pp.113-121.

৯. Ibid,pp.123-129.

১০. P. C. Roychaudhury Gazetteer of India. Bihar Superintendent Secretariat Press,Patna 1965.

১১. B. Chaudhuri. (ed),“Tribal Transformation in India”, Inter India Publications, New Delhi.1990.pp.103-111.

১২. Op.Cit.Bakshi, and Balak,pp.61-68.

১৩. Ibid.pp.71-77.

১৪. Ibid.pp.81-86.

১৫. S. N. Chaudhary. Tribal Development since Independence, Concept Publication Company, New Delhi.2009.pp.61-67.

১৬. Ibid.pp.71-77.

১৭. Jhon K. Thomas, Human Rights of Tribals, Vol. 2, Isha Books, Delhi, 2005, P. 224.

১৮. Ibid,pp.224-227.

১৯. OECD Country, (2001), "Organization for economic co-operation and development, Policy brief Our Common Future. Oxford University Press, Oxford. 1987

২০. S. T. Das. Tribal Development and Socio-Cultural Matrix. Kanishka Publishers Distributors, Delhi.1993,pp.111-117.

২১. Ibid.pp.126-133.

২২. S.L., Doshi, Tribal Ethnicity and Class Integration, Rawat Publications, New Delhi, Jaipur.1990.pp.79-85.

২৩. Op.Cit,Das.pp.137-144.

২৪. Kumar A. Tribal Culture and Economy, Inter India Publications, New Delhi.1986.pp.107-113.

২৫. P. C. Mehata. Ethnographic Atlas of Indian Tribes, Discovery Publishing House,New Delhi, reprinted 2013, P. 17

২৬. D.Thakur. Socio-Economic Development of Tribes in India, Deep and Deep Publishers, New Delhi.1986.pp.119-123.

২৭. Ibid,pp.129-136.

২৮. Op.Cit,Mehata,P.18

৩০. Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, 1960 vols I-II, ed. Verrier Elwin in A New Deal for Tribal India, (Ministry of Home affairs, New Delhi 1963,pp.79-85.

৩১. M. L. Patel. Planning and Strategy for Tribal Development, Inter-IndiaPublications, New Delhi.

৩২. R.N.Pati & B. Jena. Tribal Development in India, Ashish Publishing House, New Delhi.1986.pp.79-84.

৩৩. The Making and Working of the Indian Constitution, NBT, New Delhi, reprint 2010-11, P. 42

৩৪. R.K.Sahoo. Tribal Development in India, Mohit Publications, New Delhi.2005.pp.112-117.

৩৫. R.S.Shukla. Forestry for Tribal Development, Wheeler Publishing, ADivision of A.H. Wheeler and Co. Ltd., New Delhi.2000.pp.129-136.

৩৬. Ibid,pp.141-148.

৩৭. S. G. Deogaonkar. Tribal Administration and Development, Concept Publishing Company, New Delhi.1994,pp.69-76.

৩৮. Ibid,pp.79-84.

৩৯. Datta, K.K, (ed) *Selection from the Judicial Records of Bhagalpur District Office*, 1772-1801, State central Record office, Patna, 1968.pp.77-83.

৪০. P.C. Jain. Planned Development among Tribals, Prem Rawat for Rawat Publications, New Delhi.1999.pp.103-111.

৪১. Ibid.pp.117-124.

৪২. J. N., Khosla. Development Administration: New Dimensions, Indian Journal of Public Administration, Jan-March.1966.pp.77-86.

৪৩. O. Mehta.Tribal Development: The New Strategy, Government of India, New Delhi.1976.pp.89-95.

৪৪. Ibid.pp.101-109.

৪৫. Das, J. K. Report on Scheduled Tribes of Orissa, Part-V-B, Volume-XII, Orissa - Census 1961. Director of Census Operations, Orissa.1971.pp.111-129.

৪৬. P. Mitra & Kakali, Development Programmes and Tribal Some Emerging Issues, Kalpaz Publications, Delhi.2004.pp.91-104.

৪৭. A. C Mittal. & J. B, Sharma. Tribal Education, Administration and Development, Volume-III, Radha Publication, New Delhi.1998.pp.129-137.

৪৮. V.Elwin. A New Deal for Tribal India, Ministry of Home Affairs,1963.pp.63-69.

৪৯. Ibid.pp.77-84.

৫০. V. A. P, Panandiker Development Administration: An Approach, Indian Journal of Public Administration,Jan-March.1964.pp.133-141.

৫১. Selected Works of Jawaharlal Nehru/S Gopal ed. Vol. 8, P. 492.

৫২. Md. A. Mallick, Development programs and tribal scenario: A study of Santhal, Kora and Oraon. Kolkata: Firma KLM Private Limited.2004,pp.27-33.

৫৩. Op.Cit.Roy.pp.141-153.

৫৪. Ibid..pp.194-199.

৫৫. Op.Cit.Mallick,pp.66-73.

তৃতীয় অধ্যায়

ওঁরাও জনজাতির সমাজ – সংস্কৃতি ও পরিবেশ ভাবনা

গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়ে মানভূম জেলায় ওঁরাও জনজাতির সমাজ-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা কেমন ছিল এবং কিভাবে বিবর্তনের ধারায় বইতে শুরু করেছিল, এমনকি ওঁরাওদের উৎসব অনুষ্ঠানে পরিবেশ ভাবনা কিরূপ তা আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। ওঁরাওদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল এবং তারা কি কারণে ঐ স্থানটিকে বসবাসের জন্য নির্বাচন করেছিল, তাও অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। অন্যান্য জনজাতির সাথে মানভূম জেলায় বসবাস করেও তারা কীভাবে নিজেদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচেছিল, তাও গবেষণার অন্যতম বিষয়। সুতরাং একাধারে ওঁরাও জনজাতির নতুন বসতি হিসাবে মানভূম জেলাকে বেছে নেওয়া এবং অন্যদিকে অন্যান্য জনজাতির সাথে বসবাস করেও নিজেদের পরিচিতিকে টিকিয়ে রাখার লড়াই নিয়েই মূলত আমার গবেষণাপত্রের এই অধ্যায়। বর্তমানে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা বৌদ্ধিক স্তরে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পূর্বের ন্যায় শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস বা সামগ্রিক ইতিহাস চর্চার মধ্যে ঐতিহাসিকেরা নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন না। বিশেষ করে বিংশ শতকের শেষের দুই দশক থেকে সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশ্লেষণের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলির পাশাপাশি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করতে না পারলে সর্বস্তরের মানুষের প্রকৃত ইতিহাস আমাদের কাছে অধরাই রয়ে যাবে। সুতরাং ওঁরাও জনজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনুসন্ধান, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় যেমন নতুন একটা সংযোজন হবে, তেমনই এর থেকে বাংলা তথা ভারতের আদিম

জনজাতির ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও একটা আলাদা মাত্রা সংযোজন হবে বলে মনে করি।

ওঁরাও জনজাতির ইতিহাস সেই সুদূর প্রাচীন ভারতের মধ্যে নিহিত রয়েছে। আদিম জনজাতিগুলির মধ্যে, ওঁরাওদের স্থান অন্যতম। তাম্র-প্রস্তর যুগের সিন্ধু সভ্যতার সময়েও এদের অস্তিত্বের কথা জানা যায়।[১] প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, মৌর্য এবং মৌর্যোত্তর, গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর সময়ে বারংবার এই জনজাতির কথা উল্লিখিত হয়েছে। কথিত আছে সুলতানি ও মুঘল আমলে, ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও, এই জনজাতির মানুষদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের নানাবিধ পরিকল্পনার হয়েছিল। তবে আমার এই অধ্যায়ে প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের ওঁরাও জনজাতির কথা সেইভাবে উল্লিখিত হবে না। তবে ওঁরাও জনজাতির মানুষরা প্রাথমিক পর্বে দক্ষিণ ভারতে বসবাস করত। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে এবং কৃষ্ণা নদীর উত্তরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ উর্বর কৃষি জমিগুলিতে এরা বসবাস করত। পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রতিকুলতা, বহিঃশত্রুর আক্রমন, খাদ্যাভাব প্রভৃতি কারণে এদের একটা অংশ উত্তর ভারতে চলে এসেছিল। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে, বিশেষ ভাবে মুঘল আমলে রাজকর্মচারির অত্যাচার এবং রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়াবাড়ির ফলস্বরূপ, এরা ছোটোনাগপুর অঞ্চলের জঙ্গলাকীর্ণ অনুর্বর জমিগুলিতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেছিল।[২] কারণ এই অঞ্চলের জমিগুলি অনুর্বর হওয়ায়, মুঘল বাদশাহরা স্থানটিকে নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন না। ওঁরাও জনজাতির মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে এই স্থানটিকে বসবাসের যোগ্য করে তুলেছিল। সুপ্রাচীন কাল থেকে ওঁরাও জনজাতির মানুষদের একটা পৃথক জীবনধারা ও সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। সর্বভারতীয় স্তরে সম্রাট বা রাজার পরিবর্তন ঘটলেও, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সেইভাবে কোন পরিবর্তন

ঘটে নি । এমনকি, বৈদেশিক আক্রমণ ঘটলেও তারা সযত্নে নিজেদের সুরক্ষিত ও বিচ্ছিন্ন করে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তবে বাংলা তথা ভারতে ক্রমপর্যায়ে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, সমস্ত জমি ও জনসাধারণের উপর শোষণ ও শাসন চালিয়ে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ওঁরাও তথা অন্যান্য আদিবাসী জনজাতির সমাজেও বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। প্রথমত, এই জনজাতির মানুষরা পৃথক ভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার অধিকার হারিয়েছিল, কারণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ঐসব অঞ্চলে সাধারণ উচ্চ বর্ণের মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে তাদের স্বশাসনের অধিকার ক্রমশ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তৃতীয়ত, খ্রিষ্টান মিশনারিগুলির ধর্ম প্রচারের ফলে ওঁরাওদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ধর্ম বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। চতুর্থত, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রচেষ্টায় সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও এবং অন্যান্য জনজাতির মানুষ রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল। যদিও এইক্ষেত্রে সার্বিক ভাবে ওঁরাওদের প্রভূত কোন উন্নতি হয় নি।[৩]

সমস্ত আদিবাসী জনজাতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করার অবকাশ আমার নেই। এই অধ্যায়ে আমি শুধু ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস ও পরিবেশ সচেতনা নিয়ে অনুসন্ধান করার প্রয়াস করব। আবার এই গবেষণা শুধু ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। বাংলায় ওঁরাও জনজাতির ঔপনিবেশিক আমলে প্রধান বসতি ছিল মানভূম যেটা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত। যদিও স্বাধীনতা পর্বে এই জেলা বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা পশ্চিম বঙ্গের সাথে যুক্ত হয়েছিল। তবে মনে রাখতে হবে যে, একদা মানভূম জেলা নামে পরিচিত স্থানটি আজ পুরুলিয়া জেলা নামে খ্যাত। পুরুলিয়া জেলার প্রাচীন ইতিহাস সঠিক ভাবে জানা যায় না। তবে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে তার একটা আনুমানিক বৃত্যান্ত জানা যায় মাত্র। মধ্য যুগেও এই স্থানটির ইতিহাস সেইভাবে কোথাও উল্লিখিত হয়নি। আসলে এই স্থানটি সেইসময় ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। ফলে এই অঞ্চলে কৃষির প্রসার সেইভাবে ঘটেনি। এই অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের সুযোগও ছিল না। তাই হয়তো সুলতানি শাসক ও মুঘল বাদশাহরা এই স্থানটির দিকে সেইভাবে গুরুত্ব দেননি। তবে বাংলায় কোম্পানীর শাসনকালে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে, নতুন ভূস্বামী ও জমিদার শ্রেণী রাজস্ব আদায়ের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানটিতে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে আবাদি কৃষি জমির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ফলে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে বহিরাগত হিন্দু মধ্যবিত্ত জমিদার শ্রেণী এই অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেছিল। পাশাপাশি বেশ কিছু খ্রিষ্টান মিশনারী খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের নিরক্ষর আদিবাসী সমাজের মধ্যে ধর্ম প্রচার শুরু করেছিল। প্রচলিত হিন্দু সমাজে উপেক্ষিত এইসব আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে খ্রিষ্টান মিশনারী সহজেই আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। তবে পরিবর্তিত নতুন আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশে ঐসব আদিবাসী সমাজের মানুষ কখনই নিজেদের খাপখাইয়ে নিতে পারেনি। ফলে তাদের মধ্যে সর্বদা একটা বিদ্রোহের চাপা উত্তেজনা অব্যাহত থাকে।[৪] ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐখানকার স্থানীয় জনজাতিদের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ, পুরুলিয়ার গুরুত্ব সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিল। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে ছোটো-বড়ো নানা বিদ্রোহে তারা

সামিল হয়েছিল। হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণী ঐসব আদিবাসী বিদ্রোহে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে সামিল হয়েছিল। ব্রিটিশ বিরোধী সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও প্রভৃতি বিদ্রোহে এই পুরুলিয়ার আদিবাসীরা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।[৫] ঐখানকার আদিবাসীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল সাঁওতালদের। তারপরেই যথাক্রমে ওঁরাও ও মুণ্ডাদের স্থান। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এইসব আদিবাসী বিদ্রোহের গুরুত্বকে কখনই অস্বীকার করা যায় না। শুধু তাই নয়; ঔপনিবেশিক আমলে এবং ঔপনিবেশিকোত্তর পর্যায়ে ভাষার ভিত্তিতে পৃথক পুরুলিয়া জেলা গঠনের দাবীতে স্থানীয়রা বারংবার সোচ্চার হয়েছিল। পুরুলিয়া জেলার সাধারণ বাঙালি ও আদিবাসী মানুষদের উপর বলপূর্বক হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ফলে আদিবাসী সাঁওতাল ও ওঁরাওদের পাশাপাশি, এক বিরাট সংখ্যক বাঙালি মানুষ পৃথক পুরুলিয়া জেলা গঠনের জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। আদিবাসীদের ভাষা আন্দোলনের পথ খুব সহজ ছিল না। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে ভাষার ভিত্তিতে দেশের অন্যান্য প্রান্তের ন্যায়, ঝাড়খণ্ডেও ভাষার ভিত্তিতে পৃথক আদিবাসী রাজ্য গঠনের দাবী তোলা হয়েছিল। সক্রিয় আন্দোলনের ফলে অবশেষে ১৯৫৬ সালে পুরুলিয়া জেলা গড়ে উঠেছিল। তবে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবীতে তৎকালীন বিহারের ছোটোনাগপুর অঞ্চলে বারংবার সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়েছিল। ১৯৯০-এর দশকে এই আন্দোলন আইনি পর্যায়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। বিভিন্ন মামলা-মকদ্দমা এবং শুনানির পর ১৯৯৯ সালে ভারতের সংসদে আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পৃথক রাজ্য গঠনের বিষয়ে একটি বিল পাস হয়েছিল। তারই ফল স্বরূপ ঐ বছরেই বিহারের একটা অংশ নিয়ে ঝাড়খণ্ড নামে নুতন একটি আদিবাসী রাজ্য আত্মপ্রকাশ করেছিল। যদিও আদিবাসীদের জন্য পৃথক

একটি রাজ্য গঠনের ফলে আদিবাসীদের কতখানি সুবিধা হয়েছে, তা আজও বিতর্কিত এবং অমিমাংসিত বিষয়। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের একটি আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা হিসাবে পুরুলিয়া জেলার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।[৬] কৃষি নির্ভর বাংলা তথা ভারত হওয়ায়, এই স্থানটি প্রাক্ ঔপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক উভয় সময়েই তেমন গুরুত্ব পায়নি। এই অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের তেমন কোনো সুযোগ ছিল না। পুরুলিয়া জেলা গঠন এবং তার পশ্চিমবঙ্গে সংযুক্তিকরণ খুব সহজে হয়নি। আইনজীবী রজনীকান্ত সরকার, শরৎ চন্দ্র সেন প্রমুখের নেতৃত্বে অগণিত সাঁওতাল, ওঁরাও ও অন্যান্য মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের জেরে তৎকালীন স্বাধীন ভারত সরকার ভাষার ভিত্তিতে পুরুলিয়া জেলা গঠনে বাধ্য হয়েছিল। ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের জন্য গঠিত কমিশনের সুপারিশে শেষ পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভা সম্মতি দিয়েছিল এবং ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাতে রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করেছিলেন। এইবাবেই পশ্চিম বঙ্গের বুকে নতুন জেলা হিসাবে পুরুলিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। পুরুলিয়া জেলার এক বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে এই জনজাতিদের বাস। তার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ওঁরাও ও সাঁওতাল জনজাতির সংখ্যাধিক্য সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসীদের জন্য পৃথক জেলা, পশ্চিমবঙ্গের বুকে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে, ভারতের ইতিহাসে একটি অন্যতম নজির হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।[৭]

ভাষা, ধর্ম, আচার-বিধি, উৎসব-অনুষ্ঠান, শিক্ষা প্রভৃতির মধ্যেই একটি জাতি বা গোষ্ঠীর পরিচয় গড়ে ওঠে। ওঁরাও জনজাতির জীবনের ক্ষেত্রেও কথিত বিষয়গুলি সু-প্রযোজ্য। এই জনজাতি গোষ্ঠীর প্রাচীন বৃত্তি বা পেশা ছিল পশুচারণ। কিন্তু পরবর্তী সময়ের সাথে সাযুজ্য রেখে কৃষিকাজকে প্রধান পেশা হিসাবে বেছে নেয়। ফলত তাদের মধ্যে কৃষিকাজ নির্ভর এক সামাজিক কাঠামো গড়ে ওঠে। ১৯৭৬ সালের সিডিউল্ড কাস্ট

অ্যান্ড সিডিউল্ড ট্রাইব অর্ডার (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট অনুযায়ী ৩৮টি জনগোষ্ঠীকে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী তালিকাভুক্ত করা হয়।[৮] ভাষাগোষ্ঠীর দিক দিয়ে বিচার করলে এদেরকে দুভাগে ভাগ করা যায়। মুন্ডারী ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হল মুন্ডা, সাঁওতাল, হো প্রভৃতি আর দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে আসে ওঁরাও, মালপাহাড়িয়া ইত্যাদি। সুতরাং ওঁরাওরা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, এদের ভাষা হল কুরুখ তবে প্রথমদিকে এই ভাষার কোন লিপি না থাকলেও পরবর্তী সময়ে 'তোলং সিকি'কে এই ভাষার লিপি হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়।[৯] ভাষার পাশাপাশি বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের দিক দিয়ে এদের অন্যান্য জনজাতিদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। 'করম' হল এই জনজাতির প্রধান উৎসব। কথিত আছে করম তথা চাক্‌লতা গাছের ডাল বেদিতে স্থাপন করে পূজা করা হয় তাই এই উৎসবকে 'করম' উৎসব বলা হয়। এই উৎসবের উদ্ভব বা প্রচলন সম্পর্কে এই জনজাতির লোকবিশ্বাসে নানান মত প্রচলিত আছে তার মধ্যে একটি হল – 'ধর্মা ও কর্মা দুই ভাই, কর্মা ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেশান্তরী হয়। বহু অর্থ উপার্জন করে দেশে ফিরে দেখে যে ধর্মা করম গাছের পূজোয় ব্যস্ত। প্রতিষ্ঠিত দাদাকে আপ্যায়ন না করায় কর্মা রাগে করম গাছের ডাল ছুঁড়ে সাত পাহাড়ের ওপারে ফেলে দেয়। তারপর থেকে তার দুর্গতি শুরু হয়। সমস্ত অর্থ-ধনসম্পদ ফুরিয়ে শেষ হয়ে যায়। শেষে গাছ দেবতারই পূজা ও আরাধনার মাধ্যমে তার ভাগ্য ফেরে'।[১০] ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে এই উৎসব উদযাপিত হয়। এই উৎসব শুরুর ১৫ বা ২০ দিন আগে থেকেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের আখড়ায় মাদলের তালে তালে চলে ওঁরাও মেয়েদের নাচ গানের মহড়া। এর পাশাপাশি ওঁরাও সমাজের অন্যান্য উৎসব হচ্ছে টাট্‌ক্ষা পরব, যাতরা, পুনা-মান্না প্রভৃতি। এই সমস্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে তাদের নিজস্ব আদলে বিভিন্ন নাচগানের সৃষ্টি হয়; যা অন্যান্য জনজাতির থেকে তাদেরকে

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করে।[১১] ভারতবর্ষের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ দখল করে আছে আদিবাসীরা। এই বৃহৎ সংখ্যক আদিবাসীদের জনসংখ্যার নিরিখে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর পরেই ওঁরাওদের স্থান। ভারতীয় ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজ দর্পণে সাঁওতাল জনজাতির যে ভাবে চর্চা বা আলোচনা পাওয়া যায়, সেই দিক দিয়ে ওঁরাও জনজাতি সম্পর্কিত চর্চা বা আলোচনার অপ্রতুলতা রয়ে গিয়েছে। ফলত অনেকেই ওঁরাও জনজাতিদের সাঁওতালদের সঙ্গে একাত্ম করে বা সাঁওতাল হিসেবেই বিচার করেছেন। কিন্তু ওঁরাও জনজাতি সাঁওতাল জনজাতি থেকে অনেকক্ষেত্রেই ভিন্ন। ওঁরাওরা মূলত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে অভিপ্রয়ানের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বসতি গড়ে তোলে। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ড, আসাম ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এদের জনসংখ্যার আধিক্য সবথেকে বেশি। ভারতবর্ষের এই সব জায়গায় বসতি বেশী হলেও এদের কিছু সংখ্যক পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় (আসানসোল, রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, হরিপুর, শীতলপুর, মালদহ, পুরুলিয়া প্রভৃতি) স্থায়ীভাবে বসবাস গড়ে তুলেছে। [১২]

ওঁরাওদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো হলেও নারীদের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হয়। কৃষিভিত্তিক জীবিকায় পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমান ভাবে সমস্তকাজে অংশ গ্রহণ করে। কৃষিকাজের ওপর ভিত্তি করে তাদের বিভিন্ন লৌকিক উৎসব, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস গড়ে ওঠে। নদী, পাহাড়-পর্বত, সূর্য, ভূমি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে তারা দেবদেবী হিসেবে আরাধনা করে থাকে। ভূমিকে দেবীরূপে স্মরণ করে চণ্ডীপুজা করে থাকে আবার শস্য ঝাড়াই এর দেবীরূপে 'সমাপনী বসুমাতার' আরাধনা করে। সমাজের অশুভ শক্তি হিসেবে অশরীরী আত্মা ও ডাইনি প্রথার উপর যথেষ্ট বিশ্বাস রয়েছে।[১৩] পরিবারের মধ্যে কোন অঘটন ঘটলে সবসময় এই জনজাতির মানুষেরা

মনে করে যে বাড়িতে কোনো অশুভ আত্মার প্রবেশ ঘটেছে। এই আত্মাকে তুষ্ট করার জন্য বা অশুভ শক্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাড়িতে ওঝা ডেকে নতুন গামছা, আতপ চাল, মুরগির ডিম প্রভৃতি অর্ঘ্য নিবেদনের মধ্য দিয়ে পূজার্চনা করে থাকে। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পূর্বে এই জনজাতির মানুষেরা জঙ্গল থেকে তাদের বেঁচে থাকার জন্য সম্পদ আহরণ করত। তবে কৃষিকাজের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তারা স্থায়ী কৃষকে পরিণত হয়। অন্যদিকে উপনিবেশ ও উপনিবেশ উত্তর ভারত সরকার জঙ্গলের উপর নানান নিয়ম-নীতি চালু করায় জঙ্গলের সঙ্গে অন্যান্য জনজাতির ন্যায় ওঁরাওদেরও আত্মিক সম্পর্ক বিনিষ্ট হয়ে পড়ে। জঙ্গল ও জঙ্গলের বন্য প্রাণীদের কেন্দ্র করে পূর্বে যে সব উৎসব সম্পন্ন হত তা ধীরে ধীরে এই জনজাতির মানুষরা ভুলতে বসেছে। অন্যান্য জনজাতির মতো ওঁরাও জনজাতির অন্যতম উৎসব ছিল শিকার উৎসব।[১৪] কিন্তু বর্তমানে বন্য প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতি আজ এতটাই বিপন্ন যে তাদের সংরক্ষণের আওতায় এনে রক্ষা করতে হচ্ছে। বহু প্রজাতি ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে আইনি নিষেধাজ্ঞায় শিকার করা বা শিকার উৎসব এই জনজাতির মানুষের কাছে একটি প্রতীকী উৎসবে পরিণত হয়েছে। ওঁরাও জনজাতি মানুষের অন্যতম দিক হল গোত্রের ব্যবহার বা প্রচলন। টোটেম গোষ্ঠী ভুক্ত ওঁরাও জনজাতিরা কৃষির ওপর নির্ভরশীল হওয়ার দরুণ খাদ্য সংস্থানের জন্য ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করত। অনাবৃষ্টি বা অন্য কোনো কারণে উৎপাদনে ঘাটতির ফলে খরাভাব দেখা দিলে সেই এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র বসতি স্থাপন করত। সব সময় যে সকলে মিলে দলবদ্ধ ভাবে স্থানান্তরিত হত তা নয়, কেউ কেউ আগের জায়গাতেই থেকে যেত। ফলে পরস্পরের বিচ্ছেদের কারণে তাদের পার্থক্য অনুধাবন বা পারস্পরিক রক্তের সম্পর্ক চিহ্নিত করণের জন্য নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের আরাধ্য জীবজন্তু, গাছপালা,

পশু-পাখি ও প্রাকৃতিক বস্তুর বা পদার্থের নামানুসারে ও ওঁরাওরা গোত্রের ব্যবহার করে।[১৫] পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ওঁরাও জনজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ধুমকুঁড়িয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওঁরাওদের নিকট এই ধুমকুঁড়িয়া একটি পবিত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হত।[১৬] বড় হলঘরের আকারে বানানো হলেও এর দরজা ছোট ও উচ্চতা কম রাখা হত। কারণ এখানে প্রবেশকালে অবনত মস্তকে প্রণাম ও নমস্কার জ্ঞাপন, এর মূল উদ্দেশ্য। ঘরের চার দেওয়াল মাটি দিয়ে তৈরি করে ছাপরা বা খড়ের আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা হত। মাটির সাথে গোবর মিশিয়ে ঘরের মেঝে ও দেওয়াল নিকানোর পর খড়িমাটি দিয়ে সুন্দর ভাবে প্রলেপ দিয়ে সেখানে জীবজন্তু ও অন্যান্য চিত্র অঙ্কন করা হত। ঘরের সামনের বারান্দায় মাদল ও নাগরা ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা হত। গ্রামের বাইরে বা গ্রাম থেকে দূরবর্তী কোনো স্থানে এই ধুমকুঁড়িয়া তৈরি করা হত না। প্রত্যেক ওঁরাও গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে এই ধুমকুঁড়িয়া তৈরি করা বাধ্যতামূলক রীতি ছিল। এই ধুমকুঁড়িয়া দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল, একটির নাম যুবাঘর আর অপরটির নাম যুবতীঘর। যুবকদের যেমন যুবতীদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি ছিল না তেমনি অনুরূপ ভাবে যুবতীরা যুবকদের ঘরে প্রবেশ করতে পারত না। কঠোর ভাবে এই নিয়মনীতি পালন করা হত। যদি ভুলবশত কোন যুবতী যুবক ঘরে প্রবেশ করত তাহলে ওই যুবতীকে কঠোর শাস্তি স্বরূপ কান কেটে দেওয়ার রীতি ছিল। অনুরূপ ভাবে একই ঘটনা কোন যুবক করলে গ্রামে গ্রামসভা বসিয়ে কঠোর শাস্তি দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে বিহার, ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি রাজ্যে লক্ষ্য করা গেলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় এর অস্তিত্ব ধীরে ধীরে মুছে যাছে।[১৭] ধুমকুঁড়িয়াতে প্রবেশাধিকারিদের সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হত, নবীন বালক, কিশোর এবং যুবক। গ্রামের প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীদের ধুমকুঁড়িয়াতে থাকা বাধ্যতামূলক ছিল,

কোন কারণে কোন মেয়ে এখানে না থাকলে সেই মেয়েকে বিবাহ দেওয়া সম্ভব হত না। ধুমকুঁড়িয়া এই ওঁরাও জনজাতির শুধু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রই ছিল না এটা ওঁরাও জনজাতির নিকট পবিত্র মন্দির হিসাবে বিবেচিত হত। নবীন বালকদের হাতে কলমে শেখানোর দায়িত্ব সাধারণত বয়স্ক মানুষদের দেওয়া হত। ধুমকুঁড়িয়াতে যুবক ও যুবতীদের হাতে কলমে বিভিন্ন কাজ শেখানো হত। বিশেষ করে মেয়েদের গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ মনোযোগ সহকারে শেখানো হত। এমনকি মেয়েদের সামাজিক আচার আচরণ, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার বিধি প্রভৃতি শেখানো বাধ্যতামূলক ছিল। ওঁরাও জনজাতির সমাজে বিভিন্ন পূজা পার্বণের সব রকম আয়োজন এই ধুমকুঁড়িয়ার যুবকদেরই করতে হত। এছাড়াও প্রশিক্ষণের মান যাচাই করার জন্য লাঙ্গল চালানো, মাটি কাটা, ধান রোপণ, ছেদন ও ঝাড়ার কাজ করার জন্য ধুমকুঁড়িয়ার সদস্যদের ডাকা হত। তাঁরা নিরপেক্ষ ভাবে একসাথে দলবদ্ধ হয়ে গ্রামের সকল পরিবারের কৃষিকাজে সহায়তা করত। এই ভাবেই পরস্পরের সহযোগিতার ফলে ওঁরাও জনজাতির সমাজে সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত কায়েম থাকতো। সুতরাং এই ওঁরাও জনজাতির ধুমকুঁড়িয়া শুধু পবিত্র ঘরই নয় এটা আদর্শ সমাজ গঠনের অন্যতম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবেও বিবেচিত হত। বর্তমানে অপশাসন, অবক্ষয়, অনাচার, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে আদর্শ মানুষ তৈরির ক্ষেত্রে ধুমকুঁড়িয়ার অবদান আজও একান্ত অপরিহার্য।[১৮]

ছোটোনাগপুর অঞ্চল থেকে অভিবাসী হয়েও, ওঁরাওদের দুর্দশার অবসান হয়নি। বেশিরভাগ স্থানেই তারা ভূমিহীন কৃষিজীবী হিসাবে বসবাস করত। কিন্তু ছোটোনাগপুরের পূর্ব স্মৃতি কোনোদিনই মুছে যায়নি। তারা ছোটোনাগপুর অঞ্চলকে তাদের আদি বসতি হিসাবে গণ্য করত। তাঁদের গাথা ও কাহিনীতে বারংবার উল্লিখিত

হয়েছে যে, প্রাচীনকালে আর্যরা এই স্থানটি অধিকার করতে গিয়ে তিনবার ওঁরাওদের কাছে পরাস্ত হয়েছিল। যুদ্ধ জয়ের আনন্দানুষ্ঠানে আর্যরা যেমন সোমরস পান করত; তেমনই ওঁরাওরা যুদ্ধ জয়ের স্বীকৃতি স্বরূপ হাঁড়িয়া পান করত। মুণ্ডা জনজাতির মানুষ অনেক পরে ছোটোনাগপুর অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিল। বস্তুত মুণ্ডারা ওঁরাওদের কাছ থেকেই কৃষিকাজ শিখেছিল।[১৯] সাঁওতাল ও মুণ্ডারা প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হওয়ার জন্যেই হয়ত তাদের কথা বারংবার ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছে। কিন্তু ওঁরাও জনজাতির মানুষ সেই তুলনায় ছিল অনেক শান্ত প্রকৃতির। প্রবল অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও, তারা সহজে বিদ্রোহে সামিল হতে চাইত না। তাই ছোটোনাগপুর অঞ্চল থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তারা বিভিন্ন স্থানে ভূমিহীন কৃষিজীবী শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে প্রবল কষ্ট সহ্য করেও, কোনো প্রতিবাদ করেনি। আসলে তারা শান্তিতে নিজেদের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল। গবেষণায় আমি ওঁরাও জনজাতির সাথে মুণ্ডা জনজাতির বেশ কিছু তুলনামূলক আলোচনা কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এমনকি এই গবেষণায় দেখানো হয়েছে যে, ওঁরাও ও মুণ্ডা উভয় সম্প্রদায় ছিল মূলত কোল জনজাতির শাখা বিশেষ। তবে মুণ্ডাদের তুলনায় ওঁরাওরা সামাজিক দিক থেকে ছিল বেশি পিছিয়ে পড়া। ব্রিটিশ শাসনকালে ছোটোনাগপুর অঞ্চলে এই দুটি সম্প্রদায় পাশাপাশি সহাবস্থান করত।[২০] সেই সময় এই ওঁরাওদের সাহায্য নিয়েই ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সেইখানকারর বিদ্রোহি মুণ্ডাদের পর্যুদস্ত করেছিল। তবে ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষেরা ছিল মূলত অহিংস পন্থী। তারা সশস্ত্র আন্দোলন বা বিদ্রোহের পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু ১৮৩১-৩২ সালে যে ব্যাপক মুণ্ডা বিদ্রোহের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, তাতে ওঁরাওরা সক্রিয় ভাবে অংশ নিয়েছিল। বুদ্ধ ভগৎ, মঙ্গল ভগৎ ও অন্যান্য নেতাদের পরিচালনায় তারা কোম্পানীর অপশাসনের

বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। মঙ্গল ভগতের নেতৃত্বে প্রায় ১০০ জন ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে একটি গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল। এর পরেও ওঁরাওরা দীর্ঘদিন ধরে তানা ভগৎ নামে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল।[২১] স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এই আন্দোলন ক্রমে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

ওঁরাও সংস্কৃতি কখনই হিন্দু সংস্কৃতির সাথে মিশে যায়নি। স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই এই জনজাতির মানুষ কর্মসংস্থানের আশায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।[২২] এরা মূলত পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলি করত। এরা কৃষিকার্যের পাশাপাশি; মাছ ধরা ও বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের সাথে যুক্ত থাকত। পরবর্তীকালে তারা কৃষিকেই তাদের প্রধান জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। হিন্দুদের মতই এদের সমাজে বিভিন্ন গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের গোত্রগুলি বিভিন্ন পশু, পাখি, মাছ, গাছ, খনিজ পদার্থ, প্রাকৃতিক বস্তু প্রভৃতির নাম অনুসারে হত। গ্রামীন জীবনে অভ্যস্ত এই ওঁরাওদের রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। গ্রামীন রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে পারহা বলা হত। যার প্রধান ছিলেন পাহান নামে একজন মনোনিত প্রতিনিধি। পাহানকে সাহায্য করার জন্য পুচার, চৌকিদার, ভাণ্ডারি প্রমুখ কর্মচারি থাকত। এদের আবার পৃথক পুরোহিত ছিল। গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মেলা ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজকর্ম পরিচালিত হত। যেকোনো সমস্যার সমাধানের জন্য আখড়া নামক অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মিলিত হয়ে আলাপ-আলোচনা করত। আবার এই সম্মেলনে ধলকি, নাগারা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানবাজনা হয়ে থাকত। প্রতিটি গ্রামে ধর্মীয় উপাসনার জন্য আখড়া নামক স্থান প্রস্তুত করা হত। পশু শিকার ও কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে তারা বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এদের নিজস্ব একটা পৃথক সংস্কৃতি আছে। কিন্তু তাদের সেই সংস্কৃতি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।[২৩] আমি

আমার গবেষণার এই অধ্যায়ে কিভাবে এই জনজাতির সংস্কৃতি ধীরেধীরে হারাতে বসেছে তাও দেখানোর চেষ্টা করেছি। এমনকি এই জনজাতির শিক্ষিত সমাজই পারত তাঁদের এই সংস্কৃতি ধরে রাখতে তাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। মানভূম জেলার বিভিন্ন স্থানে ওঁরাও জনজাতির মানুষ বসতি গড়ে তুলেছিল। ধীরেধীরে তারা এই অঞ্চলে গ্রাম গড়ে তুলতে শুরু করেছিল। ছোটোনাগপুর অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এইসকল গ্রামগুলিতেও লক্ষ্য করা যেত। প্রতিটি গ্রামে ওঁরাওদের একটি করে রাজনৈতিক সমিতি ছিল। ঐ রাজনৈতিক সমিতিকে বলা হত 'পড্ডু পঞ্চ'। ওঁরাওদের মধ্য থেকে পাঁচ জনকে বেছে নিয়ে ঐ 'পড্ডু পঞ্চ' গঠিত হত। আধুনিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মতই এই সমিতি দায়িত্ব পালন করে থাকত। গ্রামের সমস্ত মানুষের কল্যাণ সাধন করা তথা শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মূল দায়িত্ব এই সমিতির উপরেই বর্তায়। জনসাধারণের কাছে এই সমিতির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। গ্রামের মধ্যে যেকোনো ধরনের জমি সংক্রান্ত বিবাদ এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান করত এই 'পড্ডু পঞ্চ'। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও এই সমিতির অনুমতি নেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। এই সংগঠন প্রয়োজনে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি বিধানও করে থাকত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আর্থিক জরিমানা করা হত। তবে গুরুতর অপরাধে ওঁরাও সম্প্রদায় থেকে বহিষ্কার করা হত।[২৪] এর পাশাপাশি কতগুলি গ্রাম যৌথভাবে অপর একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল, যাকে বলা হত 'পাঢ়া পঞ্চায়েত' বা সংক্ষেপে পাঢ়া। এই পাঢ়া গ্রাম সমষ্টির বাস্তু জমি, কৃষি জমি, জলা জমি, চারণ ভূমি, জঙ্গল প্রভৃতি চিহ্নিত করত। বিভিন্ন গ্রামের পারস্পরিক সমস্যা নিরসনে এই পাঢ়া-র ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন গ্রামের পড্ডু পঞ্চের সদস্যদের মধ্য থেকে ৭, ৯, ১১, ১৩ এমনকি ৩০ জন সদস্যকে নিয়ে এই পাঢ়া গড়ে উঠত। আবার ঐ পাঢ়া-র অভ্যন্তরে ক্ষমতার বিভাজন

করা হত, কাজের সুবিধার জন্য। রাজা, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য সদস্যদের ক্ষমতার বণ্টন করা হত। প্রতি বছর অন্তত একবার পাঢ়া-র সদস্যরা সবাই মিলিত হত। বছরের বিভিন্ন সময় পশু শিকার করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা সহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন এই সংগঠন করে থাকত।[২৫]

ওঁরাও জনজাতির মানুষ একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করত। তারা মূলত ভার্ম নামক ঈশ্বরের পূজা করত। এই দেবতা ছিলেন সূর্যের একটা রূপ। অর্থাৎ তারা বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভার্ম নামক সূর্যের উপাসনার জন্য নানা রীতিনীতি মেনে চলত।[২৬] পাহান নামক একটি স্থানকে উপাসনাস্থল বানিয়ে, সেখানে ভুষাকালি, খড়ি-মাটি ও চুন দিয়ে নানারকম আল্পনা আঁকত। সূর্যের রামধনু রঙের সাতটি রঙের মধ্যে প্রধান তিনটি রং; লাল, সাদা ও কালো ছিল তাদের উপাসনায় ব্যবহৃত প্রধান তিনটি রং। পাহান নামক স্থানকে ঘিরে ওঁরাও জনজাতির মানুষ একত্রিত হত এবং নিজেদের উৎসব পালন করত। খাওয়া দাওয়া, নাচগান প্রভৃতিতে তারা মেতে উঠত। এইভাবে একটি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে ঘিরে তাদের মধ্যে একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠত।[২৭] ওঁরাওদের সেইভাবে কোনো মন্দির বা উপাসনালয় ছিল না। সুপ্রাচীনকাল থেকে তারা খোলা স্থানে নিজেদের ধর্মীয় আচরণ পালন করত। ছোটোনাগপুর অঞ্চলে বসবাসের সময়; ভগৎ নামে একজন হিন্দু ধর্মপ্রচারক ওঁরাও এবং অন্যান্য আদিবাসী মানুষদের মধ্যে সংস্কারের প্রচেষ্টা করেছিল। তারপর থেকে ওঁরাও জনজাতির মধ্যে হিন্দু ধর্মের বেশকিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুপ্রবেশ করেছিল। এই জন্যই অনেকে ওঁরাওদের ধর্মমতকে সারনা ধর্ম হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। অর্থাৎ মনে করা হয় যে, হিন্দু ধর্মের মতই বহু দেবদেবীর পূজার রীতি পরবর্তী ক্ষেত্রে ওঁরাওদের মধ্যেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তবে তানা-ভগৎ আন্দোলনের ফলে ওঁরাওদের মধ্যে শিক্ষার

বিস্তার যে হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে ধর্মীয় রীতিনীতিতে হিন্দু ধর্মের আচার-আচরণ যুক্ত হলেও, মুসলমান ও খ্রিষ্টান ধর্মের প্রভাব সেইভাবে লক্ষ্য করা যায় না। অনেক ওঁরাও পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন অবশ্য। আবার হিন্দু ধর্মে যেমন গুরুদেব মনোনয়নের প্রথা লক্ষ্য করা যায়, তেমনই ওঁরাওদের মধ্যেও গুরু বেছে নেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে এই ক্ষেত্রে 'পড্ডু পঞ্চ'-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজনৈতিক সংগঠন, 'পড্ডু পঞ্চ' ওঁরাওদের মধ্যে সব থেকে বয়ঃজেষ্ঠ্য ব্যক্তিকেই তাদের গুরু হিসাবে মনোনীত করত।[২৮] ওঁরাওদের মধ্যে বিভিন্ন প্রতীক পূজার রীতির প্রচলন ছিল। তাদের বিভিন্ন গোষ্ঠী আলাদা আলাদা প্রতীকের পূজা করত। প্রায় ৬৮ ধরনের প্রতীকের সন্ধান পাওয়া গেছে। অর্থাৎ ওঁরাও জনজাতির মধ্যে ৬৮টি গোষ্ঠী ছিল।[২৯] প্রত্যেক গোষ্ঠী নিজেদের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হত। এই প্রতীকগুলি বিভিন্ন পশুপাখি, গাছপালা, প্রাণীর নাম অনুযায়ী নির্ধারণ করা হত। তবে বেশিরভাগই ছিল পশুপাখির প্রতীক। এর সাথে কোথাও কোথাও তাদের পশু শিকারের ঐতিহ্যও জড়িয়ে ছিল। তবে পরবর্তীকালে ওঁরাওদের মধ্যে মুসলমান, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমপর্যায়ে বিস্তৃত হয়েছিল। এমনকি একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গিয়েছে।[৩০] ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষ মূলত ছিল কৃষিজীবী। তাদের কাছে জমি ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ তারা ছিল মূলত কৃষিজীবী। কৃষি কাজ করেই তারা তাদের জীবনধারণ করত। তারা মনে করত যে, তাদের দেবতা ভার্মের অনুগ্রহেই জমিতে ফসল ফলে। ফলে চাষাবাদের ক্ষেত্রে ভার্মের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তারা মনে করত। তবে চাষাবাদ ছাড়াও অনেক ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষ; বেতের ঝুড়ি বানানো, চামড়ার জিনিসপত্র তৈরী করা, মাটির পাত্র বানানো, বাঁশের কাজ প্রভৃতি করত। মাছ ধরা ও পশু পালনের সাথেও অনেকে যুক্ত

ছিল। এছাড়া রিকশা চালানো, চুল কাটা, মোটরগাড়ি চালানো প্রভৃতির মাধ্যমেও অনেকে জীবিকা নির্বাহ করত। অর্থাৎ পরিস্থিতির বদলের সাথেসাথে তাদের জীবন ও জীবিকার নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছিল।[৩১] নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একসাথে কৃষিকাজ করত। তারা অন্যান্য জনজাতির মতই ছিল কঠোর পরিশ্রমী। তাদের নিজস্ব একটি ভাষাও রয়েছে। এই ভাষাকে বলা হয় কুরুখ ভাষা। এই জনজাতির বেশিরভাগ মানুষ এই ভাষাতেই কথা বলে। তাই এরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে 'কুড়খার' বলে পরিচয় জ্ঞাপন করে থাকে।[৩২] কুরুখ শব্দের বহুবচনে কুড়খার শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওঁরাওরা দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের সদস্য। অপরাপর আদিম জনগোষ্ঠীদের মতোই ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতার বিকাশ সাধনে এদের বিশেষ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। এরা মূলতঃ মধ্য ও দক্ষিণ ভারত থেকে এসে রোহতাসগড়, সিংভূম, রাঁচী, লোহারডাগা প্রভৃতি অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পরবর্তীকালে ভৌগলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিক প্রভাবে তাদের জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত নেমে আসে। এরা এতটাই অজ্ঞ ছিল যে স্থানান্তরের কারণে নিজেদের জাতিগত পরিচয়ও সঠিক ভাবে দিতে পারত না। ফলে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আরোপিত ধাঙ্গড়, কোড়া, মুদী, সর্দার প্রভৃতি আজ তাদের গোত্রনাম বা জাতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ওঁরাওরা বেশীরভাগই নিজেদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দেয় কারণ তাদের ধর্মের নাম যে 'সারনা' সেটা তারা জানেই না।[৩৩] আবার কেউ কেউ বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, অহমিয়া, সাদরী প্রভৃতি ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে সেগুলোই তাদের মাতৃভাষা হিসাবে দাবী করে। ইউরোপীয় খ্রিষ্টান মিশনারীরা তাদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চার্চ-মিশন ইত্যাদি স্থাপন করে ভারতীয় আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা শুরু করেন।

কিন্তু যথাযথ পরিচয় না থাকায় ওঁরাও ভাষা ও সাহিত্যের সঠিকভাবে বিকাশ ঘটেনি। কারণ অন্যান্য আদিবাসীদের ভাষা নিয়ে গবেষণা করলেও খ্রিষ্টান মিশনারীরা ওঁরাও ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় খুব একটা আগ্রহ দেখাননি। যদিও রোমান এবং দেবনাগরী হরফে খ্রিষ্টের জীবনী ও ধর্ম সংক্রান্ত দু-একটি 'কুরুখ' ভাষার পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তা কিন্তু একটি ভাষার সমৃদ্ধি ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়।[৩৪] করম উৎসবের সময় দীর্ঘদিন ধরে কুরুখ ভাষায় গান, কবিতা, ছড়া এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আদিবাসী নৃত্য এই অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। তবে সেই ঔপনিবেশিক আমল থেকে এই জনজাতির মধ্যে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে মুষ্টিমেয় কয়েজকন পুরুষ শিক্ষার আঙিনায় এলেও, নারীরা সেই অজ্ঞতার অন্ধকারেই নিমজ্জিত রয়েছে। বর্তমান সময়ে এই জনজাতির মানুষরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতেও দেখা যাচ্ছে। তবে এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের খুব কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার রীতি বর্তমানেও অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত রয়েছে। এই ওঁরাওদের বিবাহের রীতিনীতি অন্যান্য জনজাতির থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে পৃথক। তবে নিজস্ব জনজাতির মধ্যেই নারী-পুরুষের বিবাহ প্রচলিত রয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো রীতি নেই। তবে বিধবা বিবাহের রীতি প্রচলিত রয়েছে।[৩৫]

ওঁরাওদের বিবাহের সময় স্ববর্ণ বিবাহ রীতি প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ তারা অন্য কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর সাথে বিবাহ করত না। নারী-পুরুষ নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে বিবাহ করতে পারত। তবে সেইক্ষেত্রে পিতা-মাতা বা পরিবারের বয়স্কদের সম্মতির প্রয়োজন হত। বিবাহকে মনে করা হত যে, তাদের দেবতাকে খুশি করার জন্য তারা বৈবাহিক বন্ধনে পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হত। ওঁরাওদের বিবাহে পণ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপহার দেওয়ার প্রথা চালু

ছিল। কোনো ধর্মগুরু বিবাহে নিমন্ত্রিত হত না। সূর্য দেবতা ভার্মকে সাক্ষী রেখে বিবাহ অনুষ্ঠান পিতা-মাতার উপস্থিতিতে সম্পন্ন হত। উত্তরাধিকার সূত্রে হিন্দুদের মতই পুরুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হত, অর্থাৎ বাবার অবর্তমানে তার পুত্র সন্তান জমি স্বত্ত্বাধিকার পেত। খুব কম সংখ্যক ক্ষেত্রে পুত্র সন্তান না থাকলে, কন্যা সন্তানকে জমি হস্তান্তরিত করা হত।[৩৬] প্রাথমিক পর্বে ওঁরাওরা শরীরের খুব কম অংশ পোশাক দিয়ে ঢেকে রাখত। পুরুষরা একখণ্ড কাপড় দিয়ে নিম্নাংশ ঢেকে রাখত। অন্যদিকে মেয়েরা নিম্নাংশে একখণ্ড এবং ঊর্ধ্বাংশে অপর একটি কাপড় দিয়ে নিজেদের আব্রু রক্ষা করত। যদিও, পরবর্তীকালে তারা ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবে হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতই সাধারণ জামা, প্যান্ট, শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ প্রভৃতি ব্যবহার করতে শুরু করেছিল।[৩৭] বিভিন্ন ধরনের মাছ ও মাংস তাদের খাদ্যতালিকায় থাকত। তাছাড়া ঘি, মাখন, চাল, চানা, দুধ, দই প্রভৃতি খাবার তারা খেয়ে থাকত। দিনে ৩ বার, সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যাবেলায় তারা খাবার খেত। তবে দরিদ্র ওঁরাওরা দিনে মাত্র ২ বার খাবার খেয়েই বেঁচে থাকত। ওঁরাওদের কাছে হাঁড়িয়া ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি পানীয়। বিভিন্ন খাদ্যশস্য ও গাছগাছড়ার রস দিয়ে এই হাঁড়িয়া বানানো হত। তাদের আনন্দ উদ্‌যাপন এবং দুঃখ ভুলে থাকার একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল এই হাঁড়িয়া। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, এই হাঁড়িয়া সেবন করে থাকত।[৩৮]

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে ওঁরাওদের কিছু অংশ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করেছিল এবং ধীরেধীরে তারা সরকারি চাকরীর সুবিধাও গ্রহণ করেছিল। তবে সংখ্যা গরিষ্ঠ ওঁরাও জনজাতির মানুষ গ্রামে বাস করে এবং দীনমজুরের কাজ করে। খুব কম সংখ্যক মানুষের নিজস্ব জমি রয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজন চাকুরীজীবী ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষ শহরে বসবাস করে। কিছু সংখ্যক ওঁরাও খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ

করলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের হিন্দু ধর্মাবলম্বী মনে করা হয়। বছরের বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় এরা গ্রামে সম্মিলিত ভাবে ধর্মীয় প্রতীকের পূজা করে থাকে।[৩৯] আদিম যুগে মানুষেরা বনে জঙ্গলে বসবাস করত। পারস্পরিক প্রয়োজন ও আত্মরক্ষার তাগিদে যখন দরমার বেড়ায় মাটি লাগিয়ে পাঁচিল তৈরী করে ঘাস খড় তালপাতার ছাউনি দিয়ে ছোট ছোট কুটির (কুম্বা এড়পা) বানাতে শিখল তখনই গড়ে উঠল সমাজ। স্থায়ী বসতি স্থাপনের সাথে সাথে অন্ন সংস্থানের উদ্দেশ্যে কৃষি কাজের সূচনা করে। ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ওঁরাওদের কাছে ধুমকুঁড়িয়া একটি পবিত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হত। ঘরটি বড় হল ঘরের আকারে বানানো হলেও এর দরজা ছোট বা উচ্চতায় কম রাখা হত, কারণ এখানে প্রবেশকালে অবনত মস্তকে (মাথা হেঁট করে) পুণ্যগৃহকে প্রণাম বা নমস্কার জ্ঞাপনই এর মূল উদ্দেশ্য। ঘরের চার দেওয়াল মাটি দিয়ে তৈরী করে ছাপরা বা খড়ের আচ্ছাদন দিয়ে ঢাকা হত। মাটি-গোবর দিয়ে ঘরের মেঝে ও দেওয়াল নিকানোর পর খড়িমাটি দিয়ে সুন্দর করে প্রলেপ দিয়ে সেখানে জীবজন্তু ও অন্যান্য চিত্র আঁকা হত। ঘরের সামনের বারান্দায় মাদল-নাগড়া ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা হত। গ্রামের বাইরে বা গ্রাম থেকে দূরবর্তী কোন স্থানে এই যুবাঘর তৈরী হত না। প্রত্যেক ওঁরাও গ্রামের মধ্যবর্তী প্রশস্ত স্থানে 'আখড়া' (বড় আঙিনা) রাখা বাধ্যতামূলক ছিল, যেখানে মাটির বেদী স্থাপন করে দেবদেবীর আরাধনা ছাড়াও সভা-সমিতি, নাচ-গান ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হত। ঐ আখড়া সংলগ্ন দুই প্রান্তে দুটি ধুমকুড়িয়া থাকত, একটির নাম জোঁকহা এড়পা (যুবাঘর) এবং অপরটির নাম পেল্ল এড়পা (যুবতীঘর)। কিশোর/যুবকরা যেমন যুবতীঘরে প্রবেশের অনুমতি পেত না তেমনি কিশোরী/ যুবতীদেরও যুবাঘরে প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। ভুলক্রমে, কৌতূহলবশত বা অন্য কোন কারণে কোন মেয়ে বা যুবতী যুবাঘরে প্রবেশ করলে তার কান কেটে রক্ত বের করে

দেওয়া হত এবং ঐ কাটাচিহ্ন নিয়ে তাকে আজীবন পদস্খলনের স্মৃতি বয়ে বেড়াতে হত। অনুরূপ ভাবে কোন যুবক কোন কারণে যুবতীঘরে প্রবেশ করলে গ্রামে বিচার সভা বসিয়ে তাকে দণ্ডিত করা হত।[৪০] ধুমকুড়িয়াতে প্রবেশাধিকারীদের সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হত যথা- পুনা জোঁখার (নবীন বালক), মাঝতুরিয়া জোখার (কিশোর) ও কোহা জোঁখার (যুবক)। এদের বয়ঃক্রম আট বছর থেকে বাইশ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে আঠারো বছর পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। গ্রামের প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীদের ধুমকুড়িয়াতে থাকা বাধ্যতামূলক ছিল অন্যথায় এদের বিবাহ দেওয়া সম্ভব হত না।[৪১] যুবাঘরের সদস্যদের শিক্ষা বা কর্ম তালিকা-

১) নদী থেকে ছোট মাছ ধরে এনে, বেছে বা পরিস্কার করে বট পাতায় পুড়িরে আগুনের আঁচে পাক বা রন্ধনপূর্বক প্রতিবেশীদের মধ্যে বিতরণ করা।

২) যুবাঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ঝাড়ু দেওয়া ও অন্যান্য সাফাইকার্য সম্পন্ন করা

৩) রাত্রে বিশ্রাম বা শয়নের জন্য শয্যা রচনা করা।

৪) শয়নের উদ্দেশ্যে গ্রামের বৃদ্ধরা রাত্রে যুবাঘরে এলে তাদের সেবা ও পরিচর্যা করা ছিল কিশোরদের একান্ত কর্তব্য।

৫) বৃদ্ধরা ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গল্প শোনাত এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুশাসন ও পূজাপাঠ প্রভৃতি শেখাত ।

৬) সহবত তথা আদব কায়দা, আচার-রীতি, বড়দের সম্মান প্রদান প্রভৃতিও শেখানো হত।

৭) পরিবারের আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাঁশের ঝুড়ি, টোকা, নারকেল ঝাড়ু, চাটাই, তালপাতার ছাতা, বেড়া বাঁধা ইত্যাদি শেখানো হত।

৮) গাছ-গাছড়া, জড়িবুটি, শিকড় বাকড়ের উপাদান ব্যবহার করে কবিরাজী চিকিৎসা পদ্ধতিও শেখানো হত।

৯) বৃক্ষরোপন ও কৃষিকাজ তথা চারা তৈরী, রোপণ, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ ইত্যাদি হাতে কলমে শেখানো হত।

১০) হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপাখির পরিচর্যা ও পালন পদ্ধতি শেখানো

১১) যেহেতু সেযুগে লিপির প্রচলন ছিল না তাই সামাজিক পার্বণের আচারবিধি ও পূজা অর্চনার মন্ত্রপাঠ মুখে মুখেই শেখানো হত।

১২) জঙ্গলের পশুপাখি শিকার ছাড়াও মৎস্য শিকারে এরা ভীষণ পারদর্শী ছিল। এখানে শিকারপর্বের তালিমও দেওয়া হত।

১৩) ঐক্যবদ্ধভাবে কাজকরার বা একতার সুফল সম্পর্কে শুধু আলোচনাই হত না, যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তা দেখিয়ে দেওয়া হত।

১৪) নাচ, গান, বাজনা ইত্যাদির চর্চ্চা কেন্দ্র হিসাবে ধুমকুঁড়িয়ার বিশেষ অবদান ছিল।

১৫) জীবিকা নির্বাহের জন্য সারাদিন শারীরিক পরিশ্রম করত তবুও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি শরীর চর্চ্চার জন্য রাত্রে ফাঁকা মাঠে প্রতিযোগিতা মূলক খেলা ধুলার আয়োজন করত। এবং তীর ধনুক লাঠি চালনার মাধ্যমে অস্ত্র শিক্ষায়ও পারদর্শিতা লাভ করত।[৪২] অনুরূপভাবে যুবতীঘরে মেয়েদের খেজুর বা তাল পাতার তালাই, খেজুর পাতার বিড়া, সূতাকাটা, সেলাই, কাপড়ের উপর নকশা বা রং করা, কুচির ঝাঁটা তৈরী প্রভৃতি ছাড়াও গৃহস্থালি কাজকর্ম, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আচার বিধি শেখানো হত। পূজাপার্বন ও ধর্মীয়

অনুষ্ঠানে কিছু স্ত্রী-আচার পালিত হত যা মেয়েদের একান্ত নিজস্ব সেখানে পুরুষদের হস্তক্ষেপ চলত না। ইদানিং কালেও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মেয়েদের নিজস্ব স্ত্রী-আচার চালু আছে। যুবতীঘরে বৃদ্ধারা গল্পচ্ছলে মেয়েদের কিছু দরকারী গোপন কথা আলোচনা করত তাই ছোট মেয়েদের ধুমকুড়িয়াতে প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ।[৪৩] ওঁরাও সমাজের পূজাপার্বনের সমস্ত রকম আয়োজন ধুমকুড়িয়ার যুবকদেরই করতে হত এছাড়াও প্রশিক্ষণের মান যাচাই করার জন্য লাঙ্গল চালানো, মাটি কোপানো, ধান রোপণ, ছেদন ও ঝাড়াই মাড়াইয়ের কাজ করার জন্য ধুমকুঁড়িয়ার সদস্যদের আহ্বান করা হত। তারা নিরপেক্ষভাবে একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে গ্রামের সকল পরিবারের কৃষিকাজে সহায়তা করত। এভাবেই পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ফলে ওঁরাও সমাজে সুদৃঢ় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিল। এ প্রসঙ্গে ড. অজিত কুমার সিংহ এবং ড. অবধেশ প্রসাদ সিন্হা তাদের ভারতের আদিবাসী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, যুবাগৃহে লোক-কথা, প্রথা, সামাজিক আইন, কৃষিকাজ, শিকার এবং সমস্ত জীবন সম্বন্ধীয় শিক্ষা দেওয়া হয়।[৪৪] শ্রী জীতু ওঁরাও মহাশয় তাঁর ‘সিন্ধু-ঘাটি কুড়ুখ সভ্যতা ও জনজাতির ভূমিকা’ পুস্তকে ড. সত্যনারায়ণ দুবের ‘ইউনিফায়েড হিস্ট্রি’-র উদ্ধৃতি করে হরপ্পায় আবিষ্কৃত বিশাল বিশাল হলঘর ওঁরাওদের ধুমকুঁড়িয়ার-ই নিদর্শন বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অধ্যাপিকা চৈঠী ওঁরাও এবং অধ্যাপক মহাবীর ওঁরাও তাঁদের ‘কুড়ুখ কাথাইন ও কাথাটুড়' প্রবন্ধে ধুমকুঁড়িয়াকে কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক বিকাশ কেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন।[৪৫] ড. শান্তি খালকো তাঁর গবেষণা পত্র ওঁরাও সংস্কৃতি, পরিবর্তন ও দিশা’-তে বলেছেন ওঁরাও সমাজকে এক সূত্রে

বাঁধার জন্য এবং সামাজিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে বর্তমান যুগেও ধুমকুঁড়িয়ার পুনঃনির্মাণ ও পুনঃস্থাপন একান্ত আবশ্যক।[৪৬] সুতরাং ওঁরাওদের ধুমকুঁড়িয়া শুধু পবিত্র আবাস-ই নয় এটা আদর্শ সমাজ গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবেই বিবেচিত ছিল। বর্তমান কালের অপশাসন, অবক্ষয়, অনাচার, বৈরিতা, বিচ্ছন্নতাবাদী ও দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজে আদর্শ মানব তৈরীর ক্ষেত্রে ধুমকুঁড়িয়ার ভূমিকা এযুগেও একান্ত অপরিহার্য তা বলাই বাহুল্য।

ওঁরাওরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজস্ব তাগিদে সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যেমে আপন আপন বংশধারা অটুট রাখতে গোত্রনামের প্রচলন শুরু করে। এখনও পর্যন্ত যে পঁচাত্তরটি গোত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে এক্কা, মিজ, তিরকী, লাকড়া, কিণ্ডো, বাণ্ডো, কেরকেটা, কুজুর, খাঁকা, খালকো, টপো, টিপ্পা,বালা, বেক, লিণ্ডা অন্যতম।[৪৭] সূর্যদেবকে সর্বশক্তিমান ধার্মেশ বা ঈশ্বর হিসাবে আরাধনা করলেও প্রাচীন আরণ্যক ভিত্তিক ওঁরাও সমাজের লোকেরা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শুভ-অশুভ রূপ বা শক্তিকে দেবতা জ্ঞানে পূজো করে থাকে। ভূমি অর্থাৎ 'ক্ষেখেল' কে এরা ধরিত্রী মাতা বা 'চালা-আয়ো' বলে স্মরণ করে কৃষির প্রারম্ভ ও সমাপ্তিতে ভূমি পূজো করে থাকে। ওঁরাওদের বিশ্বাস এই যে, সূর্যদেবের ঔরসে ভূমি-মা (চালা-আয়ো) গর্ভবতী হয়ে ধরাধামে জীবজগৎ, সবুজ বনানী, লতা-পাতা ও শস্য উৎপাদন করে থাকেন।[৪৮] তাই ধার্মেস অর্থাৎ সূর্যদেবের পাশাপাশি ভূমি-মায়ের পুজো করা এদের একান্ত আবশ্যক। বন্যা, ঝড় (বায়ু), দাবদাহ, খরা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির নিকট নৈবেদ্য সামগ্রী উৎসর্গ করা ওঁরাওদের এক পুরাতন প্রথা। কারণ এদের বিশ্বাস যে, তাতে প্রকৃতি তুষ্ট হ'ন এবং পরিবেশ শান্ত থাকে। এর মধ্যে সুউচ্চ বিশালাকার পর্বতের অধিপতি গিরিশও এদের কাছে শিলাখণ্ড রূপে পূজিত হয়ে থাকেন। ওঁরাওদের প্রত্যেকের বাড়িতে পুজোর থানে শিলাখণ্ড রাখা

বাধ্যতা মূলক। পুথিগত বিদ্যা ছাড়াই প্রাচীন কালে প্রকৃতিকে সন্তুষ্ট রাখার মাধ্যমে অধিক শস্য উৎপাদন, সন্তান সন্ততির মঙ্গল কামনা ও অশুভ শক্তির বিনাশে যেভাবে নৈবেদ্য উৎসর্গ করত আজও ওঁরাও সমাজে নিয়মিত ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে আসছে। পূজোর উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হত দূর্বাঘাস, তুলসী, আম্রপল্লব, কলাপাতা, ফল-মূল, আতপ চাল, চিঁড়া, মধু, ধুনো (শাল গাছের শুকনো আঠা), রান্না করা ভোগ(সুরি মাণ্ডি) ইত্যাদি। এছাড়াও ছাগল, মোরগ, শূকর, মেষ, মহিষ প্রভৃতি দেবতার নিকট বলিদান দেওয়া এদের প্রাচীন রেওয়াজ যা আজও বিদ্যমান। নৈবেদ্য সাজাতে পূজোর পাত্র তথা রেকাব হিসাবে এরা বট, শাল, মহুয়া বা কেন্দুয়া পাতা ব্যবহার করে থাকে।[৪৯] প্রকৃতির রূপ, কৃপা বা ক্রোধ যা কিছু প্রতক্ষ্য করা যায়, উপলব্ধি করা যায় এবং বাস্তবে সেই শক্তি এদের কাছে দেবতা, যার কোন মূর্ত প্রতীক নেই। তাই এরা কোন কাল্পনিক মূর্তির পূজো করে না। তেত্রিশ কোটি না হলেও ওঁরাও জনজাতির প্রাচীন আরাধ্য সূর্য (ধার্মেশ), বৃষ্টি, বায়ু, বজ্র, শিলা, অমা, বসুমাতা (চালা আয়ো) প্রভৃতি দেব-দেবীরা বৈদিক যুগে মুনি-ঋষিদের কাছে যথাক্রমে নারায়ণ, বরুণ, পবন, ইন্দ্র, শিব, কালী ও লক্ষ্মী রূপে পূজিত হয়েছেন বা বর্তমান কালেও পূজিত হচ্ছেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ঋগবেদের মন্ত্র-প্রার্থনা, যজুর্বেদের আহুতি-উৎসর্গ, সামবেদের বন্দনা-প্রশস্তি ও অথর্ববেদের অপার্থিব-আধিভৌতিক বিষয়গুলো প্রাচীন ভারতের বন্যজাতি তথা আদিবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ পদ্ধতিতে নিবেদন, আহুতি, প্রার্থনা ও উৎসর্গ করেছে তা আজও এদের সমাজে একই ভাবে প্রচলিত।

ওঁরাওদের 'নাদ ক্ষজোরণা' সর্বশ্রেষ্ঠ (কহা) পূজো হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কায়িক পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহের জন্য ভোরবেলা থেকেই বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত খনন, রোপণ, সেচন, পরিচর্যা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। ফলে নিয়মিত

বা প্রত্যহ আরাধ্য দেব-দেবীর উপাসনা সম্ভব হয় না। বারো মাসে তের পার্বণ পালন করার মত সময় ও সামর্থ্য কোনটাই এদের নেই। তাই এক যুগ তথা দ্বাদশ বৎসর পর পর এই 'কহা-পূজা' বা নাদ ক্ষজোরণা করে থাকে।[৫০] চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে এই পূজো হয়ে থাকে সেকারণে অনেকেই একে বাসন্তী পূজো বলে থাকে, আবার কেউ কেউ সূর্য পূজা বলেও আখ্যা দেয়। এই ধারণা সঠিক নয় কারণ ওঁরাও (কুরুখ) ভাষায় দেব-দেবীর অর্থ 'নাদ' এবং সংগঠিত করার অর্থ 'ক্ষজোরণা' অর্থাৎ নাদ ক্ষজোরণা মানে সমস্ত আরাধ্য দেব-দেবীকে সংগঠিত বা একত্রিত করে পূজো করা।[৫১] পুজোর আয়োজন ও দিনক্ষণ ঠিক করে কেবলমাত্র কোন এক নির্দিষ্ট গোত্রের বংশধররা সমবেত হয়ে এই অনুষ্ঠান করে থাকে। যদি 'মিঞ্জ' গোত্রের পুজো হয় তা হলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী মিঞ্জ বংশের সমস্ত লোকেরা বংশের প্রধানের গ্রামে / বাড়িতে নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হয়। প্রধানের বাড়িকে 'খুট' বা 'গাদি' বলা হয়। প্রধানের বাড়ি সংলগ্ন প্রশস্ত স্থানে তালপাতার বেড়া ও ছাউনি দিয়ে বিশাল হলঘর তৈরী করা হয় (ইদানিং কালে ত্রিপল, কাপড়, ফ্যান-লাইট সহকারে প্যাণ্ডেল বানানো হয়ে থাকে)। এই হলঘরের প্রবেশ দ্বার খুবই ছোট আকারের হয় এবং দরজায় কবাট ও অর্গল রাখা বাধ্যতামূলক। অনুষ্ঠানের আয়োজন ও সমস্ত দেব-দেবীর আলাদা-আলাদা পূজা সামগ্রী বাবদ প্রচুর খরচ হয়ে থাকে। প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে সমপরিমাণ চাঁদা প্রদান করে এই বিশাল ব্যয়ভার বহন করে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই এখানে প্রবেশাধিকার পায়। তবে জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের সময় যদি কারও 'ডাণ্ডা-কাট্টানা' বা শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান না হয়ে থাকে তাহলে তারা প্রবেশের অধিকার পায় না।[৫২] হলঘরের ভিতর পর্যাপ্ত জলের এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা রাখা হয়। খুব ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে সকলে স্নান সেরে নববস্ত্র পরিধান

করে পূজো মণ্ডপে প্রবেশ করে। প্রয়োজনমত অতিরিক্ত নতুন জামা কাপড় সঙ্গে নিয়ে যায়। কারণ একবার প্রবেশ করলে পূজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মণ্ডপের বাইরে আসতে পারে না। যারা ভিতরে প্রবেশ করে তারা বাইরের কোন লোকের মুখদর্শন করে না, এমনকি বাইরের লোকের সাথে কথা বলাও নিষেধ। প্রাচীনকালে, যদি কখনও প্রয়োজন হত, কোন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বাইরের লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাতের ইশারায় বা ইঙ্গিতে চাহিদা মতো জিনিষ চেয়ে নিত। বর্তমান কালে কাগজের চিরকুটে লিখে টিন বাজিয়ে বাইরে বার্তা পাঠিয়ে দরকারী কাজ সেরে নেয়। মেষ, মহিষ, ছাগল, কুক্কুট, বরাহ ও অন্যান্য পূজো সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করে। সকাল থেকে শুরু হয়ে সারাদিন ও সারারাত পূজো-অর্চনা চলতে থাকে। যতক্ষণ না সমস্ত দেব-দেবীর পূজো শেষ হয়। এক একটা দেবতার জন্য এক একরকম পূজোর আয়োজন ও উপকরণ ব্যবহার হয়ে থাকে। পূজোর পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। উৎসর্গ করার পর মণ্ডপের ভিতরেই ভোগ (সুরি-মাণ্ডি) রান্না হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ ভিতরের সকলেই প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করলেও মণ্ডেপের বাইরের কোন লোক সেই প্রসাদ পায় না বা তাদের পাওয়ার অধিকার নেই। ধার্মেশ (নারায়ণ), ইন্দ্র, বরুণ, পবন, লক্ষ্মী, কালী, মহাদেব ছাড়াও অপদেবতাদের পূজো দিয়ে তাদের নৈবেদ্য ও বলিদান সামগ্রী গ্রাম থেকে দূরে নিজস্ব জমির ঈশান কোনে গভীর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হয়। উপাসনার মাধ্যমে সন্তুষ্টি বিধান করে ভূত-পিশাচ তথা অপদেবতাদের পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা বা অপসারণ করার এক পদ্ধতি বলা যায়। এই অনুষ্ঠান হওয়ার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে ঐ গোত্রের কোন সদস্য বা সদস্যার বিবাহ দেওয়া যায় না। নিত্যদিন বা প্রতিমাসে দেবতার আরাধনা সম্ভব না হওয়ার ফলে এক যুগ পর পর সর্বদেবতার সম্ভব যে পূজার আয়োজন তাহাই ওরাওঁদের ‘নাদ ক্ষজোরণা’। বংশ

পরম্পরায় মুখে মুখে শুনে এবং মনে রেখে গুরু তথা পুরোহিতরা সহজ সরল ভাষায় মন্ত্রপাঠ করে পুজো অর্চনা করে থাকে।[৫৩]

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে প্রাচীন ভারতের নিবিড় অরণ্যের ঘন পাতায় আচ্ছাদিত নিরাপদ স্থানে বা অন্দরে বসে প্রকৃতির ক্রোধ থেকে নিস্তার পেতে বা তার কৃপালাভের জন্য আদিম জনজাতি ওরাওঁরা আর্তকণ্ঠে বসুমাতার কাছে যে আবেদন করেছিল তা হ'ল :- বিনতী : "হে চালা আয়ো, নিনিম মান্নে-মাস, বিরি-চান্দো, উল্লা-মাহা, ক্ষেখেল-ক্ষাল্লে, জিয়া-জান্তু হুরমীনু রাঃদি - নিংগান এম গড় লাগদাম"। এই প্রার্থনার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় : "হে ধরিত্রীমাতা আপনি গাছ-পালা, চন্দ্র-সূর্য, দিবা-নিশি, খেত-খামার, জীব-জন্তু সকলের মধ্যে সামর্থ্যরূপে বিরাজমান আপনাকে জানাই প্রণাম"। অনুমান করা যায়, পরবর্তীকালে বৈদিক মন্ত্রে ছন্দময় কাব্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেই বাণীই চরাচরে মুখরিত হয়েছে স্তুতি : "যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমঃ নমঃ"।[৫৪]

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পূজা-পার্বনের ক্ষেত্রে প্রচলিত জনশ্রুতি 'বার মাসে তের পার্বন' এ বিষয়ে ওরাওঁরাও কম যান না। 'ডাণ্ডা কাট্টানা' থেকে শুরু করে গ্রামী, খালিপুজা, ফাগু, খাদি, টাকা পারার, করম, সহরায়, যাত্রা, পুনা-মান্না প্রভৃতি পার্বণ বেশ সমারোহ সহকারে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।[৫৫] ওরাওঁদের আরাধ্য দেবতা মূলত চারটি – প্রকৃতির অন্তর্নিহিত শক্তি (Power of Nature)-ই সর্বশক্তিমান ছন্দ্র (হামেস), সূর্যদেব (বিইড়ি বেলাস), ভূমি মাতা (চালা আয়ো) এবং পূর্বপুরুষ (পাচ বালার)। যে কোন পূজা পার্বণে সর্বাগ্রে এঁদের তুষ্টি বিধান একান্ত আবশ্যক। প্রথমেই এঁরা বিনতি (প্রার্থনা) করেন, তারপর নিবেদন বা উৎসর্গ করেন, নাচে-গানে বন্দনা করেন। এই পদ্ধতিগুলো প্রাচীন ভারতের বন্যজাতি তথা আদিবাসীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী

পালন করে আসছেন। যার সাথে বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিদের আরাধনার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ঋগবেদের মন্ত্র-প্রার্থনা, যজুর্বেদের আহুতি-উৎসর্গ, সামবেদের বন্দনা-প্রশস্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদিম জনজাতিরা না বৈদিক মুনি-ঋষিরা কারা আগে এই পদ্ধতিতে আরাধ্য দেবদেবীর পূজা অর্চনা করেছেন সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে ওঁরাওদের বিশ্বাস, সংস্কার, সংস্কৃতি প্রভৃতি একইভাবে আবহমানকাল ধরে প্রাচীন রীতি মেনেই অনুসৃত হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য।[৫৬] নিম্নে ওঁরাওদের মধ্যে প্রচলিত কিছু পূজা-অনুষ্ঠানের বিষয়ে আলোচনা করা হল -

খালিপূজো : মাঠ থেকে ধান তোলার পর কাঠের পাটাতনে যখন ধান ঝাড়াই করা হয় তখন ধানের আটি থেকে খড়ের কিছু উদ্বৃত্ত অংশ পড়ে থাকে। যাকে গ্রাম্য ভাষায় কুটো বা কুরি বা পোয়াল বলা হয়। এই কুটোর মধ্যে বেশ কিছু ধানের শীষ মিশে থাকে। সেই ধান সংগ্রহ করার জন্য খামারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি মোটা বাঁশ মজবুত করে পোঁতা হয় এবং তার চারদিকে গোলাকার ভাবে কুটোগুলো বিছিয়ে দেওয়া হয়। বাঁশের খুঁটিতে দু'তিনটি গোরু বেঁধে ঘোরানো হয়। গরুর পায়ের চাপে কুটো থেকে ধান আলাদা হয়ে যায় তখন ঝাড়াই-বাছাই করে সেই ধান সংগ্রহ করা হয়। ঝাড়াই বাছাই-এর কাজ শেষ হলে বাঁশের খুঁটি তোলার সময় ভূমি মাতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মোরগ উৎসর্গ করে যে পূজো করা হয় তাকেই বলে খালিপূজো। নিজ নিজ গোত্রের লোকেরা তাঁদের বংশের প্রধানের বাড়িতে সমবেত হয়ে একটি নির্দিষ্ট দিনে এই পূজো করে থাকেন।[৫৭]

গ্রামীপূজো : অপদেবতার কুনজর থেকে বাঁচার জন্য গ্রামের সকলে একত্রে মিলিত হয়ে ১লা মাঘ যে পূজো করেন তাকেই গ্রামীপূজো বলা হয়। অশুভ শক্তিকে তাঁদের গ্রাম বা পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক পরিবার থেকে

একটি করে মোরগ ও আতপ চাল সংগ্রহ করা হয়। গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানের আখড়াতে উঁচু মাটির বেদী তৈরী করে সেখানে পুজোর আয়োজন করা হয়। মোরগ উৎসর্গ করার পর আতপচাল সহযোগে ভোগ (সুরি-মাণ্ডি) রান্না করে গ্রামের সকলে আখড়ায় বসে বটপাতা বা শাল পাতায় সেই প্রসাদ খেয়ে থাকেন। ওরাওঁদের বিশ্বাস যে, গ্রামীপূজো করলে গ্রাম থেকে অশুভ শক্তির বিতাড়ন হয়ে থাকে এবং গ্রামে সুখ শান্তি বিরাজ করে।[৫৮]

আসমা পারাব - ১লা মাঘ অর্থাৎ গ্রামীপুজোর দিনেই এই পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন খুব ভোরে মাটির নতুন হাঁড়িতে চাল গুঁড়ির সাথে গুড় মিশিয়ে পিঠে ছাঁকা হয় এবং বট পাতায় নৈবেদ্য সাজিয়ে তা পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়।[৫৯]

ফাগু-ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঐ দিন খুব ভোরে নাইগী (পুরোহিত) জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে যে শিমুল গাছের ফুল এবং ফল হয়নি অর্থাৎ কুমারী শিমুল গাছের কয়েকটা ডাল সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। সেদিন বৈকালে গ্রামের পাশের মাঠে ডালগুলো এক জায়গায় পোঁতা হয় এবং তার উপর খড় দিয়ে শকুনের বাসা তৈরী করা হয়। সন্ধ্যা বেলায় নাইগী ঐ বাসায় আগুন ধরিয়ে দেন। ওঁরাওদের বিশ্বাস যে, শিমুল গাছে শকুনের বাসা থাকলে মানুষের অমঙ্গল হয়। শিমুল গাছে শকুনের বাসা অর্থাৎ অমঙ্গলের প্রতীক বিনাশ করে তাঁরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যে, দুঃখ-দারিদ্র, অশান্তি ও অসুখ-বিসুখের হাত থেকে যেন তাঁদের রক্ষা করা হয়। সেদিন থেকেই ওঁরাওদের নতুন বছর শুরু হয়। তাই প্রতিটি ঘরবাড়ি গোবর দিয়ে নিকানো হয় এবং মেয়েরা বাড়ির দেওয়ালে ছাপ দিয়ে নকশা চিত্রিত করেন। সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া ও নাচ-গান চলতে থাকে। এ ভাবেই দুই তিন দিন যাবৎ এই পার্বন পালিত হয়ে থাকে।[৬০]

খাদ্দি- ভারতের আদিম আধিবাসীরা পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী না হয়েও প্রকৃতি তথা পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখতে বিশেষভাবে সচেতন ও সচেষ্ট ছিলেন। জঙ্গলে বসবাস করলেও নির্বিচারে অরণ্যকে ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে ধরিত্রীর প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট করলে ভবিষ্যতে খাদ্য সংগ্রহের সমস্যা ও প্রাণবায়ুর ঘাটতি দেখা দিতে পারে ফলে পৃথিবী থেকে জীবজগতের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতে পারে। আদিম যুগে অরণ্যে পশু শিকার, নদী বা জলাধার থেকে মৎস্য শিকার, জঙ্গল থেকে শাক-পাতা, ফল-ফুল, কন্দ সংগ্রহ করেই জীবন ধারণ করতে হত। সেই কারণেই প্রকৃতিকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।[৬১] ওঁরাওদের বিশ্বাস এই যে, সর্বশক্তিমান ধার্মেস দ্বারা প্রকৃতির সমস্ত কিছু সৃষ্টি হলেও অরণ্যের বনস্পতি ও ক্ষেতের ফসল উৎপাদনে সূর্যদেব ও ভূমি মাতার বিশেষ অবদান রয়েছে। সূর্যদেবের ঔরসে ভূমিমাতা (ধরিত্রী) গর্ভ ধারণ করেন এবং তাঁর গর্ভ থেকেই বন-জঙ্গল, বনস্পতি ও ক্ষেতের ফসল উৎপাদিত হয়ে থাকে। খাদ্দি পার্বণের প্রারম্ভেই গ্রামের পাহান (গুরু বা পুরোহিত) ও পাহান পত্নীর প্রতীকী বিবাহ উৎসবের আয়োজন করা হয়। সূর্যদেব ও ভূমি মাতা (চণ্ডী)-কেই স্মরণ করে এই বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।[৬২] বিবাহ উৎসব সমাপনে এবং তাঁদের মিলনে ভূমিমাতার গর্ভজাত শ্রেষ্ঠ বনস্পতি শাল বৃক্ষের আরাধনাই হচ্ছে খাদ্দি পার্বণের মুখ্য বিষয়। বসন্তের অন্তিমলগ্নে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ গাছের কচি ডাল, কচি পাতা, ফুলের কুঁড়ি, মুকুল ও কচি ফলের সৌরভে চতুর্দিক সুবাসিত এবং নবপত্রে বনানী পল্লবিত হয়ে ওঠে ঐ সময় কচি ডাল ভাঙ্গা, কচি পাতা ছেঁড়া, কচি ফল- ফুল- মুকুল তোলা নিষেধ। ওঁরাও সমাজ কঠোর অনুশাসনের মাধ্যমে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে থাকে। আঁতুড় ঘরে নবজাত শিশু কচি হাত-পা নাড়িয়ে যে ভাবে তার আগমন বার্তা জ্ঞাপন করে সেরকম ভাবেই বিশ্বজুড়ে বৃক্ষরাজি লতাগুল্ম নব

কিশলয়ে শোভিত হয়ে এবং সৌরভ ছড়িয়ে তার উপস্থিতির খবর দেয়। প্রকৃতির এই রূপ আঁতুড় অবস্থা হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। সূতিকাগারে যেমন মা ও ধাত্রী ছাড়া সাধারণের প্রবেশ করা বা শিশুকে স্পর্শ করা নিষেধ তেমনি প্রকৃতির কচি ডাল-পালা, শাক-পাতা, ফল-ফুল তোলা বা স্পর্শ করাও ওঁরাও সমাজে নিষিদ্ধ। যদি কোনো ব্যক্তি এই নিষেধ উপেক্ষা করে গাছের কচি ফল-পাতা আহরণ করেন তাহলে তাঁকে "সোতবড়োয়া"(অপবিত্র) আখ্যা দিয়ে সমাজচ্যুত করা হয়।[৬৩] অশুচি হওয়ার ফলে তাঁরা সমাজের কোন লোকের সাথে মেলামেশা বা তাঁদের বাড়িতে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। যতদিন না এই অসূচী থেকে মুক্ত হন ততদিন সকলে তাঁদের পরিহার করে চলেন বা তাঁদের থেকে দূরে সরে থাকেন। এমনকি অশুচি পরিবারের কোন সদস্যের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন থেকেও বিরত থাকতে হয় যতক্ষণ না ওঁরাও সমাজের বিধি অনুসারে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে শুদ্ধিকরণ 'ডাণ্ডা কাট্টানা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানের পরে যথাযথ দণ্ড (জরিমানা) প্রদান করার পর তাঁরা সমাজে ফিরে আসার সুযোগ পান।

ওঁরাওদের জীবন ধারণে শাল গাছের ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বশক্তিমান 'ধার্মেস' (ঈশ্বর)-কে দেখা যায় না তিনি অদৃশ্য তাই তাঁর সৃষ্ট বনানীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্মান শাল বৃক্ষকে নির্বাচিত করে তাঁর আরাধনা করাই খাদ্দি পার্বণের উদ্দেশ্য। খাদ্যের সংস্থান ছাড়াও জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুতে এই বৃক্ষের মহান অবদান রয়েছে। এই পার্বণ উপলক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেক বয়স্ক পুরুষ ও মহিলারা উপবাসে থেকে পরদিন এই পুজোতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। নিজ নিজ বাড়ির পুজো শেষ করে গ্রামের সকলে দলবদ্ধ হয়ে 'চালা-টোঙ্কা'-তে জমায়েত হন। গ্রামের অনতিদূরে জঙ্গল ঘেরা প্রশস্ত সমতল ভূমিকে 'চালা-টোঙ্কা' বা আখড়া বলা হয়।

সেখানে একটি শালগাছ নির্বাচন করে তার নীচে পূজোর আয়োজন করা হয়। 'চালা-টোঙ্কা' ওঁরাওদের এক পবিত্র স্থান।[৬৪] এখানে ধার্মেস (ঈশ্বর), বিরি-বেলাস (সূর্যদেব) ও চালা-আয়ো (ভূমিদেবী) এঁদের পুজো করা হয়। ওঁরাও পুরোহিত তথা পাহান এই পুজো করে থাকেন। একেবারে নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রকাশ্যে এই পুজো হলেও মন্ত্রপাঠ প্রকাশ্যে হয় না। পাহান মনে মনে মন্ত্রপাঠ করে থাকেন। পূজানুষ্ঠানের সমাপ্তিতে পাহান স্বয়ং ভবিষ্যৎ বাণী করে নতুন বছরে অর্থাৎ আগামী বর্ষায় কিরূপ বৃষ্টি হবে এবং ফসল কেমন ফলবে তা জানিয়ে দেন। এরপর সমবেত মহিলারা ধামসা মাদলের তালে তালে নাচগানে মেতে ওঠেন এবং সন্ধ্যা গড়িয়ে অধিক রাত পর্যন্ত নাচগান চলতে থাকে। পাহানের নির্দেশিত ভবিষ্যৎ বাণীর উপর নির্ভর করে ওঁরাওরা সেই বছরের জন্য কৃষিকাজের প্রস্তুতি হিসাবে জমিতে চাষ দেওয়া, সার ছড়ানো, চাঙ্গড় ভাঙ্গা প্রভৃতি কাজ শুরু করে দেন।[৬৫]

টাঠখা পারাব : চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এই পার্বণ হয়ে থাকে। ঐ দিন প্রথম আম পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। তার আগে এই সমাজে আম খাওয়া নিষিদ্ধ। এই পার্বণে বিশেষ কোন অনুষ্ঠান হয় না তবে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়িতে টাঠখা পারাব করে থাকেন।[৬৬]

করম - ধান রোপণের সমাপ্তি-দুর্গোৎসবের একমাস পূর্বে আকাশে শরৎ-এর টুকরো টুকরো মেঘের ভেলা মাঠে মাঠে কাশ ফুলের ঢেউ- চারদিকে আনন্দ উৎসবের মেজাজ- ওঁরাও পল্লীতে তুং ধাতুং ধামসা মাদলের তালে মেয়েদের নাচগানে আখড়া মুখরিত- ঠিক এই সময়ে ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে করম পার্বণ ওঁরাও আদিবাসীদের জীবনে অন্য মাত্রা এনে দেয়। মহা সমারোহে ওঁরাও জনজাতিরা এই দিনটি পালন করে থাকেন। গ্রামের নির্দিষ্ট আখড়ায় বেদী নির্মাণ করে সেখানে পুজোর

কয়েকদিন আগে থেকেই বিভিন্ন ডালশস্য রেখে প্রতিদিন জল সেচন করে অঙ্কুরোদগম জন্য প্রতীক্ষা করেন। করম পুজোর দিনে ঐ শস্য অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। উপবাসে থাকার পর স্নান করে শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করে কয়েকজন অবিবাহিত যুবক সন্ধ্যায় করম ডাল (Nauclea Parcifolia) তথা চাকলতা গাছের ডাল জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে আনেন এবং গ্রামের প্রবেশ পথ থেকে উপবাসী নববস্ত্র পরিহিতা কুমারী মেয়েরা সেই ডাল নিয়ে আখড়ার বেদীর কাছে গিয়ে পুরোহিতকে অর্পণ করেন এবং পুরোহিত সেগুলো বেদীতে স্থাপন করেন। সারা রাত ধরে পুজো অনুষ্ঠান ও নাচগান চলতে থাকে। পরদিন শোভাযাত্রা সহকারে সেই ডাল বিসর্জন দিয়ে পার্বনের সমাপ্তি করা হয়। পার্বণটি মূলত কৃষি সম্পর্কিত হলেও আসলে বৃক্ষের প্রতি ভক্তি ও মমত্ববোধ বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার এক দৃষ্টান্ত বলা যায় ।[৬৫] কারাম, করম, কর্ম বা কর্মা প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক না কেন, মূলত করম গাছের পুজো থেকেই এই উৎসবের নাম করম উৎসব। যদিও এবিষয়ে বেশ কয়েকটি ওঁরাও লোককাহিনী প্রচলিত আছে। সুদূর অতীতে বিপদগ্রস্ত ওঁরাওরা এই করমবৃক্ষ দ্বারা কোনভাবে উপকৃত হয়ে ছিলেন বা উদ্ধার পেয়ে ছিলেন সেই থেকেই এই বৃক্ষ পুজোর প্রচলন শুরু হয়েছে। পরিবেশ সচেতনতার প্রতীক এই পুজোর বৈশিষ্ট্য আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, শুদ্ধাচারে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে বৃক্ষ পুজোর আয়োজন করে তার পরিচর্যা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার যে বার্তা দেওয়া হয় তার মর্মার্থ উপলব্ধি না করে আকণ্ঠ হাড়িয়া পান করে মদোন্মত্ত হয়ে ওরাওঁরা আজ মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে।[৬৭]

সহরায় : কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার দিন এই পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রাত্রে গোয়াল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে প্রদীপ জ্বালিয়ে পুজা সামগ্রী নিয়ে গোয়াল ঘরে ভগবতী

দেবীর পুজা করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য গৃহপালিত পশু যেন কোন রকম রোগে আক্রান্ত না হয় এবং ওই পরিবারের সমৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে।[৬৮]

যাত্রা- এই পার্বণ সাধারণত কার্ত্তিক মাসের ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। গ্রামের কোন প্রশস্ত স্থানে বা আখড়ায় একটি বাঁশ পুঁতে রাখা হয়। এই উপলক্ষ্যে গ্রামের প্রতিটি বাড়িঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে যুবতী মেয়েরা সাদা লাল পেড়ে শাড়ি পড়ে ঐ আখড়ায় উপস্থিত হন। ওরাওঁ পূজারীরা নিজস্ব প্রথায় পূজা অর্চনা শুরু করেন এবং মেয়েরা নাচতে নাচতে আখড়া প্রদক্ষিণ করেন। যাত্রা পার্বণ তিন প্রকার হয়ে থাকে জেঠ যাত্রা, ইদ যাত্রা ও সহরায় যাত্রা, প্রত্যেক যাত্রা অনুষ্ঠান ঋতু অনুযায়ী পালন করা হয়। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে নাচ, গান ও মাদলের তাল আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। বয়স্ক ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে করা নজর রাখেন। যাত্রা মাঠে বিভিন্ন গ্রামের সদস্যদের নিমন্ত্রণ করা হয় এবং তাঁরা নিজেদের পতাকা নিয়ে নাচ গান করতে করতে আখড়ায় উপস্থিত হন। আয়োজক গ্রামের পক্ষ থেকে সকলকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। যাত্রা পার্বনের মূল উদ্দেশ্য সকলের এক জায়গায় মিলিত হওয়া, এক সাথে আনন্দ করা এবং প্রাক-বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তুতি নেওয়া।[৬৯]

পুনা-মান্না : এটি কৃষির সাথে সম্পর্কযুক্ত। ওরাওঁরা শুদ্ধসহকারে এই পার্বন পালন করে থাকেন। এই পার্বনে খুব বেশী বিধি বিধান নেই। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে উৎপন্ন ফসল তথা আউশ ধান খুব তাড়াতাড়ি পাকে এবং কাটার উপযোগী হয় তাই এই ধান পুনা-মান্না পার্বণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই মাঠ থেকে কয়েক আঁটি ধান সংগ্রহ করে এনে সেই ধান থেকে চিড়া ও আতপ বানিয়ে ধার্মেস এবং পূর্বপুরুষদের উৎসর্গ করা হয়। যেহেতু ঈশ্বরের কৃপায় অন্নের সংস্থান হয় তাই সর্বাগ্রে মাঠের উৎপাদিত নতুন ফসল ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করাই হচ্ছে মুখ্য বিধান।[৭০]

ওঁরাও সমাজে সর্বক্ষেত্রে সকল বিষয়ে পবিত্রতা রক্ষা করে চলা একান্ত আবশ্যক। শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুচিতা বজায় রেখে চলায় এদের বিধি। এই শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানই হচ্ছে ওরাওঁদের 'ডাণ্ডা কাট্টানা'। এই অনুষ্ঠান যে কোনদিন সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে করা হয়। ওরাওঁরা তাঁদের যে কোন শুভ কাজের প্রারম্ভে, বিবাহ অনুষ্ঠানের পর, সদ্যজাত শিশুর আঁতুড় অবস্থা কাটার পর, মৃতের অনুষ্ঠানের পর, করম পার্বনের সমাপ্তিতে ভোর রাত্রে, মুগুনের পর, শস্য ঝাড়াই-এর পর এবং বাঁধ নির্মান, পুকুর খনন, কুয়ো খনন, নবান্ন, শস্য বপন বা রোপণ, ছেদন, গৃহ নির্মাণ, গৃহ প্রবেশ প্রভৃতি কাজের পূর্বে বা সূচনাতে এই শুদ্ধিকরণ তথা সত্যনারায়ণ পূজা বা ডাণ্ডা কাট্টানা অনুষ্ঠান করে থাকেন।[৬২] ডাণ্ডা কাট্টানার মাধ্যমে তাঁরা ধার্মেস (ঈশ্বর), চালা আয়ো (ধরিত্রী মাতা), বিরি বেলাস (সূর্যদেব), তাঁদের পূর্বপুরুষ ও অন্যান্য দেবদেবীর পুজো করে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস এই যে, কেউ যদি এই অনুষ্ঠান না করেন তাহলে তাঁরা অশুচি থেকে যান এবং সমাজের কোন মানুষের সাথে মেলামেশা বা কোন প্রকার শুভ কাজে কিংবা কোন পুজো-পার্বনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। সংসারে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য এবং গ্রহের প্রতিকূল প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান করা উচিত বলে তারা মনে করেন। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও অন্যান্য শুভকর্ম অনুযায়ী ডাণ্ডা কাট্টানার পদ্ধতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি পুজোর পর পুজো-সামগ্রী বিসর্জন দেওয়ার নিয়মও আলাদা আলাদা ভাবে পালিত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে কিশোরদের শালপাতা ও ভেলোয়া দণ্ড সংগ্রহ এবং মহিলাদের পুজো উপকরণ সরবরাহ ছাড়া বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। কেবলমাত্র বয়স্ক ব্যক্তিরাই এই পুজোতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। গোবর নিকানো পরিষ্কার জায়গায় পাহান (গুরু বা নাইগী) পূর্ব মুখে আসন করে বসেন, তাঁর পিছনে এবং দুই পাশে বয়স্ক ব্যক্তিরা

বসেন। গুরু নিজের কোলে কুলোটি স্থাপন করে তার মধ্যে আতপ চাল ও ডিম রাখেন। তার আগে লাল, সাদা, কালো রং ব্যবহার করে মাটিতে ডাণ্ডা কাট্টানার চিত্র আঁকা হয়। এই রং গুলোর এক একটি অর্থ আছে। এক একটি রং আরাধ্য দেবদেবীর আহ্বান বা অপদেবতাদের বিতাড়ন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ডাণ্ডা কাট্টানা চিত্রের মাঝখানে পূর্ব পশ্চিম লম্বা করে ভেলোয়া দণ্ড স্থাপন করা হয়। এই ভেলোয়া দণ্ডের মাঝখানে আতপ চাল গুড়োর ঠোঙাটি রাখা হয়। এরপর গুরু আতপ চালের মাঝখানে ডিমটি রেখে মন্ত্রপাঠ করতে থাকেন এবং অন্যান্য দেবদেবীর পুজো করেন। পুজো শেষে আতপ চাল গুড়ির সাথে ডিম মিশিয়ে উনানের আঁচে সিদ্ধ করে প্রসাদ বানানো হয়। এই প্রসাদ সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয় কিন্তু এই প্রসাদ মহিলাদের গ্রহণ নিষিদ্ধ।বিভিন্ন সময়ে ওঁরাওরা সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক কারণে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছিল। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৭০০ অব্দে মধ্য ভারতের বিন্ধ্যপর্বত তথা নর্মদা এলাকায় প্রবেশ করে, ঐ সময় ছিল গ্রীষ্মকাল। প্রচণ্ড গরমে ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। তখন জঙ্গলের মধ্যে ভেলোয়া ফল দেখতে পায় এবং তা সংগ্রহ করে ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করে। যাঁরা যাঁরা ভেলোয়া ফল ভক্ষণ করেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকের গায়ে ছোট ছোট ফোঁড়া বা মুসুরি বের হয় এবং রাত্রে যন্ত্রনায় সকলে ছটফট করতে থাকেন। সকালে পাহান তথা গুরু নিদান দেন যে, প্রত্যেক বাড়িতে ভেলোয়া কাঠি সহযোগে ডাণ্ডা কাট্টানা অনুষ্ঠান করতে হবে। তার আগে ঐ কাঠি বা ফোড়ায় আক্রান্তদের গায়ে স্পর্শ করাতে হবে। গুরুর নির্দেশ মত ভেলোয়া কাঠি স্পর্শ করিয়ে প্রত্যেক পরিবার শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান করে। তার পরদিন আশ্চর্যজনক ভাবে লক্ষ্য করা যায় যে ফোঁড়ায় কাতর সকলে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তখন থেকেই ডাণ্ডা কাট্টানা অনুষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ভাবে ভোলায়া কাঠির

প্রচলন শুরু হয় তার আগে শাল গাছের দণ্ড বা কাঠি এই পূজোতে ব্যবহার করা হত। তাই ডাণ্ডা কাট্টানার অপর নাম 'ভেলোয়া ফাড়ি'।[৭১] অন্য আদিবাসী সমাজেও এই অনুষ্ঠান ভোলায়া ফাড়ি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

জন্ম সংস্কার : বাড়ির গৃহবধূ যখন গর্ভবর্তী হন তখন 'জোদা কামনা' অর্থাৎ পৃথক পৃথক স্থানে স্বামী ও স্ত্রীকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। গর্ভবতী হওয়ার দুই বা তিন মাসের মধ্যে এই 'জোদা কামনা' কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে কারণ তাতে গর্ভস্থ শিশু ও মা উভয়েই সুস্থ থাকেন। এই কাজ করার জন্য বিশেষ কোনো বস্তুর আবশ্যক নেই, তবে 'জোদা কামনা' অনুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীরা উপস্থিত থাকেন, তাদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা হয়। গর্ভবতী মায়ের শরীরে যাতে কোনো অপদেবতা ভর না করে তার জন্য ভেড়া বা ছাগল উৎসর্গ করার রীতি আছে। গর্ভবতী মহিলা যাতে হালকা কাজ কর্ম করে স্বাভাবিক থাকেন। সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিনে প্রসূতি ও শিশুকে স্নান করানো হয় এবং বাড়িঘর গোবর জল দিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের লোকেদের সন্ধ্যায় নিমন্ত্রণ করে। ‘নামে পিঞ্জিনা” (নামকরণ) অনুষ্ঠান করা হয়। এঁরা তিন রকম ভাবে নামকরণ করে থাকেন যথা – ১) শাখী নামকরণ, ২) জন্ম বার নামকরণ ও ৩) আধুনিক নামকরণ।[৭২]

১) শাখী নামকরণ ঃ একটি বাটিতে ধান রেখে অপর একটি কাঁসার থালায় জল ভর্তি করে তার চারদিকে গ্রামবাসী ও আত্মীয় স্বজনরা গোল হয়ে বসে নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন। ওরাওঁরা যেহেতু পূর্বপুরুষের আত্মার উপর বিশ্বাস রাখেন তাই নামকরণের সময় ঠাকুরদা-ঠাকুরমা, দাদু-দিদা বা পূর্বজদের নাম গ্রহণযোগ্য করার জন্য ধান ঘষে চাল বের করে থালা ভর্তি জলের উপর ছেড়ে দেন, কোনো কোনো

ক্ষেত্রে চাল জলে ডুবে গেলে পুনরায় ধান থেকে চাল নিয়ে থালার উপর ভাসিয়ে দেন। এইভাবে দুটো চাল ভাসিয়ে পূর্বজদের নাম স্মরণ করা হয়। যাঁর নাম স্মরণ করার সময় ঐ ভাসমান দুটো চাল জোড়া লাগে তাঁর নামেই শিশুর নাম রাখা হয়। এই নামকরণকে বলা হয় শাখী নামকরণ।[৭৩] ২) জন্ম বার নামকরণ : জন্ম বার নামকরণের বেলায় বারের নাম অনুসারে মেয়েদের ক্ষেত্রে সোমবারী, মুংলী, বুধনী, লক্ষ্মী, শান্চী ও এতোয়ারী এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে সোমরা, মঙ্গলা, বুধু, লক্ষ্মীরাম, শুকরা, এতোয়া ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়ে থাকে।[৭৪]৩) আধুনিক নামকরণ : বর্তমান পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে পরিবারের লোকেরা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যে নামকরণ করেন তাকে আধুনিক নামকরণ বলা হয়।

মৃত্যু সংস্কার : মানুষ দেহ ত্যাগ করার পর তাঁর আত্মার শান্তির জন্য যে সকল কার্য সম্পন্ন করা হয়ে থাকে সেগুলো মৃত্যু সংস্কার হিসাবে ধরা হয়।[৭৫] জলে ডুবে মৃত্যু হলে, আগুনে পুড়ে মৃত্যু হলে বা গর্ভবর্তী মহিলার মৃত্যু হলে অথবা কোন শিশুর মৃত্যু হলে ওরাওঁরা প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে সংস্কার করে থাকেন। এঁরা দাহ করে বা কবর দিয়ে দুই ভাবেই সৎকার করে থাকেন। ছোট শিশুদের বেলায় খুব যত্ন সহকারে কবর দিয়ে সেখানে আম, জাম, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ লাগিয়ে দেন কারণ এঁদের বিশ্বাস যে ওই গাছের ফলের রস খেয়ে শিশুরা প্রতিপালিত হবে। শিশুদের জন্য গ্রামের নিকটবর্তী কোনো পরিস্কার স্থানকে শ্মশান হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। গর্ভবর্তী মহিলার মৃত্যু হলে, গ্রাম থেকে বহু দূরে নদীর ধারে মাটিতে পুঁতে বা কবর দিয়ে কাঁটা গাছের বেড়া দেওয়া হয় যাতে ওই মহিলার অশুভ আত্মা ফিরে আসতে না পারে। সুস্থ ও স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের মৃত্যু হলে তাঁকে শ্মশাণে দাহ করা হয় কিম্বা মাটিতে সমাধি দেওয়া হয়। প্রবীন লোকেদের দেহ সৎকার করার পর তাঁর

আত্মাকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য বাড়ির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কক্ষকে বেছে নেওয়া হয়। পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরে ওই কক্ষে পূর্বপুরুষকে স্মরণ করে বট পাতায় পিঠা, গাছের প্রথম আম, নতুন ধানের চিড়া, মদ ইত্যাদি উৎসর্গ করা হয়। ওঁরাও জনজাতির বিশ্বাস করেন যে, বাড়ির মধ্যে পূর্বপুরুষদের আত্মা বিরাজ করলে সেই পরিবারে শান্তি ফিরে আসে।[৭৬]

ওঁরাও জনজাতির বিবাহ রীতিনীতি অন্যান্য জনজাতির থেকে অনেকটাই ভিন্ন এবং এই ভিন্নতা একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বহন করে। বিবাহ একটি বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান। একটি পরিচিত অথবা অপরিচিত পরিবেশ ও পরিবার হতে একজোড়া নরনারী এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহী জীবনে প্রবেশ করার সামাজিক অনুমতি লাভ করে। স্বাধীনভাবে মেলামেশা, সন্তান উৎপাদন বা বংশরক্ষার পাশাপাশি সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে নরনারীর জোড়াটি আদর্শ গৃহস্থ রূপে পরিগণিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই বিবাহকে ঘিরে পৃথিবীর সর্বোত্ত সব জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে গভীর উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। একজোড়া নরনারীর জীবনকে একসূত্রে জুড়ে দেওয়া তবু এই অনুষ্ঠানকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে অজস্র বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ নানান অনুষ্ঠানের। আর ওঁরাও সমাজের বিবাহবিধি এই বৈচিত্র্যের কারণেই বিশেষ সমীহ আদায় করেছে। বিশ্বের প্রতিটি জাতি বা জনজাতিদের মধ্যে নিজস্ব বিবাহবিধি আছে আর তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নিজস্ব রকমের আচার অনুষ্ঠান। সেই হিসেবে ওঁরাওরাও ব্যাত্রিক্রমী নয়। কিন্তু বিবাহ বীধি পালনের মধ্যে একটি নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে আর এই জন্যই ওঁরাওদের বিচিত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধানে ওঁরাও জনজাতির বিবাহবিধি অনন্য ও আকর্ষণীয়।[৭৭]

ওঁরাও সমাজের বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রীর মেলামেশার সুযোগ কম থাকায় প্রেমঘটিত বিবাহের খুব একটা প্রচলন নেই বললেই চলে। বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল তবে কোন কিশোরী কন্যাকে পছন্দ হলে উভয় পরিবারের সম্মতিতে পাত্র পক্ষের পরিবার পাত্রীকে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি পড়িয়ে 'সুতাবন্ধন' অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে অর্থাৎ আগে থেকেই কিশোরী কন্যাকে পাত্রী হিসেবে নির্বাচন করে রাখে। অন্য জনজাতিতে বিবাহ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ ছিল তবে বর্তমানে অনেকেই অন্যান্য জনজাতিদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। পাত্র পাত্রীর অভিভাবকরা সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কারোর বাড়িতে যাওয়ার রীতি ছিল না। ঘটকের মাধ্যমে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করতে হতো। ওঁরাও সমাজে ঘটকরা 'আগুয়া' নামে পরিচিত। পাত্র পক্ষের লোকেরা পাত্রীর বাড়িতে যাওয়ার সময় কোন অশুভ সংকেত লক্ষ করলে সেখানে আর বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা হত না। আর সবকিছু নিয়ম মেনে ঠিকঠাক থাকলে এবং পাত্র পক্ষের হয়ে ঘটক প্রস্তাব দিলে পাত্রী পক্ষের লোকেরা বাড়ির উঠানে অতিথিদের পা ধুইয়ে বাড়িতে প্রবেশ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। বাড়ির মেয়েরা কাঠের পিঁড়ি, গামছা, তেল ইত্যাদির মাধ্যমে সকলের পা ধুইয়ে সম্মান জানাত এবং এর বিনিময়ে এক থেকে দুই টাকা উপহার হিসেবে পাত্রী পক্ষের লোকেরা পেত। বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা শেষ হলে 'পচায়'(অপরিচ্ছন্ন চাল সিদ্ধ করে শুকনো ভাতের মত করে তার সাথে বাখর মিশিয়ে হাড়িতে ঢাকা দিয়ে কয়েকদিন রাখলে যে মদ তৈরী হয়) নামক পানীয়ের ব্যবস্থা করা হত।

'সুতাবন্ধন' পর্ব শেষ হলে বৈবাহিক সম্পর্ক চূড়ান্ত রূপ নেয়। প্রথম দিকে এই সুতা বাঁধা টাই আশীর্বাদের অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত হলেও বর্তমানে ধান-দূর্বা, নতুন বস্ত্র,ঘড়ি, স্বর্ণালঙ্কার, ইত্যাদি দিয়ে আশীর্বাদ করার রীতি চালু হয়েছে। বিয়ের শুভ সময়

হিসেবে এই জনজাতির মানুষেরা মাঘ-ফাল্গুন মাসকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচন করে থাকে। অর্থনৈতিক অবস্থার কথা ভেবে এই মাস গুলোকে সঠিক সময় হিসেবে নির্ধারণ করত কারণ এই সময় আবহওয়া যেমন অনুকূল থাকত তেমনি চাল, ডাল, সবজি সহজলভ্য হত। তাই দুটো পরিবারের ক্ষেত্রে বিবাহের খরচ বহন করা সাধ্যের মধ্যে থাকত। এই জনজাতির বিবাহের ক্ষেত্রে ছাদনা তলা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে । ছাদনা তলা এই জনজাতির মানুষের কাছে 'ঝামরা' নামে পরিচিত।[৭৮] বাড়ির উঠোনে প্রায় বর্গাকারে চারটি বাসের খুঁটি লাগিয়ে তার সঙ্গে পাঁচ ধরণের গাছের ডালপালা দিয়ে এই 'ঝামরা' তৈরি করা হয়। সেই ঝামরার সব থেকে বড় খুঁটিতে খঁড় দিয়ে মানুষের প্রতিকৃতি বসিয়ে রাখা হয়। যাতে সেই শুভ বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে কোনো অশুভ শক্তির দৃষ্টি না পড়ে। তাছাড়া সহজে পথ চলতি মানুষেরা সকলেই যেন বুঝতে পারে এই বাড়িতে কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান আছে। বিবাহের পূর্বে এই রীতিনীতিতে কোন পুরোহিত থাকে না, দুই পরিবারের অভিভাবক এবং গ্রামের বয়স্কদের তত্ত্বাবধানে এই রীতিনীতির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। এরপর শুরু হয় কাড়সা বা মঙ্গলঘট তৈরী করার পর্ব, যেটা বিভিন্ন জনজাতির বিবাহের রীতিনীতির থেকে একেবারেই পৃথক যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৮১] এই পর্যায়ে বিবাহের দিন সকাল বেলায় ছাদনাতলায় পূর্ব দিকে মুখ করে ছেলেরা বসে মঙ্গলঘট বা কাড়সা তৈরী করে।এই কাড়সা বানানোর এক রীতি ও লক্ষ্য করা যায়। এই কাড়সা বানানোর ক্ষেত্রে একটি মাটির ঘটের প্রয়োজন হয়। (ওই ঘটের গলায় খড়সহ ধানের শিষ দিয়ে বিনুনী বানিয়ে পরিয়ে দেওয়া হয়। ঘটের মুখে মাসকলাই ভর্তি একটি সরা বসিয়ে দেওয়া হয় ওই সরায় লবন ও সরষের তেল ঢেলে পাঁচ বা সাতটি পলতে রেখে দেওয়া হয়) বিয়ের দিন পাত্র বিয়ে করতে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহুর্তে এই কাড়সাটি কোন একটি মহিলা

মাথায় নিয়ে স্থানীয় কোন বয়স্ক ব্যক্তির পৌরহিত্যে ছেলে এবং মেয়েরা গান ও নাচ করতে করতে ছাদনাতলার চারিদিকে ঘুরে সুন্দর ভাবে সাজানো কাড়সাটি ছাদনাতলার একপাশে রেখে দিয়ে কাড়সা পর্ব সম্পন্ন করে।

বিবাহ করতে যাওয়ার সময় বরের সাথে একজন মিতবর রাখার রীতি আছে। বর বিয়ে করতে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে লালপাড় সাদা শাড়ি পরা একজন মহিলা প্রথমে মঙ্গলঘট বা কাড়সাটি মাথায় নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়, তার পরেই বর মিতবরকে নিয়ে বিয়ের জন্য পাত্রীর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বরযাত্রীরা পাত্রীর গ্রামে পৌঁছালে পাত্রীর বাড়ির কাছাকাছি কোন একটা বাড়িতে সাময়িক বিশ্রামের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। সেইসময় পাত্রী পক্ষের মুখ্যব্যক্তি পাত্রপক্ষের ঘটককে ডেকে আগমন বার্তা দিলে তখন সকলের পা ধুয়ে পাত্রীর বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার রীতি আছে। পাত্রীর বাড়ির উঠোনের এক কোণে একটা উনানের পাশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং একটি নতুন মাটির হাড়িতে দুই পক্ষের পক্ষ থেকে সম পরিমাণ সরষে তেল ঢালা হয়।এই তেল ঢালার সময় নিজ নিজ পুর্বপুরুষের স্মরণ করে পাত্র -পাত্রীর গোত্র একত্রীকরণ বিষয়ে মন্ত্র পাঠ করে চালগুরির পিঠা বা লাড্ডু বানানো হয় তারপর ই পাত্র পক্ষের কাড়সাধারী মহিলা পাত্রী পক্ষের কাড়সাধারী মহিলাকে আলিঙ্গন করে। প্রজ্বলিত দুই কাড়সার জ্যোতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন দুই পক্ষের ছেলে মেয়েরা উদ্দাম নাচ-গানে মেতে ওঠে।এই সময় পাত্রী পক্ষের লোকেরা পাত্রকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দাত মাজার জন্য নিম কাঠি দেয়, দাত মাজা হয়ে গেলে বরবধূ কে একটি কক্ষে পাশাপাশি বসানো হয়। তাদের সামনে শিল নড়া রেখে বর পক্ষের মহিলা পাত্রীর কোলে বসে হলুদ বেঁটে পাত্রীকে মাখিয়ে দেয় অনুরুপ ভাবে পাত্রী পক্ষের মহিলা পাত্রের কোলে বসে পাত্রকে হলুদ মাখায়,তারপর তাদের ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হয়।

সাধারণত জামাইবাবুরা কোলে করে পাত্রীকে ছাদনাতলায় নিয়ে আসে সেই পর্বে পাত্রীর লালপাড় সাদা শাড়ি পরার রীতি আছে। একটা নতুন মাদুরের (তালায়) উপর বসে সিঁদুর দান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়!কোনরকম পুরোহিতের পৌরহিত্য ছাড়ায়।এই পর্বে একটা কাস্তের শেষ প্রান্তে সরষে তেল লাগানো কাপড় জড়িয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে অগ্নিদেবের স্মরণ করে তিনবার ছাদনাতলা ঘুরে এই সিঁদুর দান পর্ব সম্পন্ন হয়। বিদায় হওয়ার আটদিন পর পাত্র ছাদনাতলার খুঁটি তুলে পাত্র পাত্রীকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসলে বিবাহের সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন হয়।[৭৯]

এই জনজাতির মানুষেরা প্রকৃতি পূজো তথা বৃক্ষ, ভূমি, চন্দ্র, সূর্য, পাহাড়, নদী, প্রভৃতির আরাধনা আবহমান কাল ধরে করে আসছে। এমনকি সব রকম পূজা, উৎসব ও অনুষ্ঠানগুলি প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে জীবন ধারণের প্রয়াস এঁদের সংস্কৃতির একটি অঙ্গ বলা যায়। চারদিকে বিষ বাতাসে প্রাণীকূলের তথা মানব জাতির হাঁসফাস অবস্থা তখন ওঁরাওদের এই করম পুজো তথা বৃক্ষপূজা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যে ফুল আহরণ করে আমরা দেবতার চরণে অর্পন করি, যে ফুল দিয়ে আমরা প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হই এবং পরস্পরের সহিত শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকেন। যে পাতা দিয়ে ভেষজ ঔষধ তৈরী হয়, যে পাতা পশু ও মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় - সেই পাতা দেয় বৃক্ষ। প্রখর রৌদ্র তাপে পথশ্রান্ত পথিক, ক্লান্ত শ্রমিক ও কৃষক যে স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় বিশ্রামের সুযোগ পায় – সেই ছায়া প্রদান করে বৃক্ষ। জ্বালানী থেকে গৃহের আসবাব তৈরীতে যে কাঠের প্রয়োজন হয়। সেই কাঠের যোগান দেয় বৃক্ষ। ভূমিক্ষয় রোধ – সেখানেও রয়েছে বৃক্ষের বিশেষ অবদান। বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করে এবং আমাদের বেঁচে থাকার প্রাণবায়ু অক্সিজেন বাতাসে ফিরিয়ে দেয় – সেই বৃক্ষই।

পৃথিবীতে যার এমন মহান অবদান রয়েছে তাকে আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থে, লোভ ও মুনাফা চরিতার্থ করতে নিষ্ঠুরভাবে নির্বিচারে নিধন, ছেদন ও ধ্বংস করে চলেছি। ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এর পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হতে পারে সে কথা চিন্তা করে বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্র নেতারা, পরিবেশ বিজ্ঞানীরা এবং পরিবেশ সচেতন ব্যক্তিত্বরা আন্তর্জাতিক স্তরে বার বার আলোচনা সভা ডাকতে বাধ্য হচ্ছেন। এখনও সময় আছে আমাদের প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে অন্যথায় সমূহ বিপদ থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমার গবেষণার এই অধ্যায়ে আমি কি ভাবে ওঁরাও জনজাতির মানুষেরা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর প্রয়াস করে চলেছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

এর থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে ওঁরাও সম্প্রদায়ের মানুষদের নিজস্ব জীবনধারা, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, রীতিনিতি এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। তাসত্ত্বেও এই ওঁরাওদের সাঁওতাল জনজাতির অন্তর্ভুক্ত করে দেখা হয় এবং তাদের স্বতন্ত্র পরিচিতিকে অস্বীকার করা হয়। শুধু তাই নয়; তাদের নিজস্ব ভাষা ও লিপি প্রচলিত রয়েছে। তাই পৃথক একটি গবেষণার মাধ্যমে আমি ওঁরাও সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ভাষা ও লিপি বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে চাই। গবেষণার মাধ্যমে যে নতুন তথ্য উঠে আসবে, তার থেকে ভবিষ্যতে পিছিয়ে পড়া ওঁরাও জনজাতির উন্নতিকল্পে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেমন সম্ভব হবে, তেমনই তাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলে অপর একটা অন্ধকার দিকও উন্মোচিত হবে বলে আশা করি। তবে আমার এই গবেষণা শুধুমাত্র বর্তমান পুরুলিয়া জেলায় বসবাসকারী ওঁরাও জনজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। স্বল্প সময় এবং স্বল্প পরিসরের জন্যেই বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ঔপনিবেশিক আমল এবং এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিকোত্তর

পর্বের সময়সীমাকে আমি বেছে নিয়েছি। যেহেতু স্বাধীনতার পরেও ওঁরাও দের সমাজ ব্যবস্থার উপর বিশ্লেষণমূলক কোন লিখিত ইতিহাস নেই, সেজন্য আমি কুরুখ ভাষায় লেখা কিছু গ্রন্থ ও সমাজে যা প্রচলিত, তারই ব্যাখ্যা করলাম। ওঁরাও দের ইতিহাস অনুসন্ধান করার জন্য তাদের সমাজভাবনা ও সংস্কৃতিকে মান্যতা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রকৃতিকেন্দ্রিক এই সমাজের নিজস্ব পরিবেশভাবনাও বর্তমানের পৃথিবীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

সুত্র নির্দেশক

১. E. Campion, My Oraon culture. Ranchi, Jharkhand, India: Catholic Press, 1980. pp.37-39.

২. Ibid.pp.39-43.

৩. R. O. Dhan, These are my Tribesmen: the Oraons. Ranchi, 1967.pp.27-31.

৪. Ibid.pp.33-41.

৫. B.B. Chaudhuri: The Story of a Tribal Revolt in the Bengal Presidency: The Rligion and Politics of the Oraons, 1900-1920 in Tarasankar Banerjee (ed) Changing Land System and Tribals in Eastern India; pp 137-151

৬. তরুণদেব ভট্টাচার্য, পুরুলিয়া, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা,১৯৭৯,পৃ.পৃ.২৩-৩১.

৭. Ibid.pp.39-43.

৮. A. Ghosh, The World of Oraons. Delhi: Manohar, 2006.pp.19-23.

৯. Ibid.pp.29-37.

১০. Hotton. J. H. Census of India 1931,I II & III Volumes. Delhi, Gyan Publishing House,Reprint 1966.pp.122-139.

১১. S. C. Roy, Oroan Religion and Customs. Ranchi: K. M. Banerjee, Shambazar, Calcutta. 1928.pp.39-46.

১২. Ibid.pp.51-59.

১৩. Op.cit.A Ghosh.2006.pp.53-61.

১৪. Ibid.pp.69-77.

১৫. Op.cit.R.O Dhan,1967.pp.51-59.

১৬. Ibid.pp.66-73.

১৭. Hunter. W. W, A Statistical Account of Bengal, Vol-17, Delhi 1976 (Reprinted).pp.139-149.

১৮. D.Ekka. Education and culture of indigenous people of Chotanagpur (Bihar Plateau). In R.N. Pati & J. Dash (Eds.), Tribal and indigenous people of India: problems and prospects,: A.P.H. Publishing Corporation, New Delhi, 2002.pp. 329-337.

১৯. A. Ekka. Whither Jharkhand. Social Action Vol 46 April-June 1996. 146-162.

২০. Ibid.pp.169-173.

২১. J. M. Kujur & S. J. Minz. (Eds). Pearls of indigenous wisdom: Selected essays from lifetime contributions by Bishop Dr. Nirmal Minz, an Adivasi Intellectual. New Delhi: Indian Social Institute & Banglaore: Christian Institute for the study of Religion and Society (CISRS). 2007pp.19-27.

২২. W. Fernandes (1993). Indian Tribals and Search for an Indian Identity. Social Change. 23(2-3), Indian Anthropological Association, delhi, 1993,pp.79-88.

২৩. Ibid.pp.61-69.

২৪. Prakash, Gupta The Customary Laws of the Munda & the Oraon, *Journal of the Indian Law Institute*, Vol. 46, No. 1 (January-March 2004),pp.41-55.

২৫. A. Kujur. The Oraon Habitat a Study in Cultural Geography. Ranchi.1989.pp.23-33.

২৬. Ibid.pp.37-45.

২৭. S, Khalkho. Oraon Shanskriti : Parivartan Evam Dishaya, Kudukh Vikash Shamiti, Ranchi.2009.pp.89-97.

২৮. R. Ekka, The Karam festival of the Oraon tribals of India: a socio-religious analysis. Proceedings of ASBBS. Vol.16. No.1. Paper presented at 18th annual conference of American Society of Business and Behavioral Science, Los Vagas.2009.pp.17-27.

২৯. Ibid.pp.34-39.

৩০. Op.cit.Campion.pp.53-59.

৩১. Ibid.pp.66-72.

৩২. Beverley. A, Report on the Census of Bengal, Kolkata,1872 pp.116-118

৩৩. Op.sit.Dhan,R.O. 1967.pp.89-97.

৩৪. S. C. Roy. The Oraons of Chota Nagpur: Their History, Eeconomic Life and social organization. Ranchi: Bar Library.1915.pp.79-88.

৩৫. Ibid.pp.101-113.

৩৬. Ibid.pp.127-133.

৩৭. Op.cit. Kujur, 1989.pp.103-017.

৩৮. Ibid.pp.122-129.

৩৯. Ibid.pp.133-137.

৪০. Op.cit. Ekka,2002.pp.89-93.

৪১. Op.cit. Roy, 1915.pp.137-142.

৪২. Ibid.pp.144-149.

৪৩. Ibid.pp.161-169.

৪৪. V. P. Koonathan. The religion of the Oraons: A comparative study of the concept of God in the Sarna religion of the

Oraons and the Christian concept of God. Shillong: Don Bosco Center for Indigenous Cultures.1999.pp.61-69.

৪৫. Ibid.pp.77-89.

৪৬. Op.cit. Kujur,1989.pp.142-151.

৪৭. Ibid.pp.159-166.

৪৮. Ibid.pp.172-179.

৪৯. Op.cit. Ekka,pp.136-139.

৫০. Op.cit. Dhan,.pp.151-161.

৫১. Ibid.pp.163-169.

৫২. Interview of Gopal Orao of Niyamatpur, West Bengal 9th March 2018.

৫৩. A. Ghosh. History and Culture of Oraon Tribe, Mohit Publication, Delhi, 2012.pp.29-39.

৫৪. Ibid.pp.44-51.

৫৫. Interview of Lacchu Oraon of Barothol, West Bengal 15th February 2019.

৫৬. Op.cit.Roy. pp.44-51.

৫৭. Ibid.pp.53-62.

৫৮. Sardar N., Kurukh kathatha Quarterly Oraon Culture and Literary Magazine, West Bengal, 2011. pp.11-19.

৫৯. Op.cit.Campion, pp.111-117.

৬০. Ibid.pp.123-129.

৬১. Op.cit. Kujur..pp.61-77.

৬২. Op.cit. Campion.pp.82-87.

৬৩. Ibid.pp.91-99.

৬৪. Op.cit. Koonathan.pp.103-109.

৬৫. Op.cit. Campion.pp.131-139.

৬৬. Ibid.pp.144-151.

৬৭. Op.cit. Kujur.pp.161-177.

৬৮. Ibid.pp.181-187.

৬৯. Op.cit. Dhan.pp.151-164.

৭০. Ibid.pp.169-177.

৭১. Ibid.pp.181-189.

৭২. Op.cit. Kujur.pp.179-188.

৭৩. Ibid.pp.191-199.

৭৪. Ibid.pp.203-211.

৭৫. Op.cit Roy.pp.66-73.

৭৬. Ibid.pp.81-88.

৭৭. Ibid.pp.92-97.

৭৮. Op.cit. Campion,1980. pp.146-154.

৭৯. Ibid.pp.161-173.

চতুর্থ অধ্যায়

ওঁরাও জনজাতির ধর্মীয় জীবন

এই অধ্যায়ে, আমি প্রথমে ওঁরাও জনজাতির ধর্মীয় জীবনের সাথে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক অবস্থার পরিবর্তন পরীক্ষা করেছি। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কি ভাবে তাদের ধর্মীয় জীবনে কি কি পরিবর্তন হল এবং হিন্দু ও খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ গুলি বর্ণনা করেছি। পরিশেষে, আমি তাদের শিক্ষা ব্যাবস্থা ও সচেতনার দিক গুলি কীভাবে তাদের জীবন পরিচালনা করে তা বিবেচনা করেছি। এই অধ্যায়ের মূল বিষয় হল ওঁরাও জনজাতির ধর্মীয় জীবনের পরিবর্তনের পরিস্থিতি, এমনকি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ধর্মীয় জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে তারা কতোটা সচেতন তা আমি বিশ্লেষণ করেছি।

ওঁরাওরা নিজেদের আত্মপরিচয়ে 'কুরুখ' বলে থাকে। এমনকি এদের ভাষার নামও কুরুখ ।[১] এই শব্দটির সঙ্গে গভীর মিল আছে সংস্কৃত 'কৃষ' শব্দের যার অর্থ কৃষি। আমার গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ওঁরাওদের জীবিকা হিসাবে কৃষিকাজ এর কথা তুলে ধরেছি। কুরুখ শব্দের মধ্যে ওঁরাওদের গর্বিত ইতিহাস জড়িয়ে আছে। রাজা কুরুখের (কারাশ) বংশধর এবং কোরকাইয়ের প্রাচীন রাজ্য পান্ড্যের কন্নড়ভাষী মানুষের রক্তের সম্পর্ক, ওঁরাওদের ঐতিহ্যবাহী লোককাহিনীতে এমন এক রাজার কথা বলা হয়েছে, যিনি একজন ওঁরাও মহিলার সততায় খুশি হয়ে তাকে পুরস্কার হিসেবে পাঁচটি গ্রাম দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওই মহিলা গ্রাম গ্রহণের পরিবর্তে গবাদি পশুকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ সম্পদ তখন সামাজিক অবস্থা বা কৃষিজীবনের পর্যায়ে পৌঁছায়নি।[২] খুব চালাকি করে সে রাজার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিল যে অমাবস্যা

রাতে তার গোয়ালে প্রদীপ জ্বালানো হবে। পূজার পর, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে এবং যখনই অন্ধকার নেমে আসতে শুরু করেছিল, আশেপাশের সমস্ত গবাদি পশু তার গোয়ালে প্রবেশ করেছিল কারণ এটিই একমাত্র জায়গা যেখানে আলো ছিল এবং তার গোয়ালটি মহিষ এবং গরুতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ছাগল যেহেতু সেই মহিলার গোয়ালে স্বেচ্ছায় এসেছিল, তাই মহিলা তাদেরও মালিক হয়েছিলেন এবং তিনি ধনী হয়েছিলেন। এই লোককাহিনীটি ওঁরাওদের জীবনে "যাজকীয়" অস্তিত্বের উপর আলোকপাত করে।[৩] এই অঞ্চলে এসে ওঁরাওরা কেবল চাষের প্রগতিশীল পদ্ধতিই শেখেনি, তারা তাদের জীবনে খাদ্যাভ্যাস, রীতিনীতি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসগুলিও গ্রহণ করেছিল যা আর্য যোগাযোগ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। রোহতাসগড়ের ওঁরাওরা 'সারহুল' উৎসব পালন করত এবং প্রচুর পরিমাণে হাড়িয়া (মদ) পান করত, গান ও নাচ করত। নারীরাও পুরুষদের থেকে পিছিয়ে ছিল না, সুযোগ পেলেই তারা তাদের শত্রুর মোকাবিলা করত দৃঢ়তার সাথে। তারা পুরুষদের পোশাক পরতো এবং তীর ছুঁড়তে জানত। রোহতাসগড়ে পরাজিত হওয়ার পর ওঁরাওরা ছোটনাগপুরে পৌঁছায় এবং সেখানে মুণ্ডাদের মুখোমুখি হয়।[৪] ওঁরাওদের জীবনধারা মুণ্ডা সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি, বিশ্বাস ও সামাজিক বিন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং ওঁরাওরাও মুণ্ডা জীবনধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল। সাংস্কৃতিক আদান- প্রদান, ধর্মীয় বিশ্বাস, সিংবোঙ্গা বা ধর্মের আকারে সূর্যকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করা, আঞ্চলিক দেবতাদের প্রায় একই রকমের অনুমান এবং জনজীবনে কুসংস্কার ও কালো জাদু দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং অন্যান্য অনেক মিলের কারণে। হিন্দুরা ওঁরাওদেরকে মুন্ডাদের মতো কোল বলে বিশ্বাস করত।[৫] মুন্ডা জাতির মতোই ওঁরাওরা একটি শাল গাছের ছায়ার নীচে পবিত্র সারনা স্থানে চালা পাচ্চোর উপাসনা করত। প্রতিটি ধর্মীয় উপলক্ষ, উৎসব এবং

রীতিতে তারা শাল গাছ এবং এর ডালপালাকে গুরুত্ব দেয়। স্পষ্টতই, ওঁরাওদের ধর্মীয় কর্তব্যগুলি এর সাথে যুক্ত। ওঁরাওদের ধর্ম সারনা ধর্ম হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, যদিও মুন্ডাদের সারনা ধর্ম এবং ওঁরাওদের সারনা ধর্মে অনেক মৌলিক এবং কাঠামোগত পার্থক্য রয়েছে।[৬] প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু বিশেষত্ব আছে যা সেই ধর্মের চরিত্রকে প্রকাশ করে এবং যার ভিত্তিতে ধর্মের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। ওঁরাওরা বসতি স্থাপনের জন্য এবং চাষযোগ্য জমি তৈরি করার জন্য ছোটনাগপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে কিছু গাছকে অক্ষত ও সুরক্ষিত রেখেছিল কারণ ওঁরাওদের বিশ্বাস যে তাদের মধ্যে প্রচলিত দেবী 'চালা-পাচ্চো' তাদের উপর বাস করেন এবং রক্ষা করেন।[৭] ছোটনাগপুরে যেহেতু প্রচুর পরিমাণে শাল গাছ পাওয়া যায় এবং শাল গাছ সেই অঞ্চলে বসবাসকারী আদিম জনজাতিদের সমাজে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের সাথে গভীরভাবে জড়িত, তাই শাল গাছকে বলা হয় 'চালা পাচ্চোর' আবাস স্থল। ওঁরাওদের এই স্থলটি উপাসনার পবিত্র স্থান। শাল গাছে বসবাসকারী 'চালা পাচ্চো' ওঁরাওদের দ্বারা প্রধানত 'সারনা-বুড়ি' হিসাবে পূজা করা হয় এবং শাল গাছের স্থল 'সারনা স্থান' নামে পরিচিত স্থানটিকে পবিত্র বলে মনে করা হয় এবং এটি অনেক ধর্মীয় আয়োজনের কেন্দ্রবিন্দু। এভাবে এই স্থানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিশ্বাস, ধর্মীয় রীতি ও কর্তব্য গড়ে উঠে। শতবর্ষের পুরানো সারনা ধর্মের এই পবিত্র স্থানের সাথে প্রতিটি ওঁরাও গ্রামই যুক্ত থাকতো। বর্তমানে যেখানে শাল গাছ নেই, কিন্তু স্থানটির পবিত্রতা এবং সেই স্থানের প্রতি ওঁরাওদের বিশ্বাস এখনও রয়ে গেছে। ওঁরাওদের বিশেষ উৎসব বা অনুষ্ঠানে এখনও সারনা স্থানে ধর্মের পূজা এবং সাদা মোরগ বলি দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে, গ্রামের পাহান সমস্ত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা পালন করে। আবার এই স্থান ওঁরাওদের জাতিগত ঐক্য ও সম্প্রদায়গত

জীবনকে শক্তিশালী করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কুরুখ ধর্ম যা অবশ্যই জাতিগত বা উপজাতীয় অনুভূতির মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই ওঁরাও সমাজকে একত্রিত করতে এই ধর্ম এখনও খুব কার্যকর।[৮] ধর্ম যেমন একজন ব্যক্তিকে তার জাতির বিরুদ্ধে কাজ করতে বা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে বাধা দেয় তেমনি ওঁরাওদের মধ্যে এই ধর্ম একটি শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে কাজ করে এবং কোনটি সঠিক, কোনটি ভুল, তা সম্পূর্ণরূপে ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তাদের মধ্যে নিজস্ব সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠায়। এটা আবশ্যক নয় যে তাদের সামাজিক মূল্যবোধ অন্যান্য উন্নত ও সচেতন সমাজের মূল্যবোধের সমতুল্য হবে। তাদের বিবেক হল জনজাতীয় বিশ্বাসের মূলধনী শক্তি। এই কারণেই যে কিছু প্রগতিশীল সমাজ উপজাতীয় প্যারামিটার অনুসারে কুসংস্কারকে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত করে, তবে সেগুলি কেবল বিশ্বাসযোগ্য, সত্য এবং সামাজিকভাবে প্রমাণিত নয়, তবে তাদের বাইরে কেউ জনজাতীয় জীবন কল্পনাও করতে পারে না। ওঁরাওদের মানসিকতা তার নিজস্ব উপায়ে গড়ে উঠেছে। ওঁরাওদের পরম ঈশ্বর হলেন ধর্মেশ। তাকে 'বিরি-বেলাস' বা সূর্যদেবও বলা হয়।[৯] ওঁরাও ধর্মে কিছু উচ্চতর দেবতাদের শ্রেনীতে, পরোপকারী পূর্বপুরুষদের প্রভাব আছে, ধ্বংসাত্মক আত্মা আছে এবং এছাড়াও আছে অশুভ আত্মা যা যন্ত্রণা, দুর্দশা ইত্যাদি নিয়ে আসে যা ওঁরাওদের জীবনকে প্রভাবিত করে। দেব-দেবীদের কল্পনা করা হয় নিরাকার। কিন্তু কখনও কখনও একটি মূর্তি নির্দিষ্ট কিছু দেব-দেবীর কল্পনা করা হয় যারা ওঁরাওদের জীবনে গভীরভাবে প্রবেশ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রধান গ্রাম দেবী 'চালা পাচ্চো' বা 'সারনা বুড়িয়া' কে একজন বৃদ্ধ মহিলার বেশে কল্পনা করা হয়েছে, যার চুল গিঁটযুক্ত এবং পাটের মতো সাদা। কিন্তু এই রূপটি কেবল ওঁরাওদের মনেই পাওয়া যায় এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে

আসছে। কিছু দেব-দেবী তাদের রূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম এবং প্রয়োজনে তাদের ইচ্ছানুযায়ী তারা পশুর রূপ ধারণ করতে পারে। শিকার ও যুদ্ধের দেবী চণ্ডীকে প্রায়শই পশুর রূপে দেখা যায়। ওঁরাও ধর্মে, দেব-দেবী এবং মৃতদের আত্মার সংখ্যা এত বেশি যে তাদের গুণাবলী এবং চরিত্রের জ্ঞান সেই অর্থে চিহ্নিত করার জন্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে একটা দল ও তৈরি করা হয়ে থাকে। এই দলের একটি বিশেষ ধরণের চরিত্র রয়েছে যার জন্য এটি বিখ্যাত বা কুখ্যাত।[১০] তাদের চরিত্র অনুসারে ওঁরাওদের মনে একটি রূপ কল্পনা করা হয়। এইভাবে দেব- দেবীদের গুণ অনুসারে কল্পনা, তাদের চরিত্র সম্পর্কে এবং সেই কল্পনা অনুসারে তাদের রূপ সম্পর্কে ওরাওঁদের মনে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু কোথাও দৈহিক অর্থে কোনো রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। ওঁরাওদের জীবন দেব-দেবী, প্রাকৃতিক, বেদনাদায়ক অশুভ আত্মার শক্তি, পূর্বপুরুষ, মৃতদের আত্মা এবং অন্যান্য রহস্যময় শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হলেও মুন্ডাদের মতো ওঁরাওরা জীবনের কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা ও সুখ-দুঃখের কথা ভাবেন না। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর ক্ষমতার উপর নির্ভর। এমনকি ভালো ফসলের জন্য দৈবশক্তির অনুকূল কৃপা, সারনা বুড়ির অসময়ে বর্ষণ এবং অদৃশ্য শক্তিকে আবাহন করে কৃষি রক্ষা ও তাদের পূজা করে থাকে। ওঁরাওরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই বলে দিত কোন ধরনের মাটি, কোন ঋতুতে, কোন ধরনের চাষ উপযোগী ও সফল হবে। এইভাবে তারা তাদের পরিশ্রমী প্রকৃতি এবং প্রজন্ম থেকে সংগৃহীত জ্ঞানের মাধ্যমে সফলভাবে ভাল কৃষিকাজ অর্জনের চেষ্টা করত। কিন্তু এই প্রত্যাশিত প্রচেষ্টায় যখনই কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, যার উত্তর তাদের জ্ঞানের কাছে পাওয়া যেত না বংশ পরম্পরায়, তখনই তাদের মন এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করত সেই রহস্যময় শক্তির মধ্যে, যা বিশ্বজগতে পাওয়া যায়। এই উপায় অনুসারে তাদের উপাসনা, মন্ত্র, বলিদান প্রভৃতির

উদ্ভাবন করতে হয়েছিল, এইভাবে ওঁরাওদের প্রকৃত জ্ঞান যখন অসহায় হয়ে পড়ল, তখন ওঁরাওদেরকে বিভিন্ন জাদু-মন্ত্র, ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এমনকি উভয়েরই আশ্রয় নিতে হয়েছিল। বিশেষ পরিস্থিতিতে, অপ্রত্যাশিত দুর্যোগের সম্ভাবনাও ওঁরাওদের মনকে সতর্কতা অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল। শিকারে বের হওয়ার আগে, দূর-দূরান্তের বনের রাস্তা খোঁজার আগে, হঠাৎ মরণশীল ঘটনা ঘটতে পারে এমন কোনও প্রচেষ্টার আগেই, ওঁরাওরা যাত্রা শুরু করার সময় সেই অঞ্চলে দেব-দেবী এবং তাদের আত্মাকে তুষ্ট করতেন। এটি নিজেকে বাঁচানোর একটি উপায় যা ওঁরাওদের এখনও বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়।[১১]

ওঁরাওদের ধর্মের প্রধান উপাদানই হল রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির প্রতি ভীতিকর শ্রদ্ধা, তাদের প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা, বলিদান, প্রার্থনা এবং আত্মসমর্পণ। এই অদৃশ্য শক্তির অদম্যতা, ক্রোধ ও দুর্ব্যবহার থেকে বাঁচার জন্য ওঁরাওরা প্রথমে তাদের পূজা-অর্চনা করে এবং তাদের সন্তুষ্ট করে, তারপর আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের পূজা করে যাতে তারা তাকে ভাল ফসল দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সদয় হয়। ওঁরাও ধর্মে, স্থাবর, জড় পদার্থের মধ্যে অদৃশ্য শক্তির বাসগৃহ, এই ধারণার একটি নির্দেশক, যা তাদের মধ্যে প্রচলিত। স্থাবর, জড় পদার্থের আত্মা থাকার ধারণাটি হল নবজাত ধর্মীয় দর্শনের সেই অংশ যা একজন ব্যক্তি একটি জড় বস্তুকে জীবন বলে মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে এটি একটি জীবন্ত আত্মার বাসস্থান। ওঁরাওদের বিশ্বাস অনুসারে, আত্মার অস্তিত্ব দেহ বা বস্তু থেকে পৃথক যেখানে এটি বাস করে। শুধু শাল গাছ, টিলা, জলাভূমি, পুকুর, বাঁশের ঝাঁক, মাটিতে জড় অবস্থায় পড়ে থাকা একটি বিশাল পাথরের চাঁই নয়, একই রকম অনেক জড় বস্তু রয়েছে যেখানে এইসব শক্তিগুলি বাস করে, যা ওঁরাওরা বিশ্বাস করে থাকে। তাদের নিজস্ব প্রাণশক্তি রয়েছে যার কারণে তারা

কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলকে সহজেই প্রভাবিত করে এবং অনেক সময় তাদের মধ্যে অদৃশ্য শক্তির খেলাও দেখা যায়। ওঁরাওদের সমাজে প্রচলিত কালো জাদু অনেকাংশে ওঁরাওদের ধারণার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। এই কালো জাদু একটি ধর্মবিরোধী ব্যবস্থা, এবং এই কালো জাদুর খারাপ প্রভাব বাতিল করার জন্য একটি সমতুল্য সমান্তরাল বা আরও শক্তিশালী দেবতা বা দেবী বা অদৃশ্য শক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই কাজটি বেশিরভাগই ওঝাদের দ্বারা করা হয়, যারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যে সম্পূর্ণভাবে দীক্ষিত ও প্রশিক্ষিত। ওঁরাও ধর্মে কালো জাদুর পদ্ধতির নিয়ম অত্যন্ত গোপনীয়।[১২] পূজা ও প্রার্থনা গ্রামের সারনা স্থানে বা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিচালিত হয়। পূজা ও প্রার্থনার নিয়মকানুন সম্পূর্ণভাবে গ্রামের পাহানের কাঁধে থাকে। যে কোন পূজার সময়ই গ্রামের সকলকেই পূজার স্থানে সমবেত হওয়ার রীতি ছিল কিন্তু কালের বিবর্তনে এই রীতি হারিয়ে যেতে বসেছে। উপাসনা এবং প্রার্থনা বেশিরভাগই প্রকাশ্যে এবং সকলের সামনে করা হয়। ওঁরাওদের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে, প্রচুর সংখ্যক দেবতা এবং মৃতদের আত্মা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে। গ্রামের পাহান প্রধান দেব- দেবীদের পূজা ও বলিদান করে থাকে। চালা-পাচ্চো, দরহা, দেশৌলি প্রভৃতি মৃতের আত্মা থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করার জন্য এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সাধারণত পূজা করা হয়। সম্ভাব্য দুর্যোগ থেকে কৃষি, গবাদি পশু ইত্যাদি রক্ষা করবে। যদিও এইরকম প্রচেষ্টায় গ্রামের কল্যাণ, ভালো ফসল এবং অন্যান্য সমৃদ্ধির প্রার্থনা নিহিত থাকে।[১৩]

প্রকৃতপক্ষে, জন্মের পূর্ব থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্তও ওঁরাওদের জীবন অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় প্রভাব, ধর্মীয় কর্তব্য এবং বিভিন্ন রীতিনীতির সাথে আবদ্ধ। দেব-দেবী ছাড়াও ওঁরাওদের পালিত বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পূজা ও

প্রার্থনার আয়োজন ইত্যাদি ধর্মের প্রধান বিষয়। ধর্মীয় কর্তব্যে পাহানের উপস্থিতি শুধু আবশ্যক নয়, তার নির্দেশ ছাড়া কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা যায় না। পাহান কার্যত ওঁরাও ধর্মের সমস্ত কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মের পাশাপাশি তিনি বিচার বিভাগের প্রধানও ছিলেন। কথিত আছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং গ্রামের সম্প্রসারণের সাথে সাথে, ধর্মীয় দায়িত্ব ব্যতীত, পাহানের অন্যান্য দায়িত্ব ধীরে ধীরে কমানো হয়েছিল।[১৩] ওঁরাওদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হল সরহুল। এই উৎসবের সমাপ্তির সময়, সেই উপলক্ষ্যে পাহান এবং পাহানাইন (পাহানের স্ত্রী) এর মধ্যে একটি বিবাহের আয়োজন করা হয়। এটি পৃথিবীর সাথে সূর্যের একটি প্রতিকী বিবাহ। এইভাবে ওঁরাও ধর্মে অনেক ক্ষেত্রে পাহান পদটি ঐশ্বরিকের সমতুল্য হয়ে ওঠে।[১৪] পাহানের প্রধান সহকারীকে বলা হয় ‘পূজার’। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা তার দায়িত্ব, তাই তাকে পানভরা ও বলা হয়। কিছু গ্রামে পাহানের সহকারীকে "তাহলু"ও বলা হয়। এই সহকারী ছাড়াও, কিছু গ্রামে পাহানের আরও একজন সহকারী রয়েছে যাকে "সুসারী" বলা হয়। উপাসনা ও বলিদান অনুষ্ঠানের পর আশীর্বাদপূর্ণ খাবার রান্না করা হয় এবং রান্নার সময় পবিত্রতা ও দক্ষতা বজায় রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয় ‘সুসারীর’ ওপর। অঞ্চল ভিত্তিক পাহানের সহকারীকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়ে থাকে। এদের কর্তব্য হল পূজা এবং অন্যান্য অনুরূপ অনুষ্ঠানে পাহানকে সাহায্য করা।[১৫] আবার বংশ ও শ্রেণির দৃষ্টিকোণ থেকে এই সহকারীরা পাহানের সমতুল্য এবং পাহানের মতোই জমি সংক্রান্ত সমস্ত সুবিধা পায়। কিছু গ্রামে পাহানের পদটি বংশগত আবার কিছু গ্রামে এই পদের মেয়াদ তিন বছরের জন্য। পাহান ওঁরাওদের ধর্মীয় জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ওঁরাওদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম তাঁর নির্দেশে ও সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়। যেহেতু তিনি ধর্মের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে

জ্ঞানী, এবং অন্যান্য ওঁরাওদের তুলনায় তিনি দেব-দেবীদের নিকটবর্তী বলে মনে করা হয়, তাই সাধারণ মানুষের তুলনায় তার মধ্যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বেশি, যদিও তার সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পাহান বেছে নেওয়া হয়। ওঁরাওদের বিশ্বাস হিসাবে পাহানের বাড়ির একটি পবিত্র ও বিশেষ স্থানের একটি দড়িতে ঝুলানো হয় 'সারনা স্যুপ' এটি 'চালা কুট্টি' নামেও পরিচিত। বিশেষ পূজার সময়, এটি সঙ্গে করে নেওয়া হয় এবং গ্রামবাসীদের সম্মানে সারনা স্থান বা অন্য কোন উপাসনালয়ে এবং সেখানে স্থাপন করা হয়। পূজা শেষ হওয়ার পর, একই শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে আবার চালা কুট্টিটি এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এটি ঝুলানোর জন্য একটি শাল গাছের পাতলা ডালের প্রয়োজন হয়।[১৬]

ওঁরাওদের জীবন ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রভাবিত করে এমন সমস্ত দেব-দেবীদের মধ্যে ধর্মেশ হলেন সর্বোচ্চ ঈশ্বর। তিনি আকাশের জগতে বাস করেন এবং সমস্ত প্রাণীর উপর নজর রাখেন, সমস্ত চলমান ও জড় বস্তুর কার্যকলাপের উপর নজর রাখেন এবং তিনি তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন। সমস্ত দেবী ও অদৃশ্য শক্তি তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে সৃষ্টিকে পরিচালনা করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে। ওঁরাওদের মতে, 'পাট-রাজা' টিলায় বাস করে বা কিছু গ্রামে সে গ্রামের সীমানায় বেড়ে ওঠা কাঁটাঝোপের মধ্যে থাকে। তিনি গ্রামের সমস্ত আত্মার রাজা, এবং ওঁরাওরা তাকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে পূজাও করে থাকে। এই পূজাকে "পার্ট পূজা" বা "পাহাড় পূজা"ও বলা হয়।[১৭] ঊর্ধ্বভূমিতে দরহা দেশৌলি, পাথরের শিলা (মান্দার সালা), শিকারের দেবী চণ্ডী যিনি পাহাড়ের ঢালে বাস করেন বা ঊর্ধ্বভূমিতে বৃত্তাকার পাথরের টুকরো, আত্মারা গাছের গর্তে, পুকুরে বাস করে, এগুলো সবই গ্রামের দেব-দেবী বা আত্মার বাসস্থান। এই দেবতা, দেবী এবং আত্মার চরিত্র এবং তাদের নামকরণ সম্পর্কে

বিশ্বাস গড়ে উঠেছে সেই জিনিসগুলির উপর ভিত্তি করে যা তাদের সঙ্গে যুক্ত। ধর্মের এই অবস্থা, যাকে 'অ্যানিমিজম' বলা হয়, সাধারণত বেশিরভাগ আদিম জনজাতিদেরই পাওয়া যায়। 'অ্যানিমিজম' হল ধর্মীয় চিন্তা প্রক্রিয়ার সেই অংশ যা প্রতিটি জড় বস্তুতে একটি প্রাণবন্ত আত্মা বা শক্তি বাস করে বলে বিশ্বাস করা হয়। এই বিশেষ শক্তি সেই নির্জীব বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নড়াচড়া করে।[১৮] ওঁরাওদের ধর্মীয় জগতে, অনেক ঐশ্বরিক শক্তি এবং আত্মা রয়েছে যা জড় বস্তুর সাথে যুক্ত। ওঁরাওদের বিভিন্ন দেব-দেবী ও আত্মার পূজার (কৃষি ক্ষেত্র রক্ষার জন্য) আলাদা ব্যবস্থাও প্রচলিত আছে।

ওঁরাও ধর্মের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে সূর্যের অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল এবং সূর্যকে সর্বশক্তিমান বলে বিশ্বাস করে এর পূজা করা হয়। ওঁরাওরা শুধুমাত্র তাদের সার্বভৌম ঈশ্বরের জন্য ভগবান শব্দটি ব্যবহার করে না, কিন্তু তাদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় কাহিনীতেও যখন তাদের সুরক্ষার কাহিনী বলা হয় এবং শোনা যায়, তখন কখনও পার্বতীর কথা বলা হয় আবার কখনও সীতাকে ধর্মের স্ত্রী বলে উল্লেখ করা হয়। ধর্মের সাথে পার্বতী বা সীতার নাম যুক্ত হওয়াকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হিন্দুদের সংস্পর্শে আসার প্রভাবের ফল বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রশ্নটি হিন্দু প্রভাবের নয়-এটি ধর্মের মহৎ আবির্ভাবের, যেখানে সূর্যের সমস্ত শক্তি একত্রিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে সূর্যকে ওঁরাও ধর্মের সার্বভৌম ঈশ্বর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।[১৯] রেভারেন্ড পি. দেহান তার গবেষণার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ওঁরাওরা যখন 'ভগবান' শব্দটি ব্যবহার করে, তখন কোলদের মতোই তারা সূর্যকে বোঝায়। কিন্তু দেহান 'বিরি' শব্দের ব্যবহারে মনোযোগ দেননি। ওঁরাও জনজাতির মানুষেরা সাধারণত, ধার্মেশ, পাচ বেলার, চালা পাচ্চো, পাট নাদ, দাধা-দেশৌলি, মহাদানিয়া, ও দেবী মাই – এই সব দেব-দেবীর ধর্মীয় জীবনে পূজা ও প্রার্থনা করে থাকে।[২০]

এই পাচ বেলার দেবতা ওঁরাওদের ধর্মীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওঁরাওদের বিশ্বাস অনুসারে, তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মা পৃথিবীতে বাস করে। সদ্য মৃতদের আত্মা, মৃতদের অনুষ্ঠানের আগে, এই পৃথিবীতে তাদের বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তবে একটি নির্দিষ্ট সময়ে 'কোহা-বেঞ্জা' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার সময় পাঁচজনের গ্রাম পরিষদ বা মৃত ব্যক্তির বাড়ির সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি, তার পূর্বপুরুষদের আত্মার কাছে প্রার্থনা করে, যে আত্মা সদ্য মৃত ব্যক্তিকে 'পাচ বেলার' অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের বিশ্বাস যে, যতক্ষণ না আত্মারা 'পাচ বেলার' অনুমোদিত না হয় ততক্ষণ তাদের অবস্থা অস্বাভাবিক থাকে। 'দাধা-দেশৌলির' স্থানটি গ্রামের সীমানায় অবস্থিত কিছু উঁচু ভূমি। সেই ভূমিকে বলা হয় 'দধ-টঙ্কা' বা 'দধ-তনর'। এই জমির একটি অংশ অনাবাদি রাখা হয় এবং এটি 'দাধা-দেশৌলির' সংরক্ষণের জন্য রেখে দেওয়া হয়। যদি এই নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করা হয়, তবে সেই ব্যক্তি বা তার গবাদি পশু মৃত্যুর মুখোমুখি হবে। পট রাজার মতোই, 'দাধা- দেশৌলি' ও গ্রামকে রক্ষা করে। তবে তিনি একজন বদমেজাজী এবং ভয়ানক নাদ বা দেবতা বলে বিশ্বাস করা হয় যার অবহেলা যে কোনও উপায়ে ধ্বংসাত্মক হতে পারে। গ্রামবাসীরা সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান মেনে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে 'দাধা-দেশৌলির' পূজা করে। যার উচ্চভূমিতে 'দাধা-দেশৌলি' অবস্থান করেন, তিনি সেই উচ্চভূমি থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদ 'দাধা- দেসৌলি' পূজায় বিলিয়ে দেন। পূজা সাধারণত গ্রামের পাহান দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তার অনুপস্থিতিতে ওই উচ্চভূমির মালিকও পূজা পরিচালনা করতে পারেন।[২১] কিছু গ্রামে 'মহাদানিয়া নাদ' পূজা করা হয়। গ্রামবাসীদের মতে, 'মহাদানিয়া' 'দাধা-দেশৌলি' এর চেয়েও বেশি শক্তিশালী 'নাদ'। কিছু গ্রামে লোকে তাকে 'দহ-পাচ্চো' বলে ডাকে। কথিত আছে যে, একজন মহাদানিয়াকে শুধুমাত্র মানুষের বলি দিয়েই তুষ্ট করা যায়

কারণ পশু বলি নিম্নস্তরের এবং 'মহাদানিয়া নাদ' তা গ্রহণ করে না। ওঁরাও ধর্মে 'মহাদানিয়ার' প্রবেশ ঘটে হিন্দু রাজা ও জমিদারদের সংস্পর্শে আসার পর। এই রাজারা এবং বড় জমিদাররা বিজয় এবং অনুরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য 'মহাদানিয়ার' পূজা করতেন এবং তাকে তুষ্ট করতেন। এই প্রক্রিয়ায় তারা মানব বলি দিতেন। পাহান 'মহাদানিয়ার' পূজা পরিচালনা করে না তবে 'মহাদানিয়ার' পূজা করার জন্য 'মহাদানিয়া পাহান' নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এই পাহানরা জমিদার ও রাজাদের কাছ থেকে বিনা ভাড়ায় জমি পেয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। এসব জমি এমনকি 'মহাদানিয়া' জমির নামে সরকারি দলিলে লিপিবদ্ধও আছে। 'মহাদানিয়া' পূজা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং কিছু গ্রাম আছে যেগুলি জমিদারদের প্রভাবে রয়েছে এবং 'দশেরা' এর সময় 'মহাদানিয়া' কে ত্যাগের মাধ্যমে তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তী কালে মহাদানিয়ার কাছে মানব বলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।[২২] ওঁরাওদের পূজিত 'দেবীমাই' আসলে হিন্দুদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। ওঁরাও গ্রামের সীমানায় প্রায়শই একটি পলাশ গাছ (দেবীর স্থান) লক্ষ্য করা যায় যেখানেই 'দেবীমাই' পূজা করা হয়। 'বাদন্দা পিপার' (লম্বা মরিচ গাছ) এর পূজা প্রধানত বৃষ্টির জলের জন্য করা হয়। পশ্চিম ছোটনাগপুরের প্রায় প্রতিটি ওঁরাও গ্রামেই 'বাদন্দা পিপার' পূজা প্রচলিত। ওঁরাওদের বিশ্বাস অনুসারে, মেঘের সঙ্গে এই গাছের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এবং যদি এটি সঠিকভাবে এবং পদ্ধতি অনুসারে পূজা করা হয় তবে পূজার দিন বা এক বা দুই দিন পরে বৃষ্টি হতে পারে। যদি সেদিন বা এক বা দুই দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হয়, তবে পাহান ঘোষণা করে যে পূজার পদ্ধতিতে কিছু ত্রুটি হয়েছে।[২৩]

আমার গবেষণায় আমি পূর্বেই 'ধুমকুঁড়িয়া' সম্পর্কে আলোচনা করেছি কিন্তু 'ডাণ্ডা-কাট্টানা' ও 'নাদ খজরানা' ওঁরাওদের ধর্মীয় জীবনেও যে বিশাল গুরুত্ব রয়েছে

তা বলার অবকাশ নেই। ‘ধুমকুঁড়িয়া’ ওঁরাও দের জীবনের শুধু পবিত্র স্থানই নয়, এটা তাদের কাছে মন্দির হিসাবেও পরিচিত। সব রকম ধর্মীয় কার্যকলাপের সূচনা এখান থেকেই হয়ে থাকে। এমনকি সব রকম বিশ্বাস ও পুজার পদ্ধ্যতি এখান থেকেই শেখানো হয়ে থাকে। ‘ডাণ্ডা-কাট্টানা’ হল ওঁরাওদের জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। হিন্দু ধর্মে যেমন শুভ কাজের জন্য সত্যনারায়ণের পুজার প্রচলন আছে, তেমনি ওঁরাওদের জীবনে এই ‘ডাণ্ডা-কাট্টানা’ পূজা প্রতিটা ওঁরাও পরিবারে করানো হয়ে থকে। ওঁরাও সমাজে সর্বক্ষেত্রে সকল বিষয়ে পবিত্রতা রক্ষা করে চলা একান্ত আবশ্যক। এই শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানই হচ্ছে ওঁরাওদের ‘ডাণ্ডা কাট্টানা’। নতুন বাড়ির ভিত্তি স্থাপন, গৃহ প্রবেশ বা যে কোন শুভ কাজের সূচনাতে যেমন নারায়ণ পূজা বা সত্যনারায়ণ পূজা করা হয় তেমনি ওঁরাওরা 'ডাণ্ডা-কাট্টানা' অনুষ্ঠান করে থাকে। ডাণ্ডা কাট্টানার মাধ্যমে তারা ধার্মেস (ঈশ্বর), চালা-আয়ো (ধরিত্রী মাতা), বিরি বেলাস (সূর্যদেব), তাদের পূর্বপুরুষ ও অন্যান্য দেবদেবীর পুজো করে থাকে। তাদের বিশ্বাস যে, কেউ যদি এই অনুষ্ঠান না করে তাহলে তারা অশুচি থেকে যায় এবং সমাজের কোন মানুষের সাথে মেলামেশা বা কোন প্রকার শুভ কাজে কিংবা কোন পুজা-পার্বণে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। সংসারে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্য এবং গ্রহের প্রতিকূল প্রভাব থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য এই শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান করা উচিত বলে তারা মনে করে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও অন্যান্য শুভকর্ম অনুযায়ী ডাণ্ডা কাট্টানার পদ্ধতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি পুজোর পর পুজা-সামগ্রী বিসর্জন দেওয়ার নিয়মও আলাদা আলাদা ভাবে পালিত হয়ে থাকে। নবগ্রহের মধ্যে বিশেষ করে শনি গ্রহের নজর থেকে দূরে থাকার জন্য দিনের বেলা না করে সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে এই অনুষ্ঠান করার নিয়ম। ওঁরাওদের বিশ্বাস যে, শনিদেবের পিতা হচ্ছেন সূর্যদেব। পিতা পুত্রের

মধ্যে সদ্ভাব নেই তাঁরা পরস্পরের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন। এই জন্য দিনের বেলায় 'ডাণ্ডা কাট্টানা' অনুষ্ঠান করা নিষেধ কারণ ঐ সময় শনিদেব প্রকট থাকেন। যেহেতু ডাণ্ডা কাট্টানার মাধ্যমে সূর্যদেবের আরাধনা করা হয় যদি ঐ সময় শনিদেব প্রকট থাকেন তাহলে সূর্যদেব অসন্তুষ্ট হবেন এই ধারণা থেকে রাত্রি বেলাতেই 'ডাণ্ডা কাট্টানা' পূজা সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাড়ির মধ্যে, বাড়ির বারান্দায় বা বাড়ির উঠানে গোবর দিয়ে নিকানো পরিষ্কার জায়গায় এই পুজো করা হয়।[২৪] ওঁরাওদের 'নাদ খজরানা' সর্বশ্রেষ্ঠ পুজা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। জীবিকা নির্বাহের জন্য ভোরবেলা থেকেই বিভিন্ন শস্য উৎপাদনের নিমিত্ত খনন, রোপন, সেচন, পরিচর্যা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। ফলে নিয়মিত বা প্রত্যহ আরাধ্য দেব-দেবীর উপাসনা সম্ভব হয় উঠে না। বারো মাসে তের পার্বণ পালন করার মত সময় ও সামর্থ কোনটাই এদের নেই। তাই এক যুগ তথা দ্বাদশ বৎসর পর পর এই পূজা করে থাকে। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে এই পুজো হয়ে থাকে সেকারণে অনেকেই একে 'বাসন্তী পুজা' বলে থাকে। ওঁরাও (কুরুখ) ভাষায় দেব-দেবীর অর্থ 'নাদ' এবং সংগঠিত করার অর্থ 'খজরানা' অর্থাৎ 'নাদ খজরানা' মানে সমস্ত আরাধ্য দেব-দেবীকে সংগঠিত বা একত্রিত করে পুজো করা। পুজোর আয়োজন ও দিনখন ঠিক করে কেবলমাত্র কোন এক নির্দিষ্ট গোত্রের বংশধররা সমবেত হয়ে। যদি খালখ গোত্রের পুজো হয় তা হলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থানকারী খালখ বংশের সমস্ত লোকেরা যে গ্রামে পূজা হবে ওই নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হতে হয়। সাধারণত প্রধানের বাড়ির সংলগ্ন স্থানে তালপাতার বেড়া ও ছাউনি দিয়ে বিশাল হলঘর তৈরী করা হয় (ইদানিং কালে ত্রিপল, কাপড়, ফ্যান-লাইট সহকারে প্যাণ্ডেল বানানো হয়ে থাকে)। এই হলঘরের প্রবেশ দ্বার খুবই ছোট আকারের হয় এবং দরজায় কবাট ও অর্গল রাখা বাধ্যতামূলক। স্ত্রী-পুরুষ

নির্বিশেষে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই এখানে প্রবেশাধিকার পায়। তবে জন্ম – মৃত্যু - বিবাহের সময় যদি কারও 'ডাণ্ডা-কাট্টানা' বা শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান না হয়ে থাকে তাহলে তারা প্রবেশের অধিকার পায় না। হলঘরের ভিতর পর্যাপ্ত জলের এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা রাখা হয়। খুব ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে সকলে স্নান সেরে নববস্ত্র পরিধান করে পুজা মণ্ডপে প্রবেশ করে। প্রয়োজনমত অতিরিক্ত নতুন জামা কাপড় সঙ্গে নিয়ে যায়। কারণ একবার প্রবেশ করলে পুজো শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মণ্ডপের বাইরে আসতে পারে না। যারা ভিতরে প্রবেশ করে তারা বাইরের কোন লোকের মুখদর্শন করে না, এমনকি বাইরের লোকের সাথে কথা বলাও নিষেধ। ব্রিটিশ সময়কালে যদি কখনও কোন কিছুর প্রয়োজন হত, তখন কোন বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং হাতের ইশারায় বা ইঙ্গিতে চাহিদা মতো জিনিষ চেয়ে নিত। বর্তমান কালে কাগজের চিরকুটে লিখে টিন বাজিয়ে বাইরে বার্তা পাঠিয়ে দরকারী কাজ সেরে নেওয়া হয়। যতক্ষণ না সমস্ত দেব-দেবীর পুজো শেষ হয় ততোক্ষণ এই পুজা-অর্চনা চলতে থাকে। দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ ভিতরের সকলেই প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করলেও মণ্ডেপের বাইরের কোন লোক সেই প্রসাদ পায় না বা তাদের পাওয়ার অধিকার নেই। ধার্মেশ (নারায়ণ), ইন্দ্র, বরুণ, পবন, লক্ষ্মী, কালী, মহাদেব ছাড়াও অপদেবতাদের পুজো দিয়ে তাদের নৈবেদ্য ও বলিদান সামগ্রী গ্রাম থেকে দূরে নিজস্ব জমির ঈশান কোণে গভীর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হয়। উপাসনার মাধ্যমে সন্তুষ্টি বিধান করে ভূত-পিশাচ তথা অপদেবতাদের পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা বা অপসারণ করার এক পদ্ধতি বলা যায়। নিত্যদিন বা প্রতিমাসে দেবতার আরাধনা সম্ভব না হওয়ার ফলে এক যুগ পর পর সর্বদেবতার সমন্বয়ে ওঁরাওরা এই 'নাদ ক্ষজোরণা' পূজার আয়োজন করে থাকে।[২৫] ভারতের নিবিড় অরণ্যের ঘন পাতায় আচ্ছাদিত

নিরাপদ স্থানে বা কন্দরে বসে প্রকৃতির ক্রোধ থেকে নিস্তার পেতে বা তার কৃপালাভের জন্য ওঁরাওরা আর্তকণ্ঠে বসুমাতার কাছে কুরুখ ভাষায় যে আবেদন করেছিল তা হ'ল:- "হে চালা-আয়ো, নিনিম মান্নে-মাস, বিরি-চান্দো, উল্লা-মাহা, ক্ষেখেল-ক্ষাল্লে, জিয়া-জান্তু হুরমীনু রাঃদি — নিংগান এম গড় লাগদাম"। (হে ধরিত্রীমাতা আপনি গাছ-পালা, চন্দ্র-সূর্য, দিবা-নিশি, খেত-খামার, জীব-জন্তু সকলের মধ্যে সামর্থ্যরূপে বিরাজমান আপনাকে জানাই প্রণাম)।[২৬]

অন্যান্য জনজাতির মতো ওঁরাও জনজাতির ইতিহাস এতটা পরিচিত নয়। এদের আদি ইতিহাস পূর্বেই আলোচনা করেছি। ওঁরাওদের জীবনে অন্যান্য জনজাতির তুলনায় ধর্মীয় বিশ্বাস ও পূজা করার নিয়মনীতি আলাদা। আবার কিছু কিছু মিল ও লক্ষ্য করা গেছে। সাঁওতালদের মতই ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ওঁরাওদের মধ্যে তানা ভগৎ আন্দোলনও হয়েছিল। ওঁরাওদের মধ্যে আবার এই আন্দোলন 'কুরুখ ধরম' আন্দোলন নামেও পরিচিত, যা ১৯১৪ সালে কাছুয়া ওঁরাও নামের এক যুবকের দ্বারা শুরু হয়েছিল ।[২৭] কথিত আছে যে, তিনি জনমত গঠন করার জন্য ঘোষণা করেন যে, তার এক স্বপ্নে ধার্মেশ (ভগবান) আবির্ভূত হয়ে, ভূতের সন্ধান ও ভূত ঝাড়ন, ভূত প্রেমের বিশ্বাস বর্জন করে ভক্তিপূর্ণ এবং নির্মল জীবনযাপন করতে বলেছেন । ধার্মেশ তাকে সমস্ত রকমের পশু বলি, মাংস এবং মদ বর্জন করতে বলেছেন এবং তাদের চাষের কাজও ত্যাগ করতে বলেছেন। কেননা এটি ছিল গরু এবং ষাঁড়ের প্রতি নিষ্ঠুরতা পূর্ণ। তিনি দাবি করেন যে ধার্মেশ তাকে আদেশ দিয়েছিলেন যে ওঁরাওরা যেন অন্য জাতি বা উপজাতির লোকের হয়ে কুলি হিসাবে কাজ না করে। এটা এক নতুন যুগের সূচনা যাকে তিনি ওঁরাও রাজত্ব বলেছেন এবং কেউ যদি এইসব কাজে যোগ দিতে চায় সে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার আরো দাবী ছিল যে ধর্মেশের কাছ থেকে

সরাসরি বিশেষ মন্ত্র ও গান পেয়েছেন যার দ্বারা রোগ এবং দুর্দশা নিরাময়ের ক্ষমতা রয়েছে। তানা-ভগৎ ধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল এক ঈশ্বর ভগবান এবং মহাদেব এর পুনঃ নির্বাচন করণ। অনুগামীরা যে শুধুমাত্র ভূত-প্রেতের পূজা বন্ধ করেছিল তাই নয়, সে মন্ত্র শুনে এবং ঝাড়ন দিয়ে তাদেরকে এলাকা ছাড়া করেছিল। ভূত ছাড়ার মন্ত্র হিসাবে তারা ক্রমাগত "টানা বাবা টানা" বলতে বলতেই বাইরের লোকদের কাছে "তানা"নামে পরিচিত হয়। মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা আসছে এই বিশ্বাস একটা সময় ভগত সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল।[২৮] Philips Ekka এই বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, ১৯১৬ সালে এটা বলা হত যে, খুব শীঘ্রই খোদ ভগবান বা তার কোন দূতের আগমন ঘটবে এবং ওঁরাওদের মুক্ত করবে। পলামৌতে এই বিশ্বাস এতটাই প্রবল ছিল যে তানা ভগতদের মধ্যে অনেকেই মুক্তিদাতার আগমনকে সহজতর করার জন্য তাদের বাড়ির ছাদ থেকে টালি সরিয়ে নিয়েছিল এবং নিজেদের বাড়ীর কুকুর গুলোকে মেরে ফেলেছিল, যাতে তারা ধার্মেশের আবির্ভাবের সময় বিরক্ত না করে। অনেকেই আবার পুলিশ স্টেশনে হানা দিয়ে আইনের কাগজপত্রে দাবি করেছিল, যে ধার্মেশ (ওঁরাও ভগবান) ওঁরাওদের এলাকা গুলো ওঁরাওদের অর্পণ করেছে। অন্যান্য তানা ভগতরা বিশ্বাস করত যে, ধার্মেশ ছোটনাগপুরেই রয়েছে। যার সঙ্গে রয়েছে ওঁরাওদের জন্য গরুর গাড়ি বোঝাই শোনা। শেষ পর্যন্ত ১৯১৬ সালে রাঁচি জেলায় শান্তি স্থাপন করেছিল কিন্তু ততদিনে এই আন্দোলন আসামের চা বাগান গুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সেখানেও ঝামেলার আশঙ্কা ছিল। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যবর্তী সময়কালে তানা ভগতদের আচরণবিধি ও ধর্মবিশ্বাস গঠিত হয়। তারা একেশ্বরবাদীতে পরিণত হয় এবং ভূত প্রেতের পূজা বর্জন করে। এক অনাড়ম্বর ও তপস্বীয় জীবন পদ্ধতি অনুগামীদের জন্য

বিহিত থাকে। যেখানে বৃহস্পতিবার প্রার্থনা দিবস হিসাবে ধার্য হয়। মদ্যপান, মাংস ভক্ষণ, গ্রামের চৌ-মাথার বাজারে নাচ, চটকদার বা লোক দেখানো পোশাক-আশাক এবং অলংকার নিষিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণদের মতো নিত্য স্নান তানা ভগতদের আচরণবিধি ছিল। একই রকম ভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রথার মতই অভক্তদের সাথে ভোজন এবং বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। এই নতুন বিশ্বাসের প্রাথমিক শক্তি এবং শুরুর দিকের অভূতপূর্ণ সাফল্যের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছিল তা হল ছলাকলাপূর্ণ এবং রক্তপিপাসু জনজাতির আত্মার বা ভূত-প্রেতের শেকল থেকে মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষা, যার সঙ্গে হয়তো আরও প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল নিপীড়নমূলক ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি আইনের বোঝা থেকে মুক্তি। এই আন্দোলনের উপভোক্তাদের এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে ভগবানের ভক্তির মধ্য দিয়ে তাদের গোষ্ঠীর বর্তমান অধঃপতিত অবস্থা থেকে হিন্দু এবং তাদের মধ্যে যেসব ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান রয়েছে তাদের মতই উচ্চস্তরে পৌঁছবে এবং তাদের দীর্ঘদিনের কৃষি সংক্রান্ত ক্ষোভ ও বর্তমান আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাবে।[২৯] পরাধীন ভারতবর্ষে ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তানা ভগতরা কংগ্রেস পার্টি এবং অসহযোগ আন্দোলনের সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী ও তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে এরা বলিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েছিল। এটাও উল্লেখ্য যে তানা ভগৎ আন্দোলনের সদস্যদের সক্রিয় বিদ্রোহে নেতৃত্বের জন্য অনেকের কারাদণ্ড হয়েছিল।[৩০] এইভাবে তাদের মধ্যে বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে এক নতুন দিন আসবে যখন ওঁরাও রাজত্বের সূচনা হবে। ছোটনাগপুর অঞ্চলের ইতিহাসের দিকে তাকালে এটা পরিষ্কার হয় যে তানা ভগৎ আন্দোলনের কোন হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বরং বলা যেতে পারে ছোটনাগপুর অঞ্চলের মানুষদের উপর বহিরাগতদের অন্যায় ও অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতির ও জনজাতির স্বায়ত্তশাসন

ও কৃষি অধিকার ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টার একধাপ। তানা ভগৎ আন্দোলনের ফলে যে ধর্মীয় রূপান্তর ঘটে তা বর্ণনা দেওয়ার সময় Philip Ekka জোর দিয়ে বলেছেন যে, একটি প্রদত্ত সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আন্ত-সম্পর্ক থাকে যা এখন সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারাও প্রায় স্বীকৃত। তাই এটা বিস্ময়ের নয় যে, মুন্ডা ও ওঁরাও সমাজে ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদের কৃষি অর্থনীতি কেন্দ্রিক ধার্মিক প্রতিষ্ঠানে বদল এসেছিল। জমির মালিকানা হারানোর সাথেই গ্রামের মুখিয়া এবং গ্রামের পুরোহিতের জন্য জমি রাখার প্রথাও অচল হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে সমস্ত ছোটখাটো দেবীর পূজা গ্রামের পক্ষ থেকে পুরোহিতরা করতেন সেগুলো প্রত্যাখিত হয়েছিল। K. O. L. Burridge কে উদ্ধৃত করে Ekka বলেছেন, সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো নৈতিক পুনর্জন্ম, নতুন মানুষের সৃষ্টি, এবং নতুন সমাজের সৃষ্টি। Ekka আরো ব্যাখ্যা করে বলেছেন, পাইকারি হারে নিখুঁত আচার-আচরণ গ্রহণ যেমন মাংস ,মদ, জনজাতির ভোজ, নাচ, অন্যদের সাথে অভিন্ন আন্তঃবিবাহ প্রভৃতির বর্জন, এগুলো হিন্দু ধর্মের শ্রেণীবিন্যাসে আরো উপরে ওঠার একটা প্রচেষ্টা বলে মনে হয়। ঈশ্বরবাদ গ্রহণ এবং প্রতিদিন সমবেত প্রার্থনা এবং স্তোত্র গাওয়ার মধ্য দিয়ে কাটানো, তাদের খ্রিস্টান ভাইদেরকে আঁকড়ে ধরার প্রচেষ্টার লক্ষণ। প্রকৃতপক্ষে, এটি খ্রিস্ট্রান ওঁরাওদের জন্যে একটি নতুন সমাজ তৈরির প্রয়াস যা প্রভাবশালী হিন্দু এবং খ্রিস্টান সমাজের মতো একই অবস্থানে থাকবে।[৩১] তানা-ভগৎদের পুরো আচার অনুষ্ঠানগুলো একটি বিশাল সাম্প্রদায়িক সংস্কারের সম্পাদনের একটি ধারণা দেয়, যেগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় যে কোন সম্প্রদায় আনুষ্ঠানিকভাবে অতীতের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়াকে উন্মোচিত

করে এবং তারপর নিজেকে একটা নতুন পরিবেশে এবং পুনর্জাগরিত সমাজের সততার সাথে একীভূত করার চেষ্টা করে ।

অন্যান্য বেশিরভাগ জনজাতিদের মতোই কুরুখরা (ওঁরাও) পারিবারিক এবং সাম্প্রদায়িক বন্ধনে আবদ্ধ। ইচ্ছাকৃত ভাবে তারা বসবাসের জন্য যে জায়গা নির্বাচন করেছে সেখানকার ভৌগোলিক দৃশ্য গুলি পার্বত্য এলাকা ও বনাঞ্চলে পূর্ণ এবং যেভাবে তাদের ঘরবাড়ি গুলি ও বসবাসের জায়গা স্থাপন করেছে একই রকম আরো ভাবে অনেক দিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে তাদের পেশা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশ করে। কোনরকম নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াই কুরুখ বস্তি তৈরি করা হত, যা অনেকগুলো মাটির কুঁড়েঘরের সমষ্টি। বহিরাগতদের মনে হত যে এই কুঁড়েঘর গুলো অসংগঠিত বা অসংলগ্ন কিন্তু গোষ্ঠীগত ও পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য এগুলো এমনি ভাবেই পরিকল্পিত।[৩২] কৃষিকাজ তাদের প্রধান অর্থনৈতিক অবলম্বন এবং প্রত্যেক পরিবারেরই কমবেশি পৈত্রিক জমি থাকতো। কুরুখদের নিজস্ব স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও ছিল। যাতে একটি গ্রাম পরিষদ, যা বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে পরিচিত এবং একটি গ্রাম পরিষদ বারোটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্ব পাওয়া প্রবীণ ব্যক্তিরা গ্রামের মধ্যে এবং গ্রামগুলির মধ্যে সমাধানের জন্য বিচার বিভাগীয় পদ পেতেন এবং রাজনৈতিক পদ পরিবর্তনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।[৩৩] কালের বিবর্তনে কিছু কিছু ওঁরাও গ্রামে লক্ষ্য করা গেলেও অধিকাংশ গ্রামে এই গুলোর অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে। এই জনজাতিদের আত্মীয়তার পরিভাষায় একটি বিশদ শ্রেণীবিভাগ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বর্ধিত পরিবার এবং যে সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা বসবাস করে, সেই সম্পর্ক বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত সুনির্দিষ্ট পরিভাষাগুলো যা,তাৎক্ষণিক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

মাতৃ ও পৈত্রিক দিক থেকে প্রত্যেকটা সম্পর্ক পিতামহ, মামাতো ভাই, কাকা, কাকিমা, ভাইপো এবং ভাই, বোনের, শ্বশুর বাড়ির লোকেরাই হোক প্রত্যেকটি সম্পর্কে বিভিন্ন শব্দে এবং বিভিন্ন স্তরে শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করা হয়। কোন কোন সময় এই সম্পর্কগুলো শ্রেণী বিভাগীয় যা একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্নেহ ভালবাসা ও শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দুজন সমবয়স্ক ব্যক্তি বা একজন ব্যক্তি যখন তার চেয়ে কম বয়সী ব্যক্তি বা কোন ছোট শিশুকে ডাকেন তখন ডাকার সময় তাদের আসল নামে ডাকা হয় না। এই শ্রেণীবিভাগ থেকে বোঝা যায় যে তারা একে অপরের সহায়তার উপর নির্ভর করে এবং পারস্পরিক নির্ভরতা ভিত্তিক জীবন যাপন করে একে অপরের কাছ থেকে সুরক্ষা, শ্রদ্ধা, ভালবাসা সম্মান, প্রত্যাশা করেন ও সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে কাজের বন্টন বা ভাগও এতে বোঝা যায়।[৩৪] ভারতের অধিকাংশ জনজাতি গোষ্ঠীর থেকে কুরুখদের সামাজিক আচার-আচরণ কিছুটা আলাদা। প্রেম ,বিবাহ, সন্তান জন্মদান এবং সন্তান লালন পালনের রীতিতে মিল লক্ষ্য করা যায় ।কুরুখ নারীরা পুরুষদের মতই সম্মানের অধিকারী এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব মনে হয় পুরুষদের চেয়ে বেশি। অন্য সমাজে নারীরা, পুরুষ ও শিশুদের থেকে অনেক আগেই ঘুম থেকে ওঠে যা থেকে বোঝা যায় যে তাদের কর্মভার অনেক বেশি। সেখানে দেখা যায় যে কুরুখ নারীরা পুরুষদের সঙ্গেই দিন শুরু করে। শৈশব থেকেই তাদেরকে এই সম্মান দেওয়া হয় এবং জীবন ভর এটিকে সমর্থন করা হয়। ধুমকুড়িয়া হল ওঁরাও জনজাতির লালন পালন ও সক্ষম করার একটা আদি সামাজিক প্রতিষ্ঠান যা স্মরণাতীত কাল থেকে তাদের সঙ্গে রয়েছে এবং বিবর্তিত হয়েছে।[৩৫] S C Roy উল্লেখ করেছেন যে, ধুমকুড়িয়া প্রতিষ্ঠানটি আদিম কুরুখ সংস্কৃতির অকৃত্রিম এবং খাঁটি ফসল। নাচ ও গানের আসর বসত গ্রামের আখড়ার নিকট তৈরি করা এই ধুমকুড়িয়াতে। কেননা

কুরুখদের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো নাচ-গান। Roy আরো উল্লেখ করেছেন যে, 'ধুমকুড়িয়া' যুবকদের দ্বারাই যুবকদের সামাজিক ও ধার্মিক কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার এক শিক্ষালয়। 'ধুমকুড়িয়া' হলো, এমন এক শিক্ষালয় যেখানে সকল সদস্যদের সমাজের সমাজ-সংস্কৃতিমূলক মূল্যবোধ গুলো শেখার সুযোগ করে দেয়। Roy আরও ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে ধুমকুড়িয়ার দুটি অংশ রয়েছে, একটি হলো অবিবাহিত ছেলেরা এবং অন্যটি হলো অবিবাহিত মেয়েরা। কিন্তু ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে যুবা বাস বা ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল নাচ, গান, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, সৃষ্টাচার এবং সামাজিক ধর্মীয় দায়িত্ব ও সংস্কৃতির অভিব্যক্তিতে সম্প্রদায়ের তরুণদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এটি সাংস্কৃতিক নিয়মের মধ্যেই অল্পবয়সী ছেলে মেয়েদের মধ্যে অকপট ভাব বিনিময়ের জন্য একটি নিরাপদ ও উপযোগী পরিবেশ প্রদান করে। ব্যক্তিত্বের বিকাশের বা গঠনের সময় এই প্রথা সাম্প্রদায়িক ও পারস্পরিক সহায়তার প্রবণতা তৈরি করে। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত দায়বদ্ধতার কাঠামো প্রদান করে।[৩৬] যদিও কুরুখ সমাজে নারী ও পুরুষদের কাজের মধ্যে বিরাট কোন প্রভেদ ছিল না তবুও মেয়েদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু কাজের উপর বিধি নিষেধ রয়েছে। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় যে, এই বিধি নিষেধগুলো লিঙ্গ পক্ষপাতপুষ্ট নয় বরং মেয়েদের সম্মানের জন্যেই করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ লাঙ্গল চালানো ও বাড়ি তৈরি করা এইগুলো কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যই রাখা হয়েছে ।তারা বিশ্বাস করে যে, এই কাজগুলো মেয়েরা করলে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি হবে এবং ফসলও ভালো হবে না। যদিও এর পেছনে আসল কারণ হলো মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সৌজন্য প্রদর্শন। নারীদের ক্ষেত্রে হাল চালানো খুব কঠিন এবং একজন মেয়ের সেই শক্তি নাও থাকতে পারে। অন্যান্য অনেক

জনজাতির মতই কুরুখেরা নারীদের পুরুষদের সমান সম্মান দেয়। অন্যান্য আদিবাসীদের মতই কুরুখদের প্রিয় পানীয় মদ বা হাড়িয়া।[৩৭] হাড়িয়ার সরবরাহ ছাড়া কুরুখদের কোন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান উদযাপন হয় না। একজন কুরুখের জীবনেও ফসল তোলা, ঋতু উৎসব, জন্ম, মৃত্যু বিবাহ, দীক্ষার বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান এবং যে উপলক্ষে ধার্মিক অনুষ্ঠান বা অন্যান্য উদযাপনের সঙ্গে যুক্ত সেখানে হাড়িয়ার ব্যবহার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিম্নলিখিত বিষয়টি স্পষ্ট করে, একজন ওঁরাও চাষী যদি অন্যান্য চাষির আগেই তার জমিতে ধানের চারা লাগাতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই বঙ্গালী নামক একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য পুরোহিত কে ডাকতে হবে। আর অনুষ্ঠানটি সংক্ষেপে এইরকম; আগে এই ধান বীজের চারার আঁটিগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এমন পূর্বনির্বাচিত জমিতে চাষী এক পাত্রে হাড়িয়া নিয়ে সেখানে পৌঁছানোর পর ঈশ্বর এর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য ও তর্পণ করে কিছুটা হাড়িয়া মাটিতে ফেলে বন্দনা করে এই বলে যে, হে মা ধরিত্রী প্রচুর বৃষ্টি হোক এবং প্রচুর ফসল হোক; ওই অর্ঘ্য রইল তোমার জন্য। তারপর যেখানে হাড়িয়া ঢালা হয়েছিল সেখানে নিজ হাতে পাঁচটি বীজধানের চারা লাগিয়ে দেন। এটি সম্পূর্ণ হবার পর মেয়েরা জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে শুরু করে। পাত্রের অবশিষ্ট হাড়িয়া হল পাহানের দস্তুরি, এরপর পাহানকে চাষির বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রচুর হাড়িয়া পান করতে দেওয়া হয়ে থাকে।[৩৮] Roy আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ফসল তোলার সময় হাড়িয়া জরুরী, তিনি বলেছেন যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রাম্য পুরোহিত নিজের কাজ সম্পন্ন করেছেন, কোন ওঁরাও চাষী ধান ঝাড়তে পারে না। কুরুখদের আত্মীয়তায় হাড়িয়ার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে এবং মদপানের ব্যাপারে কারো উপর কোন বিধি-নিষেধ নেই। কুরুখ দের রীতি অনুযায়ী বলা হয়ে থাকে যে, একমাত্র প্রবীণ ব্যাক্তি ও বাড়ির দায়িত্ববান ব্যক্তি রাই

শুধুমাত্র আনন্দের জন্য মদপান করবে। যদিও নেশা বা মাতলামো সহ্য করা হয় কিন্তু অনুমোদন করা হয় না।[৩৯]

এটাও বলা হয়ে থাকে যে কুরুখরা সারনা ধর্মের অনুগামী। কুরুখরা যেখানে বিশেষ বিশেষ সময়ে ধর্মানুষ্ঠান করে থাকে তাকে সারনা বলা হয়। আক্ষরিক অনুবাদে সারনা শব্দের অর্থ হল "পবিত্র কুঞ্জ"।[৪০] এই অঞ্চলের প্রথাগত চিরাচরিত জনজাতীয় ধর্মকে সমষ্টিগতভাবে সারনা ধর্ম বলা হয়। সেই কারনেই ঝাড়খন্ড জুড়ে সারনা ধর্মের সাথে অন্যান্য আদিবাসী ধর্ম গুলি সমার্থক হয়ে পড়েছিল। সারনা ধর্মে আদিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবান ধর্মেশ সরহুল উৎসবের সময় সরাই ফুলের মধ্য দিয়ে তাদের উপর উর্বরতা ও সমৃদ্ধির আশীর্বাদ বর্ষণ করে বিশেষ খুশি হন। সেই জন্য ওঁরাওদের জীবন ও সংস্কৃতিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ হলো তাদের পূজার স্থল। যেটি এসেছে সরাই শব্দ থেকে, যা থেকে এসেছে সারনা ধর্ম। ছোটনাগপুরের ওঁরাও ও মুন্ডাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম সারনা ধর্ম।[৪১] ওঁরাওরা একেশ্বরবাদী এবং এদের না আছে কোন মূর্তি মন্দির বা দেব দেবীর ভিড় তাদের পবিত্র স্থান সারনা তে। তারা অদৃশ্য সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা ভগবানের পূজা করে, বা তাদের ঈশ্বর ধর্মেশ প্রেরিত কল্যাণময় দেবদেবীদেরও পূজা করে থাকে। প্রয়োজনমতো দুষ্ট আত্মাদের তাড়ানোর জন্য তারা অর্ঘ্য দিয়ে থাকে। ওঁরাওরা শাল গাছের স্থল ও পাতাকে বিভিন্ন উৎসব ও পূজাতে ব্যবহার করে থকে।[৪২] অন্যান্য অনেক জনজাতির মতই তাদেরও পূজার স্থল হিসাবে সারনা রয়েছে। পূজা অর্চনা স্থানের নাম অনুসারে যথার্থভাবে কোন ধর্মের নামকরণ করা যায় না। যদি তাই হত তাহলে খ্রিস্টান ধর্মকে গির্জা ধর্ম, ইহুদি ধর্মকে সেনা গ্রহণ ধর্ম বলা হত এবং বাকি ধর্মেরও ক্ষেত্রেও তাই হতো একটি ধর্মের নামকরণ হয় যে ভগবান কে পূজা করা হয় তার নাম অনুসারে ও ধর্ম বিশ্বাস ধর্মচারণ অনুযায়ী বা জাতির নামানুসারে। সেজন্য

জনজাতির বহির্ভূত ব্যক্তিরা বলে থাকে কুরুখদের ধর্মের নাম সারনা হওয়া ন্যায় সম্মত নয়। কিন্তু যদি ভালো করে কুরুখদের ধর্মবিশ্বাসকে পরীক্ষা ও অধ্যয়ন করা হয় তাহলে দেখা যায় যে সঠিক কাজে তাদের সর্বপ্রাণবাদী বলা যাবে না। ওঁরাওরা সর্বপ্রাণবাদীও নয় এবং বহু ঈশ্বরবাদী ও নয়। অতি প্রাকৃতিক শক্তিকে বোঝাতে নাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, ইংরেজি অনুবাদে যাকে ভালো বলে বিবেচনা করা হয় কিন্তু পুজো করা হয় না। একই রকম ভাবে নাদ ক্ষতিকর এবং জীবন হানি ঘটায় এরকম দুষ্ট আত্মাদের ভয় পায়।[৪৩] নাদরা হলো অদৃশ্য অতি প্রাকৃত শক্তি যা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে কল্যাণকর শক্তিগুলো মানুষ, পশু ও জমি জায়গার ক্ষতি হতে দেয় না এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসে, তাই নিত্যনৈমিত্তিক অর্ঘ্য দানের মধ্য দিয়ে তাদেরকে খুশি রাখতে হয়। অন্যদিকে দুষ্ট শক্তিগুলো ক্ষতি করে এবং এদেরকেও তুষ্ট রাখতে হয়। প্রকৃতিতে নানা জায়গায় মানুষের মধ্যে এই ভালো বা মন্দ শক্তিগুলোর বাস স্বর্গে নয়। ওঁরাওরা বিশ্বাস করে যে স্বাভাবিকভাবে পরিবারের কোনো সদস্য অদৃশ্য হয়ে বিদ্যমান থাকে এবং নিহিতদের সাহায্য করার জন্য সর্বদা উন্মুখ থাকে। ওঁরাওরা সমস্ত কল্যাণময় শক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী এবং দুষ্ট শক্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে ধর্মেশের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে পুজো করে থাকে। যখন অন্য সমস্ত শক্তি ব্যর্থ সেই চরম দুর্দশার সময় ধার্মেশের কাছে আবেদন করা হয়,কিছু ওঁরাও উৎসবের মধ্যে যেমন সারহুল বা বসন্ত উৎসব যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[৪৪] যদিও ওঁরাওরা বিভিন্ন আত্মাকে শান্ত করে থাকে তবুও তারা একেশ্বরবাদী। কেন না তারা ধর্মেশ নামে পরিচিত পরম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, তাকেই তারা শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, পুজো করে, আত্মাদের নয়। পুজো শুধুমাত্র তারা ধর্মেশকেই করে, আত্মা বা দুষ্ট শক্তিগুলোকে কেবলমাত্র তুষ্ট করে খুশি রাখে। এমনকি পূর্বপুরুষদের কল্যাণকর আত্মাদের তারা সম্মান করে, পূজা করে না।

এই জনজাতিদের কাছে ধর্মেশ হল পরম ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, রক্ষক বিধাতা, মানুষ হোক বা আত্মা সবার নিয়ন্ত্রণ, দুষ্টের দমন কর্তা ও পাপীদের ত্রাতা। তিনি সনাতন, যার না আছে আদি না আছে অনন্ত, তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। তিনি তাদের ঈশ্বর, মালিক, প্রভু। যখন আর সবকিছু তাদের হতাশ করে, তাদের শেষ আশ্রয় ধর্মেশ, যার কাছে সাহায্যের জন্য তারা যায় এবং বলে, এখনই তুমি আমাদের শেষ আশ্রয়।[৪৫]

সমস্ত মানবজাতি ও কল্যাণময় শক্তির রচয়িতা ধর্মেশকে অনান্য সমস্ত আধ্যাত্মিক সত্তার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পরিবার ও গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উপলক্ষ যেমন জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, বীজবোনা, ফসল তোলা চারা রোপণ এই সবেতেই সবচেয়ে বড় "পালকান স্নান" এর আয়োজন করা হয় কেবলমাত্র ধার্মেশের উদ্দেশ্যে।[৪৬] একমাত্র ধার্মেশকে সাদা রঙের জিনিস, সাদা মোরগ, সাদা ছাগল এবং সাদা জল দেওয়া হয়, যেখানে অন্যান্য দেবদেবীর ক্ষেত্রে তা হয় না। এবং সাদা জলের বদলে হাড়িয়া দেওয়া হয় ।এই ভাবেই অন্যান্য সমস্ত অলৌকিক আত্মা ও শক্তির উপর ধর্মেশের শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার এটাও উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, ধর্মেশকে যে শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যের সময় বা প্রয়োজনেই স্মরণ করা হয় এবং পুজো করা হয় এমন নয় বরং ওঁরাওরা তাদের সমস্ত কিছুতেই ধর্মেশের উপস্থিতির ধারণা নিয়ে জীবন যাপন করে। ওঁরাওদের মনে ঈশ্বর বা পরমাত্মার ধারণা দিনের পরম উজ্জ্বল সূর্যের ধারণার থেকেও সব রকম ভাবেই আলাদা এবং এটা মানে করে যে, ধর্মেশ প্রকৃতির কোন উপাদান রূপ নয়। ওঁরাওরা তাকে সবার অগ্রগতি বলে মনে করে।[৪৭] পৌরাণিক সৃষ্টি তত্ত্ব অনুযায়ী সূর্য চন্দ্র দেবী আত্মা যা কিছুই সবই ধর্মেশের দ্বারাই সৃষ্টি। এদের পরমেশ্বর হলেন ধর্মেশ, যিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজমান যদিও প্রকৃতিতে তিনি অদৃশ্য। সারনা শাল গাছের পবিত্র কুঞ্জ তাদের

পরমেশ্বরের অর্চনা বা পূজার স্থল সেখানেই তাদের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা, দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব।[৪৮] এই তত্ত্বকে অনেক আধুনিক লেখক ও পন্ডিতরা বুঝতে ব্যর্থ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে মানুষের কুঞ্জর ও খারাপ মুখ কে ওঁরাওরা প্রচন্ড ভয় পায়। এই ভয় থেকে যাদুবিদ্যা বা ডাইনি বিদ্যায় তাদের বিশ্বাস জন্মায়। দুষ্ট আত্মার প্রভাবে অসুস্থতা থেকে মৃত্যু, এই বিশ্বাস থেকেই জাদুকর ও ভূত তাড়ানোর মন্ত্রে তারা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়।ধর্মেশ পরম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান সত্তা এবং যিনি নৈতিকতার অভিভাবক হিসাবে কেউ যদি মন্দ করেন তিনি প্রচলিত নৈতিকতার বিরুদ্ধে সমস্ত অন্যায়কে অন্যান্য বিপর্যয়ের দ্বারা শাস্তি দেবেন বলে বিশ্বাস করা হয়। সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কিছু অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ধর্মেশের কাছে একটি সাদা মোরগ বা একটি সাদা ছাগল বলির নির্দেশ দেয়। ডাইনি বিদ্যা ও অন্যান্য জাদুবিদ্যা চর্চার জন্য এক ঘরে করা বা গ্রাম থেকে বহিষ্কার করার রীতি রয়েছে। ওঁরাওদের বিশ্বাস যে অন্যায়ের শাস্তি অন্যায়কারী জীবিত অবস্থাতেই পাবে মৃত্যুর পরে নয় অথবা তাদের ছেলেরা তাদের পিতা-মাতার পাপের জন্য কষ্ট পাবে। S. C. Roy মনে করেছেন ওঁরাওদের ধর্ম যা মূলত সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ঐক্যকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে, তা সামাজিক দায়বদ্ধতার বোধকে ত্বরান্বিত করেছে ।[৪৯]

উৎসব,নাচ গানের বিস্তৃত উদযাপন কুরুখ সংস্কৃতি ও জীবনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারা বছর ধরে তারা এগুলো উদযাপন করে এবং এগুলোর মধ্যে অনেক উৎসবই নাচ-গান সমন্বিত এবং কৃষির সাথে জড়িত। গানগুলো ঋতুর প্রতিফলন এবং প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরুখ ভাষায় প্রায়ই বলা হয় একনাদিন টোকনা বা দিন পান্না অর্থাৎ হাঁটাই নাচ আর কথা বলাই গান। বর্ষাকালে ধান রোপনের সময় তারা একত্রে যে গানগুলি গায় তা তাদের কঠিন পরিশ্রমকে লাঘব করে। বিবাহ, সন্তানের জন্ম এবং

উৎসবগুলির জন্য অর্থাৎ প্রতিটি উপলক্ষের জন্য বিশেষ গান, নাচ এবং মাদল বাজানো হয়।[৫০] সারহুল বসন্তকালে উদযাপিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব। এটি গাছপালার ফুল ফোটা ও ভোজ্য পত্রের উদযাপন। যেখানে শাল গাছ মুকুট হয় সেই পবিত্র কুঞ্জ বা সারনাতে অনুষ্ঠিত হওয়া যতক্ষণ না সারহুল উদযাপিত বা পালিত হচ্ছে এবং গোষ্ঠীর সবাই উপবাস ব্রত না নিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকেই ফুল-ফল ও পাতা বা মুকুল তোলা বা খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় না।[৫০] এই উৎসব যে শুধুমাত্র ওঁরাওদের সংস্কৃতির সৌন্দর্যকে প্রকাশিত করে এমন নয় সেই সঙ্গে ভগবান ধর্মের সংস্থা মা ধরিত্রী এবং প্রকৃতির দেবী যাকে তারা চালা-পাচ্ছ মাতা বলে তার সম্পর্কে সুগভীর দার্শনিক ধারণাকেও ব্যক্ত করে। এই উৎসব উদযাপনের মধ্য দিয়ে বসন্তের মাঠে চাষের কাজে সূচনা হয় এবং পরমেশ্বর ধর্মেশের সম্মানে এটি পালন করা হয়। যার আশীর্বাদে যথা কালে বৃষ্টির আশা থাকে এবং ফসল সুরক্ষিত থাকে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস গুলি যেমন কমতে শুরু করে তেমনি আবার তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা যে ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল তা বর্তমানে প্রায় নেই। মানভুম সংলগ্ন ও ঝাড়খণ্ড তথা বিভিন্ন রাজ্যের কিছু কিছু ওঁরাও গ্রামগুলিতে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস গুলো এখনও লক্ষ্য করা গেলেও, কিছু সংখ্যক ওঁরাওরা অধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে তারা আবার এই বিশ্বাস গুলো মানতে একেবারেই নারাজ, ফলত তাদের মধ্যে এক মিশ্র ধর্মীয় সমাজ ব্যাবস্থা গড়ে উঠতেও দেখা গেছে। কিছু সংখ্যক ওঁরাওরা খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহন করেছে আবার বাকিরা নিজেদেরকে সারনা ধর্মাবলম্বী বলে থাকলেও লোকগণনায় হিন্দু বলেই পরিচিত।আমি আমার গবেষণার এই অধ্যায়ে, এটাই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যে,শিক্ষিত ওঁরাও সমাজই পারত তাদের সারনা ধর্ম কে সরকারের কছে তুলে ধরতে

কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। এই অধ্যায়টি বর্তমানে প্রাসঙ্গিকীকরণ ও সংস্কৃতায়নের অন্যান্য ঐতিহাসিক মডেলগুলির মত পরীক্ষা–নিরীক্ষার দিকে এগিয়েছে। কুরুখদের (ওঁরাও) প্রেক্ষাপটের সাথে প্রাসঙ্গিক একটি ধর্মতত্ত্বের কাঠামো নির্মাণের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যেতে পারে।

সূত্র নির্দেশক

১. S. C. Roy, Oroan Religion and Customs. Ranchi: K. M. Banerjee, Shyambazar, Calcutta.1928.pp.21-29.

২. Ibid.pp.33-37.

৩. Ibid.pp.44-46.

৪. E. Norbeck, Religion in Primitive Society, New York, Harper & Brothers,1974.pp.41-49.

৫. R. Ekka, The Karam Festival of the Oraon Tribals of India: a Socio-Religious analysis. Proceedings of ASBBS. Vol.16. No.1. Paper presented at 18th Annual Conference of American Society of Business and Behavioral Science, Las Vegas,2009.pp.39-44.

৬. Ibid.pp.49-53.

৭. N. Minz, Jago Adivaasi Jago. In J. M. Kujur & S.J.Minz (Eds.) Pearls of Indigenous Wisdom, New Delhi: India Social Institute

& Bangalore: Christian Institute for the Study of Religion and Society (CISRS).2007.pp.87-93.

৮. Ibid.pp.101-111.

৯. Op.Cit.Ekka,pp.61-67.

১০. Ibid.pp.69-73.

১১. Ibid.pp.77-81.

১২. V. P. Koonathan, The Religion of the Oraons: A comparative study of the concept of God in the Sarna Religion of the Oraons and the Christian concept of God. Shillong: Don Bosco Center for Indigenous Cultures.1999.pp.29-36.

১৩. Ibid.pp.41-44.

১৪. Ibid.pp.47-51

১৫. Virginius Xaxa. Oraons: Religions, Customs and Environment. India International center Quarterly. Vol.9. No. 2. 1992.pp.29-33.

১৬. F. Pereira, The Faith Tradition of the Kurukhar (Uraons), Delhi: Indian Society for Promoting Christian Knowledge.2007.pp.63-71.

১৭. Ibid.pp.79-83.

১৮. Ibid.pp.86-89.

১৯. R,Thapar.(Ed),Tribe,Caste and Religion in India. Delhi: Macmillan.1977.pp.61-66.

২০. N. Bhagat Chhotanagpur Ke Oraon Reeti Riwaz. Jharkhand Jharokha, Ranchi, India.2013.pp.61-69.

২১. Ibid.pp.73-77.

২২. Op.Cit.Roy.pp.91-95.

২৩. Ibid.pp.97-101.

২৪. Ibid.pp.107-111.

২৫. Op.Cit.Bhagat.pp.83-87.

২৬. Ibid.pp.93-97.

২৭. Ibid.pp.129-133.

২৮. S. T. Das, Tribal development and Socio-Cultural matrix. Delhi: Kanishka Publishers,1993.pp.133-142.

২৯. P. N, Panday. Gramin Vikas Avem Sanrachatmak Parivartan, Hindi Book Centre, New Delhi, India.2000.pp.89-97.

৩০. Op.Cit.Roy.pp.129-133.

৩১. Ibid.pp.136-141.

৩২. Ibid.pp.144-149.

৩৩. Op.Cit.Bhagat.pp.83-87.

৩৪. Ibid.pp.91-95.

৩৫. Ibid.pp.97-101.

৩৬. A. Ghosh, The world of Oraons. Delhi, Manohar.2006.pp.66-71.

৩৭. Ibid.pp.77-83.

৩৮. S, Khalkho. Oraon Shanskriti : Parivartan Evam Dishaya, Kudukh Vikash Shamiti, Ranchi.2009.pp.52-59.

৩৯. Op.Cit.Roy.pp.153-157.

৪০. Ibid.pp.161-169.

৪১. Ibid.pp.173-177.

৪২. Op.Cit.Bhagat.pp.101-111.

৪৩. Op.Cit.Roy.pp.153-161.

৪৪. Ibid.pp.163-167.

৪৫. Ibid.pp.169-174.

৪৬. R. B. Pandey, Christianity and Tribes in India, Delhi: Academic Excellence.2005.pp.41-49.

৪৭. A. D. W, Malefijt, Religion and Culture: An Introduction to Anthropology of Religion, New York : The Mecmillan Company.1968.pp.231-239.

৪৮. Op.Cit.Roy.pp.177-183.

৪৯. Ibid.pp.185-189.

৫০. Op.Cit.Khalkho.pp.63-71.

উপসংহার

প্রাচীন বৈদিক আর্য সভ্যতার সময় থেকে, আর্য-অনার্য বিরোধ শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনকালে, 'আর্য' ধারণার সাথে বর্ণ-বৈষম্যের ধারনা যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে, নতুন ভাবে সেই বিতর্ককে উস্কে দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত বিতর্ক ও বিরোধ সত্ত্বেও, একথা নিশ্চিত যে, জনজাতির মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করে আসছে। বিদেশি আক্রমণ, মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি সত্ত্বেও, এই জনজাতির মানুষ নিজেদের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, ভারতীয় সংবিধানে এদের জনজাতি হিসাবে চিন্হিত করা হয়েছে। তবে, সমস্ত আদিবাসী মানুষকে একক দৃষ্টিভঙ্গিতে সাধারণীকরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা কখনই সমীচীন নয়। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, কোল, ভিল সহ বহু আদিবাসী মানুষের বসবাস এই ভারতবর্ষে। প্রতিটি জনজাতির গোষ্ঠীর মধ্যে যেমন নানাবিধ সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনই তাদের মধ্যে বৈষম্যও কম নয়। প্রতিটি আদিবাসী বা জনজাতির মানুষদের জীবনযাত্রা, জীবন শৈলী, পেশা, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন স্বাভাবিক নিয়মেই, সময়ের সাথেসাথে পালটে গেছে। বিস্তীর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে, বিভিন্ন আদিবাসী মানুষদের পৃথক সংস্কৃতি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে, ঔপনিবেশিক-উত্তর সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতিতে রূপান্তরের সাথেসাথে; জনজাতির মানুষদের মধ্যেও নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। এই সন্দর্ভে মূলত ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবন সংগ্রামের কথা অনুসন্ধান করে দেখার একটা প্রয়াস রয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায় থেকে একবিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সময়সীমাকে ধরে, এই অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সুতরাং, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সাথে অপরাপর জনজাতির মানুষদের যেমন বেশ কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনই এই জনজাতির নিজস্ব কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। আর সেই জন্যই, ইতিহাসে, এই জনজাতির একটা নিজস্ব সামাজিক প্রথা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুপ্রাচীনকাল থেকে ওঁরাও জনজাতির মানুষ, মূলত জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলগুলিতে বসবাস করত। প্রকৃতির সাথে তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত নিবিড়। প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বে সেই ঐতিহ্য মেনেই তারা দীর্ঘদিন ধরে, বসবাস করে আসছিল। কিন্তু, ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর; সেই প্রথাগত জীবনধারায়, বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, কৃষির বাণীজ্যিকীকরণ করা হয়েছিল। ফলে, প্রচলিত কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। আবার, ১৮৬০এর দশকে বন-আইন পাশ এবং পৃথক বন-দপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, জঙ্গলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। ফলে জঙ্গলে বসবাসকারী আদিবাসী মানুষদের উপর এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। জঙ্গলে অবাধ প্রবেশের উপর নানা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। জীবন ও জীবিকার তাগিদে জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল, আআদিবাসী মানুষদের নতুন স্থান অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। ওঁরাও জনজাতির মানুষদের ক্ষেত্রেও, তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে ওঁরাও জনজাতির মানুষ, নিরিবিলি এবং নিরবিচ্ছিন্ন স্থান অনুসন্ধানের খোঁজে, নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই ভাবে আধুনিক পর্বেই, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের অভিবাসন ঘটেছিল। এই অধ্যায়ে মানভূম জেলার ওঁরাও

জনজাতির পূর্ববর্তী বাসস্থান এবং সেখান থেকে তাদের চলে আসার ইতিহাসও তুলে ধরা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বারংবার আদিবাসী বিদ্রোহের ফলে, কোম্পানির কর্তৃপক্ষ, ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল। এই আদিবাসী বিদ্রোহগুলির মধ্যে যেমন নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি জীবন ও জীবিকাকে টিকিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা যেমন কাজ করেছিল, তেমনই তাতে জনজাতির মানুষদের ঐক্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছিল। তবে,এই প্রবন্ধে ওঁরাও জনজাতির সাথে অন্যান্য জনজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মূল ফারাকগুলি তুলে ধরার একটা প্রয়াস করা হয়েছে। মূলত, সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোল উপজাতির সাথে, ওঁরাও জনজাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রেল পথের বিস্তার, চা-বাগিচা শিল্পের প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে, জনজাতির মানুষেরা যুক্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। পশু শিকার ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে বেঁচে থাকার কোনো উপায় না দেখে, তারা তথাকথিত আধুনিক শিল্পগুলিতে শ্রমিক হিসাবে যোগদান করেছিল। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ, মহাবিদ্রোহের পর, সাঁওতাল, ওঁরাও, কোল, ভিল প্রভৃতি জনজাতির মানুষদের পৃথক করে রাখার নীতি গ্রহণ করেছিল। সাঁওতাল পরগণা নামে পৃথক একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও, গান্ধীবাদি রাজনীতিতে অনেক সংখ্যক জনজাতির মানুষ যোগদান করেছিল। গান্ধীজির ‘হরিজন আন্দোলন’-এর পাশাপাশি, আম্বেদকরের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল; তপশিলি জাতি ও উপজাতির অধিকার রক্ষার আন্দোলন। সুতরাং, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল শ্রোত থেকে ভারতের জনজাতির মানুষ কখনই বিচ্ছিন্ন ছিল না।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, জনজাতির মানুষের জীবনে পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। ওঁরাও জনজাতির মানুষদের ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। ওঁরাও জনজাতির মানুষদেরকে নতুন এক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কৃষি ক্ষেত্রে তারা ভাগ চাষি এবং মজদুর হিসাবে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার কোনোকোনো ক্ষেত্রে, ফসল বিক্রেতা হিসাবে জীবিকা গ্রহণ করে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তারা খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। অনেকে 'মাহিন্দার' বা গৃহকর্মে পরিচারক-পরিচারিকা হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থাৎ, ওঁরাও জনজাতির প্রচলিত জীবিকা পরিত্যাগ করে, সমাজের মূল স্রোতে টিকে থাকার চেষ্টা করেছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবেই, ওঁরাও জনজাতির মানুষ কাজের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্যই, এই সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে 'ঘর জামাই'-এর ধারনা, অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

রাজনৈতিক দিক থেকেও, ওঁরাও জনজাতির মানুষদেরকে অবহেলা করা হয়েছিল। বিভিন্ন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায়, জনজাতি মানুষদের উন্নয়নকল্পে নানা গালভরা কথা বলা হলেও, তার কোনো বাস্তব রূপায়ন লক্ষ্য করা যায়নি। নির্বাচনে সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ না করা এবং নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থেকে তারা উদাসীন থাকার ফলে, ক্ষমতাসীন সরকারের কাছেও তারা ছিল অপাঙ্কতেয়। সক্রিয় রাজনীতিতে নিরক্ষর ওঁরাও জনজাতির মানুষ, তেমন ভাবে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারেনি। যথাযথ শিক্ষার অভাবে, তারা নিজেদের আইনি অধিকার এবং সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়েও, অজ্ঞ ছিল। বি. আর. আম্বেদকর যে 'পঞ্চশীল' নীতির কথা ভেবেছিলেন; তাকে জহরলাল নেহেরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বাস্তবায়ন করার কথা

বলেছিলেন। কিন্তু, শিক্ষার প্রসার ও জীবিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে, ওঁরাওরা কোনো বিশেষ সুযোগ পায়নি। সমাজের মূল স্রোতে তারা একেবারেই ফিরতে পারেনি। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে, কংগ্রেস এবং অকংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নেহেরুর পর, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব অনেকেই সামলেছেন। কিন্তু, ওঁরাও সহ অপরাপর জনজাতির অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। অত্যন্ত ধীরে হলেও কিছুসংখ্যক ওঁরাওরা ক্রমশ তাদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে । এর ফল স্বরূপ, ২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, 'কুরুখ লিটারারী সোসাইটি' নামে, ওঁরাও জনজাতির একটি পৃথক সংগঠন। এই সংগঠন মূলত, ওঁরাও জনজাতির মানুষের শিক্ষা, জীবিকা, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সামিল হওয়ার ডাক দিয়েছিল। অনেক ওঁরাও জনজাতির মানুষ আবার সাংবিধানিক অধিকার না পেয়ে, সন্ত্রাসের মাধ্যমে অগণতান্ত্রিক পথে নিজেদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হতাশা ও তার দরুন তাদের নিজেদের একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তোলার প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ভ্রাম্যমান জীবনযাপনের পর, তারা স্থায়ী ভাবে বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করতে শুরু করেছিল। ঔপনিবেশিক-উত্তর যুগে, তাদের পৃথক সংস্কৃতি বজায় ছিল। এখানে মূলত, মানভূম জেলায় বসবাসরত ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সামাজিক সংগঠন ও সমাজ ব্যবস্থার কথা আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃতিক দিক থেকেও এই ওঁরাও জনজাতির মানষেরা, অন্যান্য জনজাতির থেকে ছিল পৃথক। ওঁরাওদের পৃথক ভাষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, সমাজ কাঠামো থাকা সত্ত্বেও,

সাঁওতাল উপজাতির মানুষদের সাথে অনেক সময় তাদেরকে এক করে দেখা হয়। অথচ, সাঁওতালদের সংস্কৃতির সাথে, ওঁরাওদের বেশ কিছু বৈপরীত্য রয়েছে। উভয় সংস্কৃতির বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রচলিত ধারনা ও ভাষ্যে, প্রায় সাঁওতাল, ওঁরাও, কোল, ভিল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতির মানুষদের একটি অবিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী হিসাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যদি ওঁরাও জনজাতির ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি পর্যালোচনা করা যায়; তাহলে সেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি আরো স্পষ্ট ভাবে পরিস্ফুট হবে। বারো মাসে তের পার্বণ হিসাবে, ওঁরাও জনজাতির ; 'করম', 'ফাগুয়া', 'টাটকা পরব', 'সহরাই' সহ বিভিন্ন ধরনের পরব রয়েছে, যা তারা দীর্ঘদিন ধরে মেনে এবং উদযাপন করে আসছে। এছাড়া জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহকে কেন্দ্র করেও, পৃথক রীতিনীতি প্রচলিত রয়েছে।

'ধুমকুড়িয়া'-র ধারনা হল ওঁরাও জনজাতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। 'ধুমকুড়িয়া' বলতে প্রকৃতপক্ষে একটি পবিত্র বাড়িকে বোঝান হয়। সুপ্রাচীনকাল কাল থেকে, এই 'ধুমকুড়িয়া' নামক প্রতিষ্ঠানে ওঁরাও জনজাতির অবিবাহিত ছেলে ও মেয়েদের প্রশিক্ষণ নেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। শিক্ষা, জীবনশৈলী, ধর্মাচরণ প্রভৃতি শিক্ষা এখানে দেওয়া হয়। প্রচলিত বিদ্যালয়ের মতই, এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে থাকে। তবে, এই প্রতিষ্ঠানটিকে, একটি পবিত্র ধর্মীয় স্থান হিসাবেও মনে করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের কোনো লিখিত ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায় না। বর্তমানে কুরুখ ভাষায় লেখা যৎসামান্য কিছু গ্রন্থ থেকে এইসব সামাজিক রীতিনীতির কথা জানা যায়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সেই রীতিনীতিগুলি থেকেই, ওঁরাওদের বিষয়ে কিছুটা জানা যায়। এছাড়া, মৌখিক ভাষ্যের উপরেও খানিকটা নির্ভর করতে হয়। তবে, ওঁরাও জনজাতির মানুষের সাথে, প্রকৃতির একটা নিবিড় সংযোগ

আগাগোড়াই গড়ে উঠেছে। প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাদের জীবনযাত্রার কথা ভাবাই যায় না। অন্যান্য জনজাতিগুলির মতই, ওঁরাওদের জীবনে, প্রকৃতি ও পরিবেশ ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনো সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখা এবং পরিবেশের সাথে মানুষের সহাবস্থানের তাগিদ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। আজকের দিনে, যখন পরিবেশ প্রায় বিপন্ন, তখন এইসকল পরিবেশ ভাবনা ও প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে থাকার প্রবণতা, সত্যই আমাদের কাছে একটি শিক্ষনীয় বিষয় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়ে, ওঁরাও জনজাতির ধর্ম প্রসঙ্গে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। ওঁরাও জনজাতির মানুষ, পৃথক একটি ধর্মমত মেনে চলে। তাদের প্রধান দেবতা হলেন ধর্মেশ। এই ধর্মেশ হলেন মূলত সূর্য দেবতা। যা প্রকৃতির মূল শক্তির আধার। প্রচলিত হিন্দু ধর্মে যেমন গৃহ শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেমন 'সত্য নারায়ন পুজা' করা হয়, তেমনই ওঁরাও জনজাতির মানুষ, 'ডাণ্ডা-কাট্টানা'-র পূজো করে থাকে। এমনকি সব রকমের শুদ্ধি করণের ক্ষেত্রে তারা এই পূজা এখনও করে থাকে। কিন্তু, ওঁরাওদের প্রচলিত ধর্মের উপর অপরাপর হিন্দু ধর্মমতের আধিপত্য বিস্তার বিভিন্ন সময় লক্ষ্য করা গেছে। আবার, অনেক ওঁরাও জনজাতির মানুষ হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মে দিক্ষা নিতে বাধ্য হয়েছে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে, নানা প্রলোভন দেখিয়ে, তাদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস ঔপনিবেশিক আমল থেকেই শুরু হয়েছিল। ওঁরাও জনজাতির মানুষ মূলত 'সারনা ধর্ম'-এ বিশ্বাস করে। কিন্তু সরকারি জনগণনা, সমীক্ষা এবং যেকোনো পরিসংখ্যানে এই 'সারনা ধর্ম'-কে হিন্দু ধর্মের সাথে এক করে দেখা হয়েছে। ফলে, পরিকল্পিত ভাবে জনজাতির মানুষের প্রথাগত ধর্ম বিশ্বাসের উপর হিন্দু ধর্মের আধিপত্য বিস্তার লক্ষ্য করা গিয়েছে। অন্যান্য জনজাতির মানুষদের মতই, ওঁরাও

জনজাতির মানুষেরা শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য, সরকারী ভাবে তেমন কোনো গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। কোনোরকমে যারা খানিকটা শিক্ষিত হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে; তারা আবার নিজেদের স্বজাত্যবোধ ভুলে সমাজের মূল স্রোতে মেশার চেষ্টা করেছে। সেখানেও অবশ্য তারা প্রান্তিক হয়েই রয়ে গেছে। অর্থাৎ, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়ে গেছে। পুরানো সেই আত্মিক বন্ধন এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার তাগিদ, ওঁরাওদের মধ্যে অনেক কমে গেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ের এই পরিবর্তন, অন্যান্য জনজাতির মানুষদের মধ্যেও অবশ্য লক্ষ্য করা গেছে।

সুতরাং ওঁরাও জনজাতির মানুষদের সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, জীবিকা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বেশ কিছু স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ওঁরাও জনজাতির সেই বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলির মধ্যেই তাদের প্রকৃত ইতিহাসকে খুঁজে বের করার একটা প্রয়াস, এই সন্দর্ভে বারংবার চেষ্টা করা হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে, এই গবেষণাপত্রটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে। তাই শুধু ওঁরাও জনজাতির প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানই নয়, আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রেও, এই গবেষণাপত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত, মানভূম জেলায় স্থানান্তরিত ওঁরাও জনজাতির সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির ইতিহাস খোঁজার একটা প্রয়াস, এই সন্দর্ভে রয়েছে। ফলে, প্রান্তিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও, এই গবেষনাপত্রটি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ওঁরাও জনজাতির মানুষদের প্রসঙ্গে তেমন কোনো লিখিত কোনো উপাদান না পাওয়া যাওয়ায়, তাদের প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন। এই প্রান্তিক মানুষদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, সেই সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েই, অনুসন্ধান

করতে হবে। সরকারী নথিপত্রগুলিও, অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে নীরব। কিছু প্রথাগত, প্রচলিত রীতিনীতি, মৌখিক ভাষ্য এবং যৎসামান্য লিখিত উপাদানই এই ওঁরাও মানুষদের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে মূল হাতিয়ার। আশা করি, এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, ভবিষ্যতে এই প্রান্তিক মানুষদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, এই গবেষণাপত্রটি নতুন গবেষকদের কাছে সহায়ক হিসাবে বিবেচিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

PRIMARY SOURCES

Beverley. A, Report on the Census of Bengal 1872 (Kolkata, 116-118)

Coupland, H : Manbhum District Gazetteers series, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1911.

Datta, K.K, (ed) *Selection from the Judicial Records of Bhagalpur District Office*, 1772-1801, State central Record office, Patna, 1968.

Das, J.K. Report on Scheduled Tribes of Orissa, Part-V-B, Volume-XII, Orissa - Census 1961. Director of Census Operations, Orissa.1971.

Hotton. J. H. Census of India 1931,I II & III Volumes. Delhi, Gyan Publishing House, Reprint 1966.

Hunter. W. W, A Statistical Account of Bengal, Vol-17, Delhi 1976 (Reprinted)

Lokur B. N.. The Report of the Advisory Committee on the Revision of the lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Government of India Department of Social Security, New Delhi, 25th August, 1965.

Migration Report of 1924-1945, Employee Centre, Dumka.

OECD Country, (2001), "Organization for economic co-operation and development", Policy brief Our Common Future. Oxford University Press, Oxford. 1987

Roychaudhury P. C. Gazetteer of India. Bihar Superintendent Secretariat Press, Patna 1965.

Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, 1960 vols I-II, ed. Verrier Elwin in A New Deal for Tribal India, (Ministry of Home affairs, New Delhi 1963

Interview of Gopal Orao of Niyamatpur, West Bengal 9th March 2018.

Interview of Lacchu Oraon of Barothol, West Bengal 15th February 2019.

JOURNAL

Daniel J. Rycroft. Looking Beyond the Present: The Historical Dynamics of Adivasi (Indigenous and Tribal) Assertions in India. Journal of Adivasi and Indigenous Studies 2014.

Gopa Majumder (Paul).The Oraons of Barasat : A Study on Some Aspects of Demography, Journal of Human Ecology, Volume 14, Haryana,2003.

Gupta Prakash,The Customary Laws of the Munda & the Oraon, *Journal of the Indian Law Institute*, Vol. 46, No. 1 (January-March 2004),

Joe K.W. Hill. Agriculture, Irrigation and Ecology in Adivasi Villages in Jharkhand: Why Control and Ownership over Natural Resources Matter. Journal of Adivasi and Indigenous Studies 2014.

Mukherji. Priyadarsi The Santal and Oraon Cosmogonic Myths and Certain Parallels in China: A Reflection of Socio-Cultural Realities. Vol. 36, No. 1/2, Indian Anthropological Association Jan-Dec 2006,

Virginius Xaxa. Oraons: Religions, Customs and Environment. India International center Quarterly. Vol.9. No. 2. 1992.

Sardar N., Kurukh kathatha Quarterly Oraon Culture and Literary Magazine, West Bengal, 2011.

SECONDARY SOURCES

ENGLISH BOOKS

Bose, A. (Ed.). Demography of Tribal Development. New Delhi: B. R. Publishing.1990.

Bhowmik. P. K. Re-thinking Tribal Culture in India. Kolkata: 2001.

Bakshi, S.R and Balak, Social and Economic Development of Scheduled Tribes, New Delhi. Deep and Deep Publications Pvt. Ltd.2000,

Bose. N. K, Tribal Life in India, National Book Trust, New Delhi.1977.

Campion, E. : My Oraon Culture. Ranchi, Jharkhand, India: Catholic Press.1980.

Chaudhuri. B, Tribal Transformation in India, Inter India Publications, New Delhi.1990.

Chaudhary. S. N, Tribal Development since Independence, Concept Publication Company, New Delhi.2009.

Chaube K. S, The Making and Working of the Indian Constitution, NBT, New Delhi, reprint 2010-11,

Dhan, R.O, These are my Tribesmen: the Oraons. Ranchi.1967.

Dalton, E. T. Descriptive Ethnology of Bengal, Government Printing Press. Calcutta.1872.

Das, S. T. : Tribal Development and Socio-Cultural Matrix. Delhi: Kanishka Publishers.1993.

Dube, S. C. (Ed). Tribal Heritage of India. Delhi: Vikash Publishing House.1977.

Das, S. T. Tribal Development and Socio-Cultural Matrix. Delhi: Kanishka Publishers.1993.

Das. S. T, Tribal Development and Socio-Cultural Matrix. Kanishka Publishers Distributors, Delhi.1993.

Doshi. S.L, Tribal Ethnicity and Class Integration, Rawat Publications, New Delhi, Jaipur.1990.

Deogaonkar. S. G, "Tribal Administration and Development, Concept Publishing Company, New Delhi.1994,

Elwin. V, Tribal world of Verrier Elwin, Oxford University Press.India,1964.

Elwin. V, A New Deal for Tribal India, Ministry of Home Affairs, 1963.

Ekka. R, The Karam festival of the Oraon Tribal's of India: a Socio-Religious analysis. Proceedings of ASBBS. Vol.16. No.1. Paper presented at 18th Annual Conference of American Society of Business and Behavioral Science, Los Vagas.2009.

Ekka, R, The Karam Festival of the Oraon Tribals of India: a Socio-Religious analysis. Proceedings of ASBBS. Vol.16. No.1. Paper presented at 18th Annual Conference of American Society of Business and Behavioral Science, Los Vagas,2009.

Fernandez. W, Indian Tribal's and Search for an Indian identity. Social Change.1993.

Guha. R : Elementary Aspects of Peasant Insurgenary in Colonial India, OUP, 2nd impression 1994.

Ghosh. A, History and Culture of the Oraon Tribe: Some Aspects of Their Social Life, Mohit Publication, New Delhi, 2003.

Hutton, J. H. Caste in India, Oxford University Press. second edition Mumbai 1951.

Hunter,W.W, *The Annals of Rural Bengal* Hans eBooks Publishers, New York, 1868

Jain. P.C, Planned Development among Tribals, Prem Rawat for Rawat Publications, New Delhi.pp.1999.

Jones, Sir William. On the Chronology of the Hindus, an Article published in Asiatic Researches, Kolkata, Vol. II. 2006.

Kujur. A, The Oraon Habitat a Study in Cultural Geography. Ranchi: The Daughters of St. Anne.1989.

Kujur. J. M .& Minz. S. J (Eds.). Indigenous People of India Problems and Prospects. New Delhi: Indian Social Institute.2007.

Kujur, J. M. Jharkhand: its Administration and Development. In N. Mahanti (Ed.), Small State Approach in Tribal Development: A Paradigm Shift Delhi: Inter India Publication.2005.

Kumar A. Tribal Culture and Economy, Inter India Publications, New Delhi.1986.

Khosla. J. N, Development Administration: New Dimensions, Indian Journal of Public Administration, Jan-March.1966.

Koonathan, V. P. The Religion of the Oraons: A comparative study of the concept of God in the Sarna Religion of the Oraons and the Christian concept of God. Shillong: Don Bosco Center for Indigenous Cultures.1999.

Mahapatra, L. K. Tribal Rights and Entitlements in land, Forest and Other Resources. Paper prepared for the UNDP Orissa Resettlement Policy Project.2005.

Mathur. H. M, Tribal land issue in India: Communal management rights and displacement. In J. Perera (Ed.). Land and Cultural Survival: The communal land rights of indigenous people in Asia Philippines: Asian Development Bank.2009.

Mallick. A. Md, Development programs and tribal scenario: A study of Santhal, Kora and Oraon. Kolkata: Firma KLM Private Limited. 2004.

Mehata. P. C, Ethnographic Atlas of Indian Tribes, Discovery Publishing House, New Delhi, reprinted 2013,

Mehta. O, Tribal Development: The New Strategy, Government of India, New Delhi.1976.

Mitra. P & Kakali, Development Programmes and Tribal Some Emerging Issues, Kalpaz Publications, Delhi. 2004.

Mittal. A. C & Sharma. J. B, Tribal Education, Administration and Development, Volume-3, Radha Publication, New Delhi.1998.

Mallick, A. Md, Development Programs and Tribal scenario: A study of Santhal, Kora and Oraon. Kolkata, Firma KLM Private Limited. 2004.

Malefijt, A. D. W, Religion and Culture: An Introduction to Anthropology of Religion, New York: The Mecmillan Company.1968.

Norbeck. E, Religion in Primitive Society, New York, Harper & Brothers, 1974.

Minz, N. Jago Adivaasi Jago. In J. M. Kujur & S. J. Minz (Eds.) Pearls of indigenous wisdom, New Delhi: India Social Institute & Bangalore: Christian Institute for the Study of Religion and Society (CISRS).2007.

Pradhan. K. C. Tribal Development and Provisions of PESA. In S. N.Tripathy (Ed.), Rural Development and Social Change. New Delhi: Sonali Publications.2006.

Pandey, A. K, Tribal Society in India. New Delhi: Manak Publication Limited. 1997.

Pant. B. R., Tribal Demography of India. New Delhi: Anamika Publishers & Distributors (P) Ltd.2004.

Patel. M. L, Planning and Strategy for Tribal Development, Inter-IndiaPublications, New Delhi.

Pati. R.N &. Jena. B, Tribal Development in India, Ashish Publishing House, New Delhi. 1986.

Pereira, F. The Faith Tradition of the Kurukhar (Uraons), Delhi: Indian Society for Promoting Christian Knowledge. 2007.

Pandey, R. B. (2005). Christianity and Tribes in India. Delhi: Academic Excellence. 2005.

Panandiker. V. A. P, Development Administration: An Approach, Indian Journal of Public Administration,Jan-March. 1964.

Roy S. C. The Oraons of Chhotanagpur, Abhijeet Publication New Delhi. 1915.

Roy. S. C, Oraons of Chota Nagpur Their History, Economic Life and Social Organization, Crown Publication.Ranchi, 2004.

Roy, S. C. Oroan Religion and Customs. Ranchi: K. M. Banerjee, Shyambazar, Calcutta. 1928.

Singh, K. S. Status of Scheduled Tribes: Some Reflections on the Debate on the Indigenous People. Social Change. 1993,

Singh. K. S, Transformation of tribal society: Integration vs. Assimilation. Economic and Political Weekly. Mumbai, Vol. 17, No. 34, 1982.

Sahoo. R.K, Tribal Development in India, Mohit Publications, New Delhi. 2005.

Selected Works of Jawaharlal Nehru/S Gopal ed. Vol. 8,

Shukla. R.S, "Forestry for Tribal Development", Wheeler Publishing, ADivision of A.H. Wheeler and Co. Ltd., New Delhi. 2000.

The Story of Anthropology from the Indian Viewpoint. Quoted in Sangeeta Dasgupta's The Journey of an Anthropologist in Chotanagpur, The Indian Economic and Social History Review New Delhi,2004

Toppo. S.R, Tribes of India. Indian Publishers Distributors. Delhi, 2000.

Thomas. K. Jhon, Human Rights of Tribals, Vol. 2, Isha Books, Delhi, 2005,

Thakur. D. Socio-Economic Development of Tribes in India, Deep and Deep Publishers, New Delhi. 1986.

Thapar. R (Ed), Tribe, Caste and Religion in India. Delhi: Macmillan. 1977.

Xaxa. V, State, society and tribes: issues in Post-Colonial India.: Pearson Education, New Delhi, 2008.

BENGALI BOOKS

বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা-৬, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৮।

ভট্টাচার্য, তরুণদেব, পুরুলিয়া, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৯।

রানা কুমার, রানা সন্তোষ, পশ্চিমবঙ্গে দলিত ও আদিবাসী, ক্যাম্প ২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা, ২০০৯।

HINDI BOOKS

Bhagat N. Chhotanagpur Ke Oraon Reeti Riwaz. Jharkhand Jharokha, Ranchi, India.2013.

Khalkho. S, Oraon Shanskriti : Parivartan Evam Dishaya, Kudukh Vikash Shamiti, Ranchi.2009.

Panday. P. N.Gramin Vikas Avem Sanrachatmak Parivartan, Hindi Book Centre, New Delhi, India.2000.